উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম
(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)
স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)
কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স
কোর্সের শিরোনাম : বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস
কোর্স কোড : NEC-BG-02

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the University Grant Commission – Distance Education Bureau

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম
(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স

কোর্সের শিরোনাম : বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস

কোর্স কোড : NEC-BG-02

মডিউল: ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স : ১ Discipline Specific Elective Course : 1	লেখক Course writer	সম্পাদনা Editor
মডিউল : ১ Module : 1	**ড. মহর্ষি সরকার** সহকারী অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়	**অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল** বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল : ২ Module : 2 মডিউল : ৩ Module : 3	**ড. গুরুপদ অধিকারী** সহকারী অধ্যাপক, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ, দুর্গাপুর	
মডিউল : ৪ Module : 4	**ড. গোবর্ধন অধিকারী** সহকারী অধ্যাপক, চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং : সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি :

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য :

ড. প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন :

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্স

কোর্সের শিরোনাম : বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস

কোর্স কোড : NEC-BG-02

মডিউল: ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

মডিউল : ১ প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-১	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ঐতিহাসিক পটভূমি	9-20
একক-২	চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	21-38
একক-৩	প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা ও বৈষ্ণব পদাবলী	39-51
একক-৪	প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যের ধারা	52-66

মডিউল : ২ মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-৫	মঙ্গালকাব্যের ধারা (মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল, অন্নদামঙ্গাল)	69-88
একক-৬	অনুবাদ সাহিত্যের ধারা (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত)	89-106
একক-৭	পদাবলি সাহিত্যের ধারা (বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল এবং গীতিকা)	107-127
একক-৮	জীবনী সাহিত্য ও ইসলামি বাংলা সাহিত্য	128-140

মডিউল : ৩ উনিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-৯	উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য ও সাময়িকপত্র	143-159
একক-১০	উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্য	160-174
একক-১১	উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গামঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ধারা	175-191
একক-১২	উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য (উপন্যাস ও ছোটোগল্প)	192-204

মডিউল : ৪ বিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-১৩	বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প)	207-217
একক-১৪	বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কবিতার ধারা	218-222
একক-১৫	বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা	223-237

মডিউল-১

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস

(পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত)

একক-১ ❑ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : ঐতিহাসিক পটভূমি

১.১. উদ্দেশ্য
১.২. প্রস্তাবনা
১.৩. বাংলা দেশের পরিচয়
১.৪. বাঙালি জাতির পরিচয়
১.৫. বাংলা ভাষা
১.৬. বঙ্গালিপির পরিচয়
১.৭. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজন
১.৮. সারাংশ
১.৯. অনুশীলনী
১.১০. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজন ও ক্রমবিকাশের স্তরসমূহ সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করবেন।
- বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও তার বিবর্তন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করবেন।
- বাঙালি জাতির উৎস ও পরিচয় সম্পর্কে অবগত হবেন।
- বাংলা ভাষা এবং বঙ্গালিপি বিষয়ে আবশ্যক জ্ঞানলাভ করবেন।
- বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের উৎসমূল ও বিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে এই আলোচনা সহায়ক হয়ে উঠবে।

১.২. প্রস্তাবনা

সহস্রাধিক বছর অতিক্রান্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ স্তরসমূহকে যুগবিভাজনের নিরিখে জানার উদ্দেশ্যে যে পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেখানে বাঙালি জাতির পরিচয়, বাংলা দেশের পরিচয়ের পাশাপাশি বাংলা ভাষা এবং বঙ্গালিপি নিয়ে আলোচনা একান্তভাবেই আবশ্যিক। এই পাঠ পরিকল্পনার ফলে শিক্ষার্থীরা যুগবিভাজনকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্বের দিনগুলিতে পৌঁছাতে চেষ্টা করবে।

১.৩. বাংলা দেশের পরিচয়

দেশ-কাল-পাত্রকে নিয়েই গড়ে ওঠে ইতিহাসনির্ভর সাহিত্য-সংস্কৃতি। বাংলা দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা দেশের পরিচয় অন্বেষণে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের কাজটি বেশ দুরূহ। ড. নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদি পর্ব) নামক গ্রন্থে বাংলা দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছেন 'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটানরাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ-উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা -চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।' তবে এই সীমানা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সেকথা বলাবাহুল্য। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করলে দেখতে পাব যে 'বঙ্গ', 'বঙ্গাল', 'বাঙ্গাল', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'বরেন্দ্র' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যেগুলি বাংলার জনপদ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মৌর্যযুগ থেকেই এ দেশে আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্তযুগে সমগ্র বাংলাদেশ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারে আসে। 'ম্লেচ্ছ' এই প্রাকৃত শব্দটি 'মৎস্য' শব্দেরই অপভ্রষ্ট রূপ। 'বঙ্গ' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ করা যায় পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। পতঞ্জলি অঙ্গ, বঙ্গ ও সুহ্ম এই তিনটি বিভাগ উল্লেখ করেছেন। 'অঙ্গ' দেশের বেশির ভাগ অংশ বর্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত, ক্ষুদ্রাংশটুকু পড়েছে বাংলায়। 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ নিম্ন জলাভূমি। সুতরাং বঙ্গদেশ বলতে অবিভক্ত বাংলার জলময় অঞ্চলগুলিকে বোঝাতো। 'সুহ্ম' বীরভূমের উত্তরাংশ বাদে, বর্তমানে বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলা শব্দটি এসেছে 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' শব্দ থেকে। বঙ্গাল জনপদের অধিবাসীরা বঙ্গালী বা বাঙ্গালী নামে অভিহিত হতেন। বঙ্গাল শব্দটি গঠিত হয়েছে বঙ্গ + আল শব্দ দুটির সমন্বয়ে। এখানে 'বঙ্গ' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে কোল সংস্কৃতি থেকে। কোল বলতে আমরা বুঝে থাকি সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতি বা নৃগোষ্ঠীর লোকেদের। এই কোল-নৃগোষ্ঠীদের উপাস্য দেবতা বোঙা বা বোঙ্গা থেকে 'বঙ্গ' কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে বলে নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করে থাকেন। বহু গবেষক আবার এবিষয়ে ভিন্ন মতও পোষণ করেন। 'বঙ্গ' শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঐতেরেয় আরণ্যক' নামক গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে 'বঙ্গ' শব্দটি দেশবাচক, জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। সায়নাচার্য্য 'বঙ্গা' শব্দের অর্থ 'বৃক্ষবাচক' বলে মনে করেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পাণিনির ব্যাকরণে 'বঙ্গ', 'সুম্মা', 'পুণ্ড্রাঃ' শব্দগুলি জাতিবাচক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

যশস্বী সুকুমার সেনের মতে 'বঙ্গ' হল ভাটি গাঙ্গেয় বঙ্গভূমি; গঙ্গার পশ্চিমে সুহ্মভূমি ও উজান গাঙ্গেয় হল পুণ্ড্রভূমি। পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের সীমা নিয়েও নানা মতভেদ তৈরি হয়েছে। বঙ্গদেশ আবার একসময় গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। মধ্যভারতের উচ্চভূমি বিন্ধ্যপর্বতমালার উত্তরবর্তী অঞ্চল ও প্রাগজ্যোতিষপুরের (কামরূপ) পশ্চিমাস্থিত ভূভাগ পঞ্চগৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই বিস্তৃত ভূভাগটি

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল নিয়ে গঠিত ছিল পঞ্চগৌড়। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'পঞ্চগৌড়' নামটি প্রভাব-ব্যঞ্জক হলেও গৌড় রাজ্য ছিল প্রাচীন। এর পরবর্তী সময়ে বঙ্গ বলতে বোঝাত পূর্ববঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি বলতে উত্তরবঙ্গ, রাঢ় অঞ্চল বোঝাতে পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গকে বলা হত বাগড়ী। মুঘল আমলে 'বেঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা' নামটি গৃহীত হয়েছিল সরকারি দলিল-দস্তাবেজে। বঙ্গদেশ মোটের উপর সমতল ভূমি হলেও এর উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্মদেশের পর্বতমালা ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি অবস্থিত। মোটের উপর এই হল বাংলার ভৌগলিক বিন্যাস।

বঙ্গদেশে প্রাচীন কতগুলি নগর বা রাজধানীর কথা আমরা জানতে পারি। সেগুলি হল—পুডনগল (পুণ্ড্রনগর), পুষ্করণ (পুষ্করণা), বর্ধমান, পঞ্চনগরী, ক্রীপুর, কর্ণসুবর্ণ (কর্ণসুবর্ণক), পাটলীপুত্র (বৃহৎ বঙ্গের অধীন, খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে ধর্মপালের রাজধানী ছিল), মুদগগিরি (মুঙ্গের), বিলাসপুর, রোহিতগিরি, বিক্রমপুর, ঢেক্করী, সিংহপুর, প্রিয়ঙ্গু, রামাবতী, লক্ষণাবতী, ধার্যগ্রাম, দ্বারহাটা, ফন্দুগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এই সমস্ত গ্রাম, নগর রাজাদের রাজধানী যেমন ছিল তেমন নগরগুলিকে মেরুদণ্ডস্বরূপ বেঁধে রেখেছিল গঙ্গা নদী। এছাড়া অন্যান্য নদী তো ছিলই। ঐসব নদীর তীরবর্তীস্থানগুলিতেই কৃষি, গোপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য করেই বাঙ্গালীরা তাঁদের নগরপত্তন, গ্রামপত্তন তথা বাণিজ্যকেন্দ্রের পত্তন ঘটিয়েছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গাদেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যকেই কেন্দ্র করে। বঙ্গাদেশের অর্থকারী ফসল ছিল ধান্য, আখ, কার্পাস ইত্যাদি। ধান উৎপাদনে বঙ্গাদেশ অদ্বিতীয় ছিল তা পূর্ববঙ্গের বগুরা থেকে প্রাপ্ত মহাস্থানগড় শিলালেখের নিদর্শন থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। অপরদিকে আখ ও কার্পাস চাষের নিরিখে একটি নগর বা কৌমের নামের পরিচিতি ঘটে; সেই কৌমের নাম পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্ধন। এই কৌমে উৎপাদিত কার্পাস ও আখের নাম ছিল 'পৌণ্ড্রক'। কবি শুভাঙ্কের লেখা একটি রাজপ্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, বঙ্গাদেশের ঘরে ঘরে কার্পাসের তুলো থেকে সুতো কাটা তথা সেলাইকর্মের কথা। যথা—

কার্পাসাস্থিপ্রচয়নিচিতা নির্ধনশ্রোতিয়াণাং
ঘেষাং বাত্যা প্রবিততকুটীপ্রাঙ্গণান্তা বভুবুঃ।
তৎসৌধানাং পরিসরভুবি ত্বৎপ্রাসাদাদ্ইদানিং
ক্রীড়াযুদ্ধচ্ছিদুরযুবতীহারমুক্তাঃ পতন্তি।।

এর বাংলা অর্থ হলো— যে সব গরীব ব্রাহ্মণদের কুটির প্রাঙ্গণে জোরে হাওয়া দিলে কার্পাসের বীজ ছড়াছড়ি যেত এখন তোমার অনুগ্রহে তাদের প্রাসাদের প্রশস্ত হাতায় যুবতী মেয়েদের আমোদের হুড়াহুড়িতে হারের মুক্তা (এখানে ওখানে) গড়াগড়ি যায়।

১.৪. বাঙালি জাতির পরিচয়

সাধারণত যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাঁরাই বাঙালি বলে পরিচিত। অনুরূপভাবে বলতে পারি বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বাংলাদেশ বা বঙ্গাপ্রদেশ। কিন্তু প্রাচীন ভারতে

বাংলাদেশ বলে কোনো রাষ্ট্র বা প্রদেশ ছিল না; তার নাম ছিল কেবল 'বঙ্গ' যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গাদেশ' আখ্যা পায়। বস্তুতঃ বাংলার প্রাচীন নাম যাই হোক না কেন সেই নামটির দেশবাচক অথবা জাতিবাচক পরিচয়ের সঙ্গো ভারতবর্ষে তথা বঙ্গাদেশে আর্যসভ্যতা ও আর্যসংস্কৃতির প্রসারের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সমভাষাভাষী একটি জাতির আগমন ঘটেছিল ভারতবর্ষে। ঐ জাতির সাধারণ পরিচয় আর্যজাতি। আর্যগণ যাযাবর জাতি হলেও তাঁরা ছিলেন সমুন্নত ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী। আর্যজাতি ও আর্যভাষা সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে আগমনের আগে গিরি-অরণ্য-নদ-নদী পরিবেষ্টিত এ দেশে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁরা আদিবাসী বা জনজাতি নামে পরিচিত ছিল। আর্যের ঐ সকল অধিবাসীও বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এঁদেরই কোনো কোনো সম্প্রদায়কে বৈদিক ও উত্তর বৈদিক যুগে 'অসুর', 'রাক্ষস', 'নিষাদ' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ট্রিক বা কোল বংশ-সমুদ্ভূত সাঁওতাল-মুণ্ডা-শবর-পুলিন্দ-হো-কুর্ক-ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি জনজাতি সম্প্রদায় তাঁদের উত্তর পুরুষ। এদের মধ্যে ডোম ও চণ্ডাল সম্প্রদায় অন্ত্যজ হলেও আর্য ভাষাতেই কথাবার্তা বলতেন।

বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যে বৃহত্তর অঞ্চলে বসবাস করে তার নাম বাংলাদেশ বা বঙ্গাপ্রদেশ। প্রাচীনকালে কেবল বঙ্গা যা পরবর্তীকালে 'বঙ্গাদেশ' আখ্যা পায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার অব্দে আর্যজাতির আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। আর্যজাতি ভারতবর্ষে আগমনের আগে, এদেশে যাঁরা বসবাস করতেন তারা আদিবাসী ও জনজাতি নামে পরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশের ও বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস ভারতবর্ষের আর্যীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গো বিশেষভাবে জড়িত। সম্প্রসারণশীল আর্য জাতি ভারতে প্রবেশের পর প্রথমে সিন্ধু-কাশ্মীর-গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। অতঃপর পাঞ্জাবের দুই পবিত্র নদী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী 'ব্রহ্মাবর্ত' নামক ভূভাগে আর্য নিবাস গড়ে উঠেছিল। ব্রহ্মাবর্ত দেবনির্মিত জনপদ রূপে বন্দিত হত। এখান থেকেই ভারতে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। এই অভিযান চলতেই থাকে যার ফলে কুরুক্ষেত্র-মৎস্য-পাঞ্চাল-শূরসেন প্রভৃতি 'ব্রহ্মর্ষি' দেশের অন্তর্ভুক্ত জনপদগুলি আর্য সংস্কৃতির অধীনে আসে। এই ভাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্বে পূর্বসমুদ্র থেকে পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়ায় এসে বৃহত্তর 'আর্যাবর্ত' বা আর্য সংস্কৃতিভুক্ত অঞ্চল গঠন করে। দেবভাষা সংস্কৃতের অনুশীলন এবং বেদবিহিত অনুশাসন মেনে চলা আর্য সংস্কৃতির দুটি মূল বিষয়।

১.৫. বাংলা ভাষা

বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রথাগত অনেকেরই যে, সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। প্রকৃত অর্থে এই সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়নি। আজকের কথ্য বাংলা ভাষার উদ্ভবের মূলে এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বাংলা ভাষা যে মূল ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে তার নাম ইন্দো-ইওরোপীয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর আগে সম্ভবত দক্ষিণ রাশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলে এই ভাষাভাষীরা বাস করত। পরে এরা ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার অন্যতম সন্ততি ইন্দো-ইরানীয়

ভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ২০০০)। অবশ্য ইন্দো-ইরানীয় অনুমিত ভাষা। এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষার একটি শাখা হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এই সময়ের রচনা।

পরবর্তী স্তর হল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তর। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ১০০০। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা এই স্তরের। পালি (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-খ্রিস্টপূর্ব ২০০) ভাষার নিদর্শন মেলে অশোকের শিলালিপি ও বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর মধ্যে। প্রাকৃত ভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর (খ্রিস্টপূর্ব ২০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দ)। প্রাকৃতের প্রধান শাখা চারটি—উত্তর পশ্চিমা (পৈশাচী), দক্ষিণ পশ্চিমা (শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী), প্রাচ্যা (মাগধী), মধ্যপ্রাচ্যা (অর্ধমাগধী)। আবার এইসব প্রাকৃত থেকে জন্ম নেয় অপভ্রংশ বা অবহট্ট। যেমন মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশ বা অবহট্ট, শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে শৌরসেনী অপভ্রংশ বা অবহট্ট। বিদ্যাপতি রচিত 'কীর্তিপতাকা' এই ধরনের অপভ্রংশের নিদর্শন। এইসব অপভ্রংশ বা অবহট্ট থেকে আধুনিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম (৯০০ খ্রিস্টাব্দ)। মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক নব্য ভারতীয় ভাষা বাংলার জন্ম হয়।

রেখচিত্রের সাহায্যে বাংলা ভাষার জন্মবৃত্তান্ত নির্দেশ করা যেতে পারে—

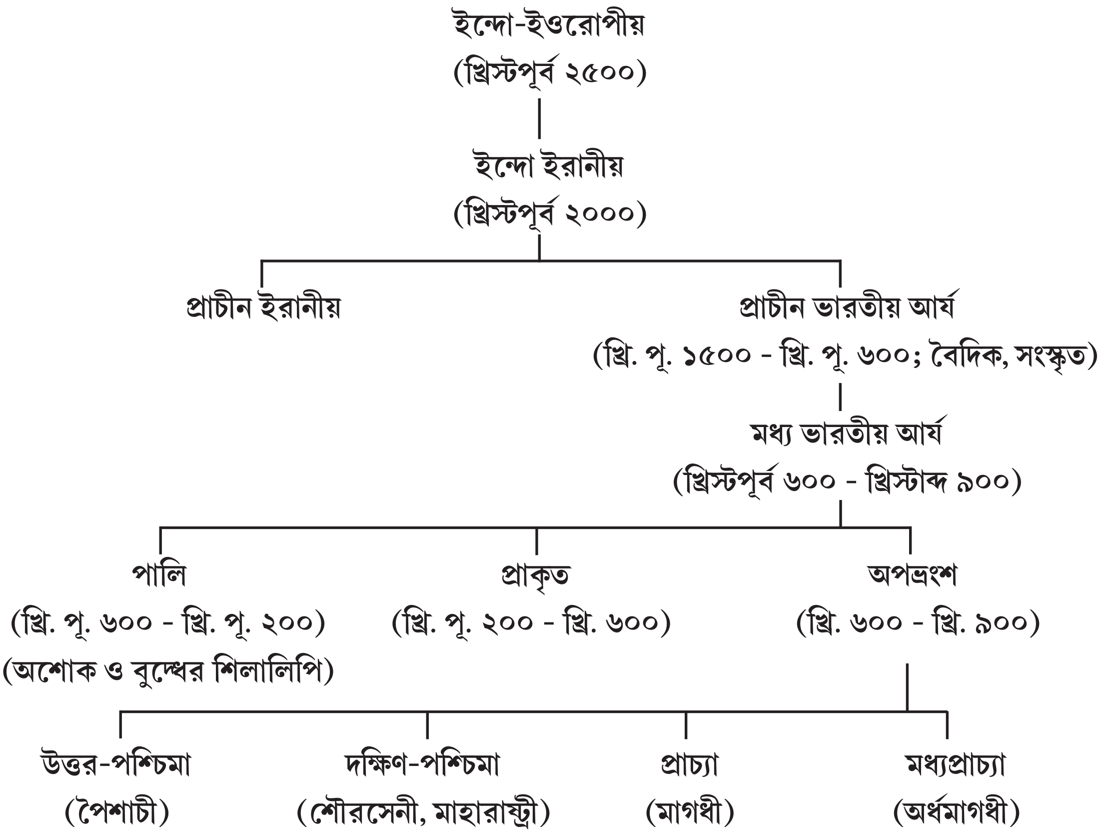

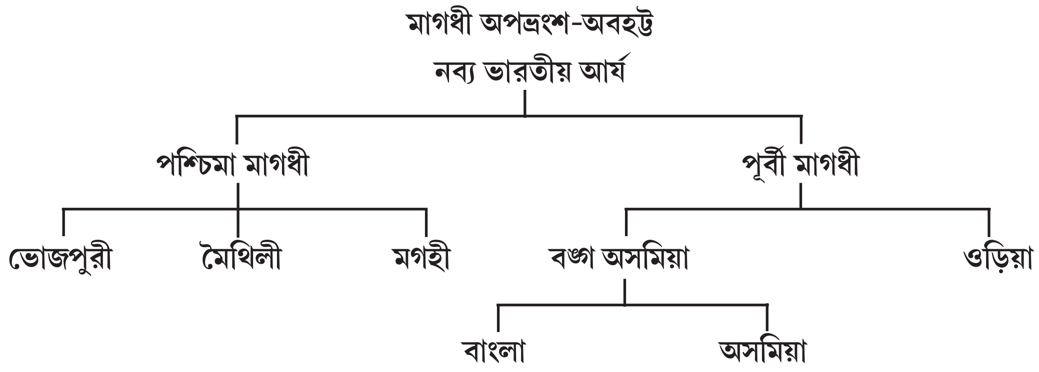

১.৬. বঙ্গলিপির পরিচয়

ভাষা আবিষ্কারের বহু সহস্র বছর আগে থেকেই মানুষ মনের ভাবকে প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করেছিল। তাই মুখের কথাকে স্থানকালের গণ্ডী পার করে স্থায়ী রূপ দেবার চেস্টা থেকেই লিপির উদ্ভব। লিপি উদ্ভবের আগে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য অঙ্গভঙ্গী ও চিত্রাঙ্কনের সাহায্য গ্রহণ করত। ভাষার প্রাচীনতা উৎস অন্বেষণে লিপির গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেছেন। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থে ড. রামেশ্বর শ প্রচলিত লিপিগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—১. সুমেরীয় বাণমুখ লিপি বা কীলকাকার লিপি, ২. চীনীয় চিত্রলিপি, ৩. মিশরীয় লিপি, ৪. সম্ভাব্য ভারতীয় লিপি।

প্রাচীন ভারতের আদি লিপিমালা দু'টি— ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। এদের থেকে পরবর্তী কালের সমস্ত ভারতীয় লিপির জন্ম। এদের মধ্যে খরোষ্ঠীর উৎস নিঃসন্দেহে বহির্ভারতীয়-সেমীয়। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির উৎস সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়েছিল। এডওয়ার্ড টমাসের (Edward Thomas) মতে ব্রাহ্মী লিপি ভারতের প্রাকআর্য জাতি দ্রাবিড়দের আবিষ্কার। সুধাংশু কুমার রায়ের সিদ্ধান্ত হলো— সিন্ধুলিপি (Indus Script) থেকে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম। কিন্তু সিন্ধুলিপির সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয় নি। সুতরাং এই মত এখনো নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। ড'সন(Dowson) ও কানিংহাম (Cunningham) মনে করেন ভারতীয় পুরোহিতেরা চিত্রলিপি থেকে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মী লিপি রচনা করে। ব্রাহ্মী লিপির ভারতীয় উৎসের সমর্থনে বলিষ্ঠ তথ্য-প্রমাণ না থাকায় উপর্যুক্ত মতগুলি গ্রহণ করা যায় না।

ব্রাহ্মী লিপির প্রসারের ফলে এর নানা আঞ্চলিক রূপ গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপির তিনটি প্রধান আঞ্চলিক রূপ পাওয়া যায়— উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় ও বহির্ভারতীয়। ক্রমবিকাশের নানা স্তরের মাধ্যমে উত্তর ভারতীয় লিপি থেকে বাংলা, নাগরী প্রভৃতি, দক্ষিণ ভারতীয় লিপি থেকে তামিল, তেলুগু প্রভৃতি এবং বহির্ভারতীয় লিপি থেকে তিব্বতী, বর্মী, শ্যামদেশীয়, যবদ্বীপী প্রভৃতি লিপির জন্ম হয়েছে।

ব্রাহ্মী লিপি থেকে যে উত্তর ভারতীয় লিপিটি গড়ে উঠেছিল তা পূর্ণ বিকশিত বিশিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে অর্থাৎ গুপ্তযুগে। এই জন্যে তখনকার উত্তর ভারতীয় লিপিকে

'গুপ্তলিপি' বলা হয়। এই গুপ্তলিপি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়— পূর্বী ও পশ্চিমা। এই পূর্বী ধারাটি আবার দু'টি উপধারায় বিন্যস্ত হয়ে যায় পূর্বী ও পশ্চিমা। গুপ্তলিপির পূর্বী ধারার পশ্চিমা উপধারা থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির জন্ম হয়। এই সিদ্ধমাতৃকা লিপির একটি জটিলতর রূপ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গড়ে উঠে; তার নাম হয় 'কুটিল লিপি'। ড. সুকুমার সেন বলেছেন 'এই কুটিল লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপির উদ্ভব।'

বাংলা লিপির উৎস সম্পর্কে দু'টি মত প্রচলিত আছে। নাগরী লিপির দু'টি প্রকারভেদ গড়ে উঠেছিল পূর্ব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয়। ব্যুলারের (Buhler) মতে এর পূর্ব ভারতীয় রূপটি থেকেই প্রত্ন-বাংলা লিপি (Proto-Bengali Script) খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠে। অন্য দিকে এস. এন. চক্রবর্তীর মতে— 'প্রস্তরে খোদিত উত্তর ভারতীয় লিপির দু'টি শাখা ছিল— পূর্বী এবং পশ্চিমা। পশ্চিমা শাখাটি থেকে সিদ্ধমাতৃকা লিপির জন্ম হয়। আর পূর্বা শাখাটি থেকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রত্ন-বাংলা লিপির জন্ম হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতেই। ড. রামেশ্বর শ-এর মতে 'সিদ্ধমাতৃকা লিপির যে জটিলতর রূপ কুটিল লিপি, তা থেকে দুই স্বতন্ত্র ধারায় প্রায় সমান্তরালভাবে নাগরী ও বাংলা লিপির বিকাশ হয়েছিল, নাগরী লিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয় নি। অবশ্য নাগরী লিপির কিছু প্রভাব প্রত্ন-বাংলা লিপির উপরে পড়েছিল।'

প্রত্ন-বাংলা লিপির নিজস্ব রূপটি খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল। এই প্রত্ন-বাংলা লিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে (খ্রি. নবম শতাব্দী) এবং মহীপালের বাণগড় দানলিপিতে (আনুমানিক ৯৭৫-১০২৬ খ্রি.)। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর বিজয় সেনের দেবপাড়া লিপিতে এবং তারপরে লক্ষ্মণ সেনের তর্পণ-দীঘি লিপিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা লিপির বিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ করা যায়। সেন যুগে চ, ছ, ঝ, ট, ণ, হ প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষর বাদে বাকিগুলি সুগঠিত রূপ লাভ করে। ঢাকায় দ্বাদশ শতকের একটি প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে যে বাংলা অক্ষর পাওয়া গেছে বিশেষজ্ঞদের মতে তাতে 'বাংলা অক্ষরের পূর্ণ আকার প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল।' বাংলা লিপির বিস্তার সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "ব্রাহ্মী অক্ষর... খ্রিস্টীয় ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অক্ষরের জন্মদান করিয়াছে। দেবনাগরী অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির আরেকটি রূপান্তর মাত্র। দেবনাগরী অক্ষর হইতে বাংলা লিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নাগরী অক্ষরের আদিম রূপ দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উত্তর-ভারতে প্রভুত্বস্থাপনের পূর্বেই বাংলা লিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে।... দক্ষিণ-পশ্চিমের এই নাগরী লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে অনেক পরে অন্ততঃ ১০ম শতাব্দীর পূর্বে নহে।"

বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাগীতিগুলি খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হলেও ঐ সময়ের লেখা চর্যাগীতির কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি। চর্যাগীতির যে পুঁথিটি নেপালের রাজদরবার থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন তাতে কোনো লিপিকাল লিখিত নেই। ড. সুকুমার সেনের মতে তার লিপিকাল আনুমানিক চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে। আবার বাংলা ভাষার আদি-মধ্য যুগের নিদর্শন কবি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয়

নি। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ যে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন তার লিপিকালও কারও মতে আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দী। তবে এই পুঁথিতে বাংলা লিপির আরো এক ধাপ লক্ষণীয় অগ্রগতির চিহ্ন রয়েছে। এই অগ্রগতি সাধিত হতে কম পক্ষে দু-এক শতাব্দী লেগেছিল। অর্থাৎ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির লিপিকালের মধ্যে দুই-একশ বছর ব্যবধান হওয়াই স্বাভাবিক।

এর পরে বাংলা লিপির আরও একবার পরিবর্তন-পরিমার্জন হয়েছে মুদ্রাযন্ত্রের সৌজন্যে। সমগ্র বাংলা লিপির কাঠামো তৈরি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। মাঝখানে বাংলা লিপির দুই-একটি বিচ্ছিন্ন মুদ্রিত রূপের উল্লেখ বা নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে বাংলা লিপির সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। বাংলা মুদ্রিত লিপির প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডলিখিত 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে (১৭৭৮)। ড. সুকুমার সেনের মতে 'এই ব্যাকরণে বাঙ্গালা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল।' 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথির সময় থেকেই বাংলা লিপির যে আকৃতি গড়ে উঠেছিল তার ক্রমবিকশিত রূপটি সামনে রেখে কালীকুমার রায় ও খুসমৎ মুন্সীর হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স হ্যালেডের ব্যাকরণের জন্যে বাংলা ছাপা লিপির যে আদর্শটি গড়ে দেন সেই অনুসারে পঞ্চানন কর্মকার ও মনোহর কর্মকার বাংলা লিপির ছাঁদ তৈরি করে দেন। সেই ছাঁদে বাংলা লিপির যে মূল রূপটি দাঁড়িয়ে যায় মোটামুটি তা-ই দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা ছাপা লিপির আদর্শ হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে বাংলা বানান-সংস্কার ও ছাপার জগতে লাইনো টাইপ, মনোটাইপ ইত্যাদি প্রবর্তন ও অফসেট মুদ্রণ-রীতি প্রভৃতি নতুন-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাংলা লিপির সরলীকরণ ও সুদৃশ্য রূপায়ণ হয়ে চলেছে।

১.৭. বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজন

জাতির পরিচয়, সমাজের পরিচয় ও তার ইতিহাস বিধৃত থাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। তাই কোন জাতি বা সমাজের কথা অনুধাবন করতে গেলে সময়ের বিভাজন করাটা খুব জরুরি হয়ে পড়ে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে 'যুগ বিভাগ' কথাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন ব্যবহৃত হয়।

উনিশ শতকে 'সাহিত্যের ইতিহাস' নামক প্রকরণের পথ চলা শুরু হয়েছিল এবং সেখানেই সর্বপ্রথম সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাংলা সাহিত্যকে জানতে যুগবিভাজনের প্রস্তাব রেখেছেন। 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) গ্রন্থে রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম যুগবিভাজন করেছেন 'আদ্যকাল', 'মধ্যকাল', 'ইদানীন্তনকাল'-এর মধ্যে দিয়ে। 'আদ্যকাল' অংশে বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাসদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'মধ্যকাল' অংশে চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শিবায়নের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। 'ইদানীন্তনকাল' অংশে ভারতচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে উনিশ শতকের আধুনিক সাহিত্যিকদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গ এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আবার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) নামক সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা

সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সাহিত্য নির্মাণকে যুগবিভাজনের নিরিখে বর্ণনা করতে আগ্রহী। ‘হিন্দু-বৌদ্ধযুগ’, ‘গৌড়ীয় যুগ অথবা শ্রীচৈতন্য-পূর্ব সাহিত্য’, ‘শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য বা নবদ্বীপের ১ম যুগ’, ‘সংস্কার যুগ’, ‘কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ অথবা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ’ এই যুগবিভাজন দীনেশচন্দ্র সেনের মস্তিষ্কপ্রসূত।

বস্তুত রামগতি ন্যায়রত্ন থেকে দীনেশচন্দ্র সেন সকলেই সাহিত্যের ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করতে গিয়ে যুগবিভাজনকে সামনে রাখতে আগ্রহী। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ধারা আরও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যেকে যুগবিভাজনের প্রয়োজনীয়তাকে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের কমপক্ষে বয়স হল হাজার বছর। এই হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের নানা দিক আলোকিত হয়েছে; এমনকি আরও অনেক দিক আলোকপাত করার অপেক্ষায় আছে। এই সমস্ত বিষয় ও বৈচিত্র্যকে সুশৃঙ্খলভাবে বুঝতে চাইলে যুগবিভাজনের ক্রমপরম্পরার সূত্রটিকে সর্বপ্রথম অনুধাবন করতে হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা ভাষা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসকে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ এই তিন পর্বে বিভক্ত করেছেন।

প্রাচীন যুগ (আনুমানিক ৯০০ খ্রি.—১২০০ খ্রি.) : বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্ণয়ে আমরা প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিকে ধরে এগোতে পারি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংরূপ অনুসন্ধানে বহু মনীষা অবদান রাখলেও সবার আগে নাম করতে হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক চর্যাগীতিকোষের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের সামনে উঠে আসে। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হলো চর্যাপদ। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কোনো এক সময়-পর্বে রচিত বলে অনুমান করা হয় এই গ্রন্থ। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির সুবিপুল ঐতিহ্যের ক্ষেত্রভূমি ছিল এই বাংলা। এই বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়ারা ধর্ম-দর্শন প্রচারের জন্য যে পদসমূহ রচনা করেছিলেন তারই একটি অংশ ‘চর্যাগীতি’ নামে পরিচিত।

মধ্যযুগ (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি.—১৮০০ খ্রি.) : মধ্যযুগের সময়সীমা ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলে ধরা হয়। এই সময়সীমাকে দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায় :

ক. আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ (আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি.—১৫০০ খ্রি. পর্যন্ত)

খ. অন্ত্য মধ্যযুগ (আনুমানিক ১৫০০ খ্রি.—১৮০০ খ্রি.)

এই সময়পর্বে বড়ুচণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য রচিত হয়েছিল, যাকে আমরা বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য যুগের নিদর্শন বলে অভিহিত করি। আবার এই মধ্যযুগেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পদকর্তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে পড়ে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ পদকর্তাদের নাম এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই মধ্যযুগেই রচিত হয়েছে চৈতন্যজীবনী কাব্য (বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত’, জয়ানন্দের চেতন্যমঙ্গাল’, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গাল’)। প্রসঙ্গাত

স্মরণীয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গালকাব্য সবচেয়ে সমৃদ্ধতম শাখা। মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল এবং শিবায়ন কাব্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। আরাকান রাজসভায় রচিত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে। সর্বোপরি অষ্টাদশ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভার কবি তথা অন্নদামঙ্গাল কাব্যের স্রষ্টা ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার সমাপ্তি হয়েছে বলে ভাবা হয়।

আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রি.—বর্তমান কাল) : উনিশ শতক থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্য নিদর্শনসমূহকে আধুনিক যুগের সাহিত্য বলে ধরা হয়। ছাপাখানার সৌজন্যে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তার ঘটেছিল বিপুলভাবে। উনিশ শতকে গদ্য রচনার সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদল শুরু হয়েছিল। মিশনারিদের হাত ধরে বাংলা গদ্যের বিস্তার লাভের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিল এদেশীয় মনীষীরা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে বাংলা গদ্য রচনার যে নির্দেশনাকে সামনে রেখে এদেশীয় যেসকল মনীষীরা গদ্য রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসুর নাম স্মরণীয়। আবার ধর্মীয় সংস্কার ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিজেদের মতামত জানাতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত সহ একাধিক ব্যক্তি বাংলা গদ্যকে বেছে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে একাধিক প্রকরণ বিস্তার লাভ করেছিল, যেমন উপন্যাস, নাটক, গল্প এবং সাহিত্যের ইতিহাস। উপন্যাস নামক প্রকরণের সার্থক স্রষ্টা রূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বলে স্বীকৃত। আবার এই উনিশ শতকেই বাংলা নাটক ও প্রহসনের বিস্তার ঘটেছিল। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম উল্লেখ করতে হয়। উনিশ শতক বাংলা থিয়েটারে মজেছিল। এই থিয়েটার ছিল বাঙালির কাছে আধুনিকতার অন্যতম শিল্প প্রকরণ। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন সহ একাধিক কবি উনিশ শতকের বাংলা কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের শরীরে সময়ের ছাপ আরও স্পষ্ট হয়েছিল। বাস্তব জীবনের সমস্যা থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসনের সমস্যাবহুল ঘটনাপঞ্জি বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছিল। সর্বোপরি প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য ধারায় নতুন বাঁকবদল লক্ষ করা গেল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৭১) নামক রাষ্ট্রের জন্ম হওয়াতে 'বাংলাদেশের সাহিত্য' যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে তেমনই পশ্চিমবঙ্গা ও বহির্ববঙ্গের (আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত, বিহার, ঝাড়খণ্ড) বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

১.৮. সারাংশ

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানতে গেলে শুরুতেই যুগবিভাজন ও তার স্তরসমূহ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তই প্রয়োজন। রামগতি ন্যায়রত্ন থেকে শুরু করে দীনেশচন্দ্র সেন সহ একাধিক সাহিত্যের

ইতিহাস প্রণেতা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজন করেছেন। প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিকযুগে বিন্যস্ত বাংলা সাহিত্যধারাকে জানতে প্রথমেই বাংলা দেশের ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করতে হয়। 'বঙ্গ', 'বঙ্গাল', 'বাঙ্গাল', 'গৌড়', 'রাঢ়', 'বরেন্দ্র' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রাচীন বাংলার জনপদের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশের ক্ষেত্রে। বাংলা জনপদের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশের সঙ্গেই বাঙালি জাতির উৎস অনুসন্ধানের প্রসঙ্গটিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা বংশের অন্তর্গত বাংলা ভাষা দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের আধুনিক বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছ। বাংলা ভাষার উৎসমূলে পৌঁছাতে আমরা সাহিত্য নিদর্শনকে সামনে রাখতে পারি। চর্যাপদে ভুসুকপার পদে 'বঙ্গালী' শব্দটির উপস্থিতি চোখে পড়ে। আবার মহাভারতের অনুবাদক শ্রীকর নন্দী 'দেশি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন নিজ মাতৃভাষারূপে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে 'ভাষা' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সকল সাহিত্য নিদর্শনকে সামনে রেখে এবং ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার উৎসমূলে পৌঁছাতে চেষ্টা করেছেন গবেষকরা। তবে যখন বাংলা ভাষা অক্ষররূপে যখন তার পূর্ণ অবয়ব পায়নি তখন বঙ্গ লিপির পরিচয় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রত্ন-বাংলা লিপির নিজস্ব রূপটি খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতেই গড়ে উঠেছিল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক ব্যক্তি বলেছেন ব্রাহ্মী লিপি থেকে বঙ্গ লিপির উদ্ভব হয়েছে। পরিশেষে বলতে পারি বাংলা দেশের জনপদ থেকে শুরু করে বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, বঙ্গলিপির পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারি। এই আলোচনার উৎস নিহিত আছে বাংলা সাহিত্যের যুগগত বিভাজনের মধ্যে।

১.৯. অনুশীলনী

❑ **বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১. সাহিত্যে যুগবিভাগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২. প্রসঙ্গ সহ বাংলা সাহিত্যে যুগবিভাগের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা নির্দেশ করুন।

৩. বাংলা সাহিত্যে যুগবিভাগের স্তরগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাঙালি জাতির উৎস ও পরিচয় সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

৫. বাংলা দেশের ভৌগোলিক পরিচয় নির্দেশ করুন।

৬. রেখচিত্রের সাহায্যে বাংলা ভাষার উৎস নির্দেশ করুন।

৭. বঙ্গালিপির উৎস সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করুন।

৮. 'বাঙ্গালা' শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে কোন সময়ে বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছিল?

❑ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১.১০. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. গঙ্গোপাধ্যায়, *রিনি, বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের ইতিহাস*, সোনার বাংলা প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮

২. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সুপ্রিম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা, ১৯৯১

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০১০-২০১১

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ২০১৯

৫. ভট্টাচার্য, পরেশ, *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৭

৬. শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৯

৭. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা.), সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ, ২০০৯

৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ২০১৩

■ **পত্র-পত্রিকা :**

১. দাস, জয়দেব (সম্পা.), *চারুপাঠ*, প্রাচীন বাংলা সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০২৩

একক-২ ❑ চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২.১. উদ্দেশ্য

২.২. প্রস্তাবনা

২.৩. চর্যাগীতি

২.৩.১. চর্যাগীতির আবিষ্কার

২.৩.২. পুঁথি পরিচয়, প্রকাশ ও সম্পাদনা

২.৩.৩. রচনাকাল

২.৩.৪. পদকর্তা

২.৩.৫. সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব

২.৩.৬. সন্ধ্যাভাষা

২.৩.৭. সমাজচিত্র

২.৩.৮. সাহিত্যমূল্য

২.৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

২.৪.১. আবিষ্কার, পুঁথি পরিচয়, প্রকাশ ও সম্পাদনা

২.৪.২. রচনাকাল

২.৪.৩. কবি পরিচয় ও চণ্ডীদাস সমস্যা

২.৪.৪. কাব্য কাহিনি

২.৪.৫. কৃষ্ণ

২.৪.৬ রাধা

২.৪.৭. বড়াই

২.৪.৮. সমাজচিত্র

২.৪.৯. সাহিত্যমূল্য

২.৫. সারাংশ

২.৬. অনুশীলনী

২.৭. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

২.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- প্রাচীনযুগ এবং আদি-মধ্য যুগে রচিত সাহিত্য নিদর্শনকে সামনে রেখে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- চর্যাগীতির আবিষ্কার, সম্পাদনা এবং রচনাকাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।
- চর্যাগীতিগুলি পাঠের মধ্যে দিয়ে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালী তথা প্রাচীন বাংলার ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে।
- চর্যাগীতিগুলি পাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-কৃষ্টি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- সর্বোপরি পাঠের মধ্যে দিয়ে চর্যাগীতিগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করতে পারবে।
- বাংলা সাহিত্যে আদি-মধ্য যুগের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কার, সম্পাদনা এবং রচনাকাল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।
- আদি-মধ্য যুগের একমাত্র নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য পাঠের মধ্যে আদি-মধ্য যুগে নারী-পুরুষের সম্পর্ক থেকে শুরু করে তৎকালীন সময় পর্বে প্রচলিত আচার, সংস্কার তথা সাংসারিক জীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

২.২. প্রস্তাবনা

আলোচ্য এককের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হলো চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করার স্বার্থে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের আবিষ্কার, রচনাকাল, সম্পাদনার ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। এই অনুষঙ্গের সূত্র ধরেই চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে বর্ণিত দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতি, লোকাচার থেকে শুরু করে সাধনপদ্ধতি, ধর্মভাবনা, ভাষা ব্যবহার সহ একাধিক বিষয়কে এই প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধারাবাহিক কালানুক্রমিক সময় পরিসরের মানুষজনকে জানতে এবং বুঝতে গ্রন্থে বর্ণিত চরিত্রসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই ভাবনাকেই মান্যতা দিয়ে এই পাঠ পরিকল্পনায় চরিত্রসমূহের বিশেষ দিকগুলির বিবরণ তুলে ধরার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

২.৩. চর্যাগীতি

চর্যাগীতির আবিষ্কার ধ্রুপদী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এই অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদানগুলি শিক্ষিত সমাজের নজরের

বাইরে ছিল। চর্যাগীতি আবিষ্কারের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে পদকর্তা বিদ্যাপতির রচনাবলীকেই ধরা হতো। অন্যদিকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দীনেশচন্দ্র সেনের 'The History of Bengali language and literature' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে বৌদ্ধ প্রভাবের কথা উল্লিখিত হলেও তাঁর আলোচনা প্রধানত গোপীচন্দ্রের গান, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি কতগুলি লৌকিক উপাদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। চর্যাগীতিগুলি আবিষ্কার ফলে ইতিহাসের এই শূন্যস্থান পূরণ ও পূর্বে অনুমিত সূত্রের পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো এই চর্যাপদ।

২.৩.১. চর্যাগীতির আবিষ্কার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় বাংলার বাইরে রক্ষিত নেপালের রাজ দরবারে। প্রকৃতপক্ষে নেপাল ও তিব্বতে রক্ষিত বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থের ওপরে প্রথম নজর পরে বিদেশী গবেষকদের। বাঙালি গবেষকরাও এই ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নেপালে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধপুঁথির সন্ধান করেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। 'Sanskrit Buddhist literature in Nepal' নামে একটি পুঁথি-সন্ধান তালিকা প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বাংলা-বিহার-অসম-ওড়িশার পুঁথি সন্ধান ও সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি আরও সংগ্রহ করেন সরোহপাদের দোহা, ডাকার্নব, আচার্যপাদের দোহা, সংস্কৃতি রচিত 'মেখলা' প্রভৃতি।

২.৩.২. পুঁথি পরিচয়, প্রকাশ ও সম্পাদনা

নেপালের রাজ দরবারে রক্ষিত পুঁথিটির প্রথম পত্রের সম্মুখ পৃষ্ঠায় পুঁথির পরিচয় হিসাবে নাগরী হরফে 'চর্যাচর্য্যটীকা' কথাটি লেখা ছিল। চর্যাপদের পুঁথিটি তাল পাতায় পুরোনো বাংলা অক্ষরে (লিপিতাত্ত্বিকদের ভাষায় প্রত্ন বাংলা অক্ষরে) লেখা। পুঁথির দীর্ঘতর পাতাগুলির আকার মোটামুটি ১২ ৮/১০ × ১ ৯/১০। পুঁথির শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯। ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৬৬ সংখ্যক পৃষ্ঠাগুলি পুঁথিতে নেই। প্রতিপত্রের দুই পৃষ্ঠাতে লেখা। পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় পত্র সংখ্যা উল্লেখ করা আছে। প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটি পঙক্তি বিদ্যমান (ব্যতিক্রম ৬৫)। প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও পঞ্চম পংক্তি একটানা লেখা; দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঙক্তির প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বর্গাকৃতির ব্যবধান আছে। পুঁথির বন্ধন সূত্রের জন্যই ছিদ্র রাখার উদ্দেশ্যে এই ব্যবধান। চর্যাপদের পুঁথিটি আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

২.৩.৩. রচনাকাল

চর্যাপদের সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে কেউই ঐক্যমত পোষণ করেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলিকে অবশ্য 'হাজার বছরের পুরান' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তগুলির প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয়ের অনুপযোগী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা ছিল যে এই পুঁথিটি চর্যাগীতি সংগ্রহের মূল পুঁথি। সুতরাং এই পুঁথির ভাষার কাল ও গানগুলির রচনাকাল অভিন্ন। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে তার পুঁথি পুরাতন চর্যাগীতির সঠিক সংকলনের অনুলিপি মাত্র। এর সংকলনের সময় এবং গানগুলির আদি রচনায় কালগত ব্যবধান ছিল। পুঁথির ভাষা বিচার করে গানগুলোর প্রকৃত রচনাকাল নির্ণয় খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে গানগুলির রচনাকালকে একটা নির্দিষ্ট শতাব্দীতে সীমাবদ্ধ না করে একটি ব্যাপকতর আনুমানিক কালসীমায় স্থাপন করাই সঙ্গত। আচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে চর্যার গানগুলি ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর রচনা। মহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে এই গানগুলির রচনাকাল ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দী। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে চর্যাগানের রচনাকাল ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী।

২.৩.৪. পদকর্তা

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র যে খণ্ডিত পুঁথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন তাতে ৪৬টি সম্পূর্ণ গান ও একটা ভগ্নাংশ বিদ্যমান। অধিকাংশ গানেই কবির নামাঙ্কিত ভণিতা লক্ষণীয়। তবে গানের টীকাকার বা পুঁথির লিপিকার প্রত্যেক কবির নাম উল্লেখ করেছেন। মূল গানে এবং টীকায় যে পদকর্তাদের নাম রয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যার প্রথম পদকর্তা লুইপা। অন্যান্য পদকর্তারা হলেন কুক্কুরী পা, বিরুবা পা, গুণ্ডরী পা, ভুসুক পা, কাহ্ন পা, শবর পা, টেন্টন পা, ডোম্বী পা, চাটিল পা প্রমুখ। সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেছেন কাহ্ন পা। তাঁর রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩। চর্যাগীতি সংগ্রহের প্রথম কবি লুই। শুধু পদসংখ্যার ক্রমানুসারে নয়, তিব্বতী ঐতিহ্যে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় লুই পা তাদের মধ্যে আদিতম।

২.৩.৫. সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব

চর্যাপদের রচয়িতারা সহজিয়াপন্থী। সহজযানী পদকর্তারা তাঁদের পদের মধ্যে দিয়ে সহজিয়া সাধনার কথাই বলেছেন। চর্যাপদের অন্তরালে গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে। আর বহিরঙ্গে বলা হয়েছে— রক্তমাংসের মানবদেহেই বোধিলাভ সম্ভব এবং বিশুদ্ধীভূত প্রেম বোধিপথের আলোকবর্তিকা। পদকর্তারা বলতে চেয়েছেন প্রেম চিত্তকে উন্নত করে রাগদ্বেষাদি নির্মূল করে স্থূল দেহকামনার বিনাশ ঘটিয়ে সংকীর্ণ অহংচেতনার বিলোপসাধন এবং আত্মপর বিভেদবোধের অবসানের মাধ্যমে বোধিচিত্তের ক্রমজাগরণ ঘটায়। তখন নশ্বর শরীরেই বোধির স্ফূরণ ঘটে। সহজযানী সম্প্রদায়ের মতে, বোধি পরমানন্দময় বিজ্ঞান বিশেষ।

চর্যাগীতিতে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে ধর্মীয় সাধন প্রণালী বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। এই চর্যাপদে ধর্মচিন্তা বহুলাংশে তন্ত্র প্রভাবিত। তন্ত্রসাধনার অনেক বহিরঙ্গ দিক আছে। চর্যাগীতির সহজিয়া সাধকরা তন্ত্রের এই বহিরঙ্গ দিকগুলিকে বাদ দিয়ে মূল সাধনার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তন্ত্রের মূল সাধনা কায় সাধনা অর্থাৎ দেহের মধ্যে পরম সত্যের অবস্থান এবং সাধনায় দেহকে অবলম্বন করলেই এই সত্যের উপলব্ধি

ঘটে। সহজিয়া সাধকরাও তাঁদের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি এই দেহের ভিত্তিতেই প্রতিপাদন করেছেন। তাদের ধর্ম মতে বোধিচিত্ত বা মহাসুখই হচ্ছে পরম সত্য এবং সাধকের পরম কামনার বিষয়। প্রজ্ঞারূপিনী শূন্যতা ও উপায়রূপিণী করুণাকে সাধনার দ্বারা মিলিত করলেই এই মহাসুখ লাভ হয়। এই মহাসুখ শূন্যতা ও করুণার তত্ত্বকে সহজিয়া সাধকরা দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর স্থাপন করেছেন এবং এই জন্য দেহের মধ্যে তাঁরা চারটি চক্র বা পদ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। প্রথম চক্র নাভিতে অবস্থিত যা 'নির্মাণ চক্র' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে স্থিত 'ধর্মচক্র'। তৃতীয় চক্র কণ্ঠে স্থিত 'সম্ভোগ চক্র'। সর্বোপরি চতুর্থ চক্র মস্তিষ্কে স্থিত 'সহজচক্র' বা 'মহাসুখ চক্র' নামে পরিচিত।

চর্যাগীতির পদকর্তারা সাধন প্রণালীকে নানা রূপকের আবরণে ব্যক্ত করেছেন। সাধন প্রণালীর অবলম্বন কোথাও দেহ, কোথাও নগরী, কোথাও মায়াজাল, কোথাও রথ, কোথাও আবার বীণা রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। উল্লেখিত চক্রগুলি চর্যাগীতির কতগুলি পদের রূপকে গৃহীত হয়েছে। এবং চক্রস্থিত বোধিচিত্ত যোগিনী, ডোম্বী, চন্ডালী, শবরী প্রভৃতি নানা রমণীর রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। এছাড়াও নারী তিনটি কোথাও কোথাও নদীতট, সাঁকো, চন্দ্র, সূর্য, নৌকো, দাঁড় প্রভৃতির রূপকে গৃহীত হয়েছে। প্রথম পদে লুই পা দুই নারীকে একত্র করে সাধকের অদ্বয় মহাসুখ অবস্থানের কথা বলা হয়েছে—

ভণই লুই আম্‌হে ঝাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।।

আবার পঞ্চম গানটিতে চাটিল পা এই অদ্বয় সাধন প্রণালীর ইঙ্গিত করেছেন নদী ও সাঁকোর রূপকের মধ্যে দিয়ে—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।

নদীর দুই পাড়ে কাদা মাঝখানে থৈ নেই। এই অথৈ মাঝখান দিয়ে যাবার জন্য চাটিল সাঁকো গোড়লেন। এই সাঁকোতে দুই পাড়ের মিলন হলো। সাঁকো গড়তে মোহ রূপ তরুকে অদ্বয় রূপ টাঙ্গি দিয়ে ফেড়ে পাটাতন হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এই নদী সাঁকোর রূপক সর্বপ্রকার দিত্ব বর্জিত মধ্যমার্গের অদ্বয় সহজ সাধনারই প্রতিরূপ। নদীর দুই তীর দেহের বামগা-দক্ষিণগা দুই ধারা, সাঁকো মধ্যগামী অবধূতী মার্গ। প্রসঙ্গাত এই অনুষঙ্গে আট সংখ্যক পদে কম্বল পা বলেছেন—

সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।

করুণা নৌকো সোনায় পূর্ণ, রুপো রাখবার জায়গা নেই। অর্থাৎ করুণা ও শূন্যতার মিলন হলে রূপ জগতের অস্তিত্ব থাকে না। এই নৌকার গতিও 'গঅণ উবেসেঁ' অর্থাৎ গগনের উদ্দেশ্যে। বস্তুত, নিম্নস্থ নির্মাণ চক্র থেকে ঊর্ধ্বস্থ মহাসুখচক্রে যাত্রার কথা বলেছেন পদকর্তা।

২.৩.৬. সান্ধ্য ভাষা

চর্যাপদের মূল বিষয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের আধ্যাত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ নির্দেশনা দান। এই নির্দেশনা দান উপলক্ষে গানগুলি রচিত কিন্তু এই নির্দেশনা বা উপদেশ ঠিক সরাসরি সর্বজনবোধ্য ভাষায় দেওয়া হয়নি। আসলে বক্তব্যকে কতগুলি ভিন্ন অর্থের সাহায্যে আচ্ছন্ন করা হয়েছে। ফলে চর্যার ভাষার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটি করে অর্থ বর্তমান। একটি অর্থ বাহ্য বা লৌকিক। অপর একটি অর্থ গূঢ় এবং পরিভাষক, যা একমাত্র দীক্ষিত সাধকদের অবগত হওয়ার জন্যই ব্যবহার করেছেন পদকর্তারা। চর্যার ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা বলা হয় কারণ এই সান্ধ্য ভাষা মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কিছু বোঝা যায় আবার কিছু বোঝা যায় না। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধ্যা ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'সন্ধ্যা ভাষার মানে আলোআঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।' অর্থাৎ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধ্যা অর্থে এই ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির সন্ধ্যার নৈসর্গিক অস্ফুটতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।

২.৩.৭. সমাজচিত্র

চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র বিদ্যমান। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ সেক্ষেত্রে সমাজের ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ চর্যার গানগুলির মধ্যে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। চর্যাগীতিতে যে কয়েকটি জীবিকার প্রসঙ্গ আছে তা খুব একটা উচ্চমানের নয়। এখানে ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, সূত্রধর ইত্যাদি যেসব বৃত্তিনির্ভর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। চর্যাগীতি মূলত বাংলা দেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধন সংগীত। তাই, তাদের রচনায় উপমান ব্যবহারে বাংলা দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এই ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রাধান্য অনুসারে নাব্য প্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রে গণ্য কেননা বাংলা দেশ বিশেষভাবে নদীমাতৃক সমুদ্র, নদী, খাল, বিলের সমাহারে বাংলা দেশের ভূপ্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। এই নদী খাল বিলে নৌকো চালনা সাঁকো নির্মাণের রূপক চর্যাকারেরা যে কত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। এ কারণে চর্যাকার চাটিল পাদ ৫ নং পদে বলেন—

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।

যেখানে এত গভীর জলাশয়ের প্রাচুর্য সেখানে পারাপারের প্রধান উপায় সাঁকো আর নৌকো। চাটিল পাদের গানে এই সাঁকো নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ আছে—

ফাড্ডিঅ মেহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।।

চর্যাকাররা ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ সুতারাং ধর্মচারের দিক থেকে তাঁরা দেব বহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির পাত্র-পাত্রীরা ডোমনী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। সমাজে উচ্চবর্ণরা যে নিম্নবর্ণদের সম্পর্কে এক ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ত জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় পদকর্তা কাহ্ন পা রচিত ৯ নং পদে—

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ।।

ডোম, শবর, শবরী প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবিত্তেরা নগরের বাইরে জনপদের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহু দূরে জঙ্গালের মধ্যে কিংবা পাহাড়ের গুহায় অথবা মালভূমির উপরে বাস করত। ব্রাহ্মণরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না, তার জন্যই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য চর্যাগীতির ডোমিনী, শবরী, চণ্ডালী কেউই প্রকৃত নারী চরিত্র নয়, আসলে মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপক।

চর্যাপদে বেশ কিছু পেশার উল্লেখ করা আছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মদ চোলাই করা, শিকার করা, গাছ কেটে কাঠের কাজ করা, তুলো ধোনা ও মোটা কাপড় বোনার কথা। সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বিশদভাবে উল্লেখিত না হলেও তাদের জীবনধারা সম্পর্কে যেসব বিচ্ছিন্ন আভাস পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল। যাদের ঘরে হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচরণের সমর্থন করতেন, আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হতো না। পুঁথি পাঠ, ইষ্ট মালা জপ করলেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হতো। কায়িক শ্রম ও শাস্ত্রপাঠাদি বুদ্ধিচর্চা ছাড়াও চৌর্যবৃত্তি ('কানেট চৌরি নিল অধরাতি' ২ নং পদ, কুক্কুরী পা রচিত) এবং দস্যুবৃত্তির উল্লেখ আছে।

চর্যাগীতিতে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণির জনগণের যাপনচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। সেকালের পারিবারিক কাঠামো ছিল যৌথ প্রকৃতির। শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, শালী, স্ত্রী, পুত্রবধূ সকলকে নিয়েই পারিবারিক সংগঠন। একাধিক চর্যায় (২, ৪, ১১) এই যৌথ পারিবারিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। পারিবারিক সম্পর্ক সম্ভবত দৃঢ়বদ্ধ ছিল। পরিবারের মধ্যে থেকে প্রকাশ্য ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের তেমন অবকাশ ছিল না। তাই কাহ্ন (১১নং পদ) যখন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হন তখন তাঁকে পরিবারের শ্বশুর, ননদ, শালী প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে তবে প্রেমিকার সঙ্গো মিলিত হতে হয়। অন্যদিকে পুত্রবধূর পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলেও তাকে প্রকাশ্যে পারিবারিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্য শ্বশুরের নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।

এছাড়াও চর্যাপদে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রসঙ্গো যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ আছে তার সঙ্গো আধুনিক বাঙালি সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সন্তান প্রসবের জন্য একটি পৃথক আতুর ঘরের ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। উপযুক্ত আতুর ঘরের অভাবে যে নবজাতকের প্রাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল।

২.৩.৮. সাহিত্যমূল্য

চর্যাপদ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলার সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থটির প্রামাণ্য উদাহরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়। প্রথমত আমরা চর্যাপদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলাকে স্পর্শ করতে পারি। ফলে চর্যার গানগুলির মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে যাই এক হাজারেরও বেশি বছর আগের বাংলার ইতিহাস, সভ্যতা ও সমাজ। রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও চর্যাপদের মধ্যে আমরা মোটামুটি পাই পাল যুগ এবং তার সমসাময়িক ইতিহাস। সেই সময়ের ধর্ম-দর্শন থেকে শুরু করে তৎকালীন অর্থনীতি সম্পর্কিত ধারণা, জাতপাত, বর্ণভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ। মানুষের সামাজিক রীতি-নীতির বর্ণনার প্রামাণ্য উদাহরণ মেলে চর্যাপদে। এক কথায় চর্যাপদের মধ্যে প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের বাংলার ইতিহাসকে স্পর্শ করা যায়। সেই কারণেই চর্যাপদ শুধু বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য দলিল নয় বরং ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

চর্যার গানগুলির ঐতিহাসিক সামাজিক মূল্য যেমন আছে, ঠিক তেমনই গানগুলির কাব্য মূল্য অপরিসীম। কোনো কোনো গানে আমরা পাই প্রত্নলিরিকের সন্ধান আবার কোনো গানে আছে ছোটো গল্পের আভাস। সবমিলিয়ে চর্যাগীতিকোষে আছে আমাদের জীবনের সুস্পষ্ট একটা ছবি। চার্যার দুই সংখ্যক পদে আছে শ্বশুর নিদ্রা গেলে বধূ কামনগরে যায়। মধ্যরাতে চোর তার কর্ণভূষণ চুরি করে—

সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ।।

তিন সংখ্যক গানে আছে এক শুণ্ডিনী মদ চোলাই করে এবং ৬৪ টি ঘড়ায় করে সাজিয়ে রাখে। সেই সময়ে যে মদ্যপানের ব্যবস্থা ছিল তা এই পদের মাধ্যমে জানা যায়—

আইল গরাহক অপণে বহিআ।
চউশঠী ঘড়িয়ে দেঢ় পসারা।।

চার সংখ্যক গানে আছে মুখ চুম্বনের চিত্র। একইভাবে কোনয় গানে আছে সাঁকো নির্মাণের দৃশ্য, কোনো গানে দাবা খেলা, হরিণ শিকারের চিত্র লক্ষ্যণীয়। এই গানগুলিকে জুড়ে নিলে আমরা প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যকে স্পর্শ করতে পারি।

আসলে শ্রেষ্ঠ কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। কাব্য কখনো ধর্মের নিয়মে চলে না, কাব্যের নিয়মে চলে। বাইবেল, ভাগবতে, কোরাণে নানা ধর্মীয় উচ্চারণ থাকলেও আমরা দেখেছি সেখানে ধর্মের ঘেরাটোপ থেকে কাব্য উৎসারিত হয়েছে। মানুষের লোভ মূলত সেখানেই। চর্যাগান ধর্মীয় গীতি হলেও এখানে বাসা বেধেছে নরনারী প্রেম, কিছু মধুর মুহূর্ত, কিছু লজ্জা, ভয়, নৌযাত্রা, দাবা খেলার দৃশ্য। ঢেণ্টন পা রচিত ৩৩ সংখ্যক পদে দেখা পাওয়া যায় সুনিপুণ দরিদ্রতার ছবি—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।।

চর্যাগীতির রচনাকাল আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতক। এই সময়পর্বে বাংলায় পাল রাস্ট্রের পতন এবং বর্মন-সেন রাস্ট্রের আবির্ভাব। আবার সেন রাস্ট্রের তিরোভাবের কালও বটে। সাধারণভাবে এই যুগে হিন্দু অধিপত্যের বিলুপ্তির চিহ্ন রয়েছে। সেই সময়কার বিচিত্র সমাজ যেখানে একদিকে নিয়ম, নিষ্ঠা, আচার এবং অন্যদিকে সমাজ অনুমোদিত অনাচার ব্যভিচার। একদিকে শিল্পসাহিত্যের অনুশীলন এবং অপরদিকে সংস্কৃতির অধঃপতন। একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস কলুষিত আড়ম্বর এবং অন্যদিকে দারিদ্র্যের নিদারুণ ছবিটি স্পস্ট। একদিকে ধর্মাচার এবং অন্যদিকে ধর্মগত উৎপীড়ন ও ভেদ বিচার লক্ষণীয়। ওই ভেদ বিচার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকুতি মৈত্রী ও করুণার জয়গান চর্যাগানের মূল স্বর। এই সামগ্রিক চিত্রই চর্যাগীতির সাহিত্যমূল্যের শ্রেষ্ঠত্বকে নির্দেশ করে।

২.৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আদি-মধ্যযুগের রচিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক সম্পূর্ণ আখ্যান কাব্য হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রাচীনযুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে আমরা যেমন চর্যাপদকে পাই তেমনই মধ্যযুগের একমাত্র আখ্যানকাব্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কথা বলতে হয়। এই কাব্যটিকে আমরা বাংলা ভাষার দ্বিতীয় নিদর্শন এবং মধ্যযুগের কৃস্টির বাহক বলতে পারি। রাধা এবং কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক ও লৌকিক সংমিশ্রণে কাব্যটি গড়ে উঠেছে। এই কাব্যের পটভূমি মূলত গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বীজ পুরাণ থেকে আহরিত হলেও কাব্য- মধ্যে লোকজীবন জায়গা করে নিয়েছে। তাই কাব্যটি বাংলা ভাষায় রচিত আদি-মধ্যযুগের নিদর্শন হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভের পাশাপাশি জনসমাজে বিপুল সমাদর লাভ করেছে।

২.৪.১. আবিষ্কার, পুঁথি পরিচয়, প্রকাশ ও সম্পাদনা

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। বসন্তরঞ্জন রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন তা খণ্ডিত, পুঁথিটির আদি এবং অন্ত্য পাওয়া যায়নি, ভিতরের কয়েকটি পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে বা নস্ট হয়ে গেছে। পুঁথিটি তুলোট কাগজের উপর উভয় পৃষ্ঠায় লেখা। প্রতিটি পৃষ্ঠায় সাতটি করে লাইন। তবে ৩ থেকে ১৫ এই ১৩ টি পৃষ্ঠায় ৮ টি করে লাইন ছিল। পুঁথিটিতে তিন রকমের হাতের লেখা পাওয়া যায় প্রাচীন, প্রাচীনের হুবহু অনুলিপি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুঁথির মধ্যে যে চিরকুটটি পাওয়া যায়, তা থেকে অনুমান করা যায় যে পুঁথিটি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। প্রসঙ্গত ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুঁথিটি গ্রন্থ রূপে প্রকাশ করেন। বসন্তরঞ্জন রায় এই গ্রন্থের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। প্রকাশকালে গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

২.৪.২. রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথিটি খন্ডিত হওয়ায় রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। পুঁথিতে পাওয়া একটি চিরকুটে ১০৮৯ সনের উল্লেখ রয়েছে। লিপি বিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান পুঁথিটি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে রচিত। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথিতে পাওয়া চিরকুট অনুযায়ী কাল নির্ণয় করে জানিয়েছেন পুঁথিটি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত। অপরদিকে ভাষার প্রাচীনতা খেয়াল করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন 'চর্যাপদের পুঁথির পরে বাংলা ভাষার এমন পুথি আর নেই।' ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে দ্বাদশ শতকের জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচনার সঙ্গো এই কাব্যের রচনার সাযুজ্য লক্ষ করে, ছন্দ প্রয়োগ ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব মিলিয়ে বলা যায় কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগে রচিত হয়েছিল। তাই আমরা এক কথায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল হিসেবে আদি-মধ্যযুগকেই নির্ধারণ করি।

২.৪.৩. কবি পরিচিতি ও চণ্ডীদাস সমস্যা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভণিতায় অসংখ্যবার চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস সমস্যার মূল কারণ চণ্ডীদাস নামে আরও কয়েকজন কবির উপস্থিতি। এক্ষেত্রে চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাকর্তা চণ্ডীদাসের নাম করা যায়। প্রসঙ্গাত চৈতন্যমঙ্গাল' কাব্যে জয়ানন্দ কৃষ্ণচরিত কাব্যের অথবা পদাবলীর রচয়িতা রূপে জয়দেব এবং বিদ্যাপতির পর চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করেছেন—

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

প্রকৃত অর্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা কে এই নিয়ে নানামহলে প্রশ্ন উঠেছে। কাব্যের ভণিতায় আমরা তিনজন চণ্ডীদাসের নাম পাই, যথা বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস এবং অনন্ত চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশের পরবর্তীতে চণ্ডীদাস সমস্যা ঘনীভূত হয়েছিল। চণ্ডীদাস বিতর্কে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করেছেন। তবে আমরা মূলত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উল্লেখিত 'চণ্ডীদাস' এই ভণিতাকে সামনে রেখে সমস্যার প্রতি আলকপাত করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে ২৯৮ বার। শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতার উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৭ বার। আবার 'অনন্ত চণ্ডীদাস' ভণিতা উল্লেখ আছে ৭ বার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস এবং অনন্ত চণ্ডীদাস ভণিতার উল্লেখ কবি পরিচিতির সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যা সম্পর্কে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভণিতা হইতে তিনটি পৃথক অনুমান করা যায়। প্রথম, কবির নাম চণ্ডীদাস এবং ইনি বাসুলী দেবীর মন্দিরের সেবক ছিলেন। দ্বিতীয়, কবির নাম অনন্ত এবং ইনি চণ্ডী (বাসুলীর সমার্থক) দেবীর ভক্ত ও মন্দির সেবক ছিলেন তাই বড়ু চণ্ডীদাস নাম লইয়াছিলেন। তৃতীয়, "অনন্ত" ভনিতা প্রক্ষিপ্ত। আবার আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন থেকে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী পর্যন্ত অনেকেই বলেছেন অপরিণত বয়সে চণ্ডীদাস

লিখেছিলেন আদিরস প্রধান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। পরিণত বয়সে তিনি ভাবগভীর পদাবলী লিখেছেন। তবে এই অভিমত যা আজ সমর্থনযোগ্য নয় সেকথা বলাবাহুল্য। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যথেষ্ট পরিণত বয়সের রচনা। পদকর্তা চণ্ডীদাস নিশ্চিতভাবে চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি। কিন্তু তিনি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেছেন তার উপযুক্ত প্রমাণ নেই। পরিশেষে এই কবি পরিচিতি তথা চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধানের জন্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে শিরোধার্য করতে পারি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস, ভণিতায় কবি এইভাবে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। কাব্যের ভিতরে বহুবার কবি নিজেকে এই নামে অভিহিত করেছেন। সুতরাং, তাঁর নাম বড়ু চণ্ডীদাস তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

২.৪.৪. কাব্য কাহিনি

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্য কাহিনি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীকে ভারমুক্ত করার জন্য দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে মথুরাগমন, মথুরা থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধার সঙ্গো মিলনের পর কংস ধ্বংসের জন্য মথুরা যাত্রা ও বিরহী রাধার বিলাপ এই পর্যন্ত পাওয়া যায়, তারপর পুঁথিটি খণ্ডিত। কাব্যটি মোট ১৩ টি খণ্ডে বিভক্ত।

জন্ম খণ্ড : জন্ম খণ্ডের বিষয় কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য দেবতাদের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে এবং লক্ষ্মীদেবী রাধা রূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন।

তাম্বুল খণ্ড : তাম্বুল অর্থ পান। এই খণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে পান-সন্দেশ পাঠিয়ে রাধাকে প্রেম নিবেদন করেন। রাধা তা গ্রহণ করেননি। এই খণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে। এখানে মূলত লৌকিক জীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে।

দান খণ্ড : এই খণ্ডে কৃষ্ণ ও বড়াই ষড়যন্ত্র করে। কৃষ্ণ দানী সেজে রাধার দধি-দুগ্ধ নষ্ট করেছেন এবং রাধাকে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছেন। দান খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের প্রথম দেখা হয়, রাধার অনিচ্ছাকৃত সম্ভোগ ঘটে।

নৌকা খণ্ড : নৌকা খণ্ডে কৃষ্ণ পারাপারের মাঝি সেজে রাধাকে তার পসরা নিয়ে পার করিয়ে দেওয়ার ছলে জলবিহারে বাধ্য করানোর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

ভার খণ্ড : এই খণ্ডে রাধাকে নিজের রূপ যৌবন সম্পর্কে এক সচেতনা নারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে এই অংশটি খণ্ডিত।

ছত্র খণ্ড : এই খণ্ডে রাধার কাছে মিলনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে কৃষ্ণ মথুরার পথে রৌদ্রের উত্তাপ থেকে রাধাকে রক্ষা করার জন্য রাধার মাথায় ছত্র ধরেন।

বৃন্দাবন খণ্ড : বৃন্দাবন খণ্ডে রাধা একজন কামকুশলা নারী, বৃন্দাবনের মনোরম পুষ্পকুঞ্জে কৃষ্ণের সাথে তার মিলনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

কালীয়দমন খণ্ড : এই খণ্ডে কৃষ্ণের দ্বারা কালিদহের কালীয় নাগ দমনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণের বীরসত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছে।

যমুনা খণ্ড : এই খণ্ডের বিষয় গোপিনীদের সঙ্গো কৃষ্ণের জলকেলি ও বস্ত্র চুরির কাহিনি।

হার খণ্ড : রাধার হার চুরির কাহিনি, রাধার যশোদার কাছে কৃষ্ণের নামের নালিশ এবং মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে তিরস্কার এই খণ্ডের বিষয়সমূহ।

বাণ খণ্ড : বাণ খণ্ডে কৃষ্ণ রাধার উপর প্রতিশোধ নিতে মদনবাণ নিক্ষেপ করেন এবং রাধা মূর্ছিত হন।

বংশী খণ্ড : বংশী খণ্ডে দেখা যায় বাঁশির সুরে রাধার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। গৃহস্থালির কাজকর্মে রাধা ভুল করে বসে। বড়াইয়ের নির্দেশে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী হরণ, বংশী হারিয়ে কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা, বাঁশী ফিরিয়ে দেবার জন্য বড়াইয়ের কাছে কৃষ্ণ কাকুতি-মিনতি করেন। পরবর্তীতে রাধা বাঁশী ফেরৎ দেয়।

রাধাবিরহ : এখানে কৃষ্ণের এক নতুন রূপ দেখা যায়। রাধার প্রতি উদাসীন কৃষ্ণ। অন্যদিকে রাধা কৃষ্ণের জন্য উন্মত্ত। বড়াইয়ের চেস্টায় বৃন্দাবনের মিলনকুঞ্জে দুজনের মিলন ঘটে, কিন্তু কর্তব্যের ডাকে কৃষ্ণ ঘুমন্ত রাধাকে রেখে মথুরায় চলে যায়। কাব্যটির শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী অংশ জানা যায়নি। শেষ অংশে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত না হওয়ায় কেউ কেউ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

২.৪.৫. কৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র হলো কৃষ্ণ। বড়ু চণ্ডীদাস পৌরাণিক ও লৌকিক সংমিশ্রণে কৃষ্ণকে গড়ে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মূলত উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক। কাব্যটিকে যে বিষয়গুলি উচ্চতার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম চরিত্র চিত্রণ। কাব্যে রাধা চরিত্রটি যতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কৃষ্ণ চরিত্রটি ততটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। এই যুগের প্রাবন্ধিক শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: রাধাচরিত্র' প্রবন্ধে কৃষ্ণ সম্পর্কে জানিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু আত্মসাৎ করিয়াছে রাধা। যাহার নামকীর্তনে কাব্যটি রচনা সেই শ্রীকৃষ্ণই উহার দোষের আশ্রয়। কাব্যটির যত কিছু দুর্নাম কৃষ্ণের জন্য।' জন্ম খণ্ডে পৌরাণিকত্বের আভাস থাকলেও সমগ্র কাব্য জুড়ে চরিত্রটি স্থূল-গ্রাম্য যুবকে পরিণত হয়ে উঠেছে। রাধার সাথে মিলনে তার মনের প্রেমচেতনা নয় কামনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাম্বুল খণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে ফুল,পান প্রেরণ করলে রাধা তা গ্রহণ না করায় কৃষ্ণ রাগান্বিত হয়েছে এবং প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে উঠেছে তার মধ্যে। এখানে কৃষ্ণ গ্রাম্য যুবকে পরিণত হয়েছে। দানখণ্ডে দানী সেজে রাধার কাছে প্রতি অঙ্গোর উল্লেখ করে মহাদান চেয়েছে 'হয় অর্থ দাও, নয় দেহ দাও তৃতীয় কোনো বিকল্প নেই অর্থের থেকে দেহের প্রতি অধিক আসক্তি।' আবার হারখণ্ডে রাধার যশোদার কাছে কৃষ্ণের হার চুরির অভিযোগ জানালে কৃষ্ণ প্রতিশোধ নিতে বাণ খণ্ডে রাধাকে বাণ নিক্ষেপ করে, এক্ষেত্রে কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বংশী খণ্ডে মদনবাণে বিদ্ধ রাধার অনুরোধে বড়াই কৃষ্ণকে খুঁজে না পেলে তার পরামর্শে বাঁশী চুরি করলে কৃষ্ণ কাকুতি-মিনতি করে বাঁশী না

পেলে কটূক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। রাধাবিরহ অংশে বিরহে ব্যাকুল রাধা সামাজিক সাংসারিক বাধা কাটিয়ে যখন নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে তখন কৃষ্ণ রাধাকে উপেক্ষা করে মথুরায় চলে গেছে। কৃষ্ণ জানিয়েছে 'জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুনী তারে।' অর্থাৎ রাধার নিকট ফিরিয়া যাইতে তার এখন কোনো বাসনাই নাই। কৃষ্ণের এই আচরণ অমার্জনীয়।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কৃষ্ণ চরিত্র অঙ্কনে পৌরাণিকত্বের আভাস কাটিয়ে লোকায়ত জীবন বেশি ফুটে উঠেছে। সমগ্র কাব্য মধ্যে রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়, কিন্তু কৃষ্ণ চরিত্রে তা দেখা যায় না। কৃষ্ণ চরিত্রটি আদি-মধ্যযুগের গ্রাম্য যুবকে পরিণত হয়েছে অপরদিকে বলা যায় কৃষ্ণ চরিত্রটিকে এমন করে দেখানো হয়েছে বলেই কাব্যমধ্যে রাধা আলোকিত হয়ে উঠেছে। বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণ চরিত্রটিকে এভাবে তুলে না ধরলে কৃষ্ণের পাশে রাধার স্বরূপ উদঘাটন করে আমাদের রসপিপাসা জাগ্রত হত না।

২.৪.৬. রাধা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে রাধা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে রাধা চরিত্রের সঙ্গে অন্য কোনো চরিত্রের মিল পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা একেবারে লৌকিক, রক্তমাংসে গঠিত, প্রাণোত্তাপে সঞ্জীবিত। রাধার পিতা সাগর, মাতা পদুমা। বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা দেখি রাধার অবস্থান ভাবের জগতে অর্থাৎ সে মহাভাবস্বরূপিনী, অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রাম্যবধূ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে রাধা। কবি তার রূপের বর্ণনা করেছেন—

তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহিনী।।
শিরীষকুসুমকেঁ অলী।
অদভূত কনকপুতলী।।

বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা সখীমুখে কৃষ্ণের কথা শুনে অভিসারিকা হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধিকার দেহে মনে কোনো দুর্বলতা নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথম অংশে কৃষ্ণ রাধাকে রীতিমতো বিরক্ত করেছে। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কূলবধূ হিসেবে রাধার মন সংস্কার ও সতীত্ববোধ গাঁথা। তাই সে তাম্বুল খণ্ডে ফুল তাম্বুল বর্জন করতে একবারও ভাবেনি। ঘরে স্বামী, শাশুড়ি রয়েছে, এ প্রসঙ্গে রাধা বড়াইকে বলেছে—

আমার স্বামী মোর সর্বাঙ্গ সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নন্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সনে কি মোর নেহা।।

দান খণ্ডে কৃষ্ণ রাধার অঙ্গ বর্ণনা করে দান চাইলে রাধা স্বামী আইহনের পরিচয় দিয়েছে এবং কংসরাজার কথা বলে কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়েছে— 'শুনিলে কংস মরিআ জাইবি আপন করম দোষে।' এই রাধাই একদিন কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। নৌকা খণ্ডে রাধা চরিত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। নৌকা খণ্ডে দ্বিতীয় মিলন কালে রাধা প্রথম দেহ সুখ অনুভব করে এবং দৈহিক সম্পৃক্তিই কৃষ্ণের প্রতি রাধার

প্রেমকে অঙ্কুরিত করে তোলে। রাধা এখানে বড়াইকে সমস্ত কথা গোপন করে। বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমে রাধা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কালীয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণ বিষে জর্জরিত হলে রাধা বিলাপ করেছে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধা গৃহস্থালির কাজকর্ম ভুল করে এবং বিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই অংশে রাধার চোখের জল দেখা গিয়েছে।

কাব্যের শেষাংশে আমরা দেখি রাধা যখন সামাজিক বাধা কাটিয়ে কৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে তখন কৃষ্ণ তার কাছে ধরা দেননি, কর্তব্য পালনে মথুরা যাত্রা করেন। রাধাবিরহ অংশে রাধার বিরহ ব্যাকুলতা পদাবলীর রাধাকে স্মরণ করায়। ভালোবেসে প্রতিদানে ভালোবাসা না পাওয়ার যে বেদনা তা ব্যক্তিগত বেদনা ছাপিয়ে সর্বকালের সর্বলোকের বেদনায় পরিণত হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস রাধা চরিত্রটিকে ভাবময়ী নয় জীবনময়ী করে গড়ে তুলেছেন অর্থাৎ রাধা চরিত্রে একজন মানবী কিশোরী যুবতীর চিত্র ফুটে উঠেছে।

২.৪.৭. বড়াই

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের পাশাপাশি বড়াই চরিত্রটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বড়াই রাধার মা পদুমার পিসি, রাধার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইহনের মা বড়াইকে রাধার শ্বশুরবাড়িতে এনেছিলেন। বড়াই কাব্যদূতী চরিত্র রূপে পরিচিত। বড়াই-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে— 'শ্বেত চামর সম কেশে, কপাল ভাঙিল দুই পাশে।' তার মাথার চুল চামরের মতো সাদা, চোখ কোটরের মধ্যে বসা, গাল তোবড়ানো, লম্বা লম্বা স্তন, দাঁত বেরিয়ে গেছে তার গঠন শীর্ণ কঙ্কালসার।

বড়াই রাধাকে সাথে নিয়ে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করতে গিয়ে একদিন রাধাকে হারিয়ে ফেললে কৃষ্ণের কাছে রাধার বর্ণনা দিয়ে জানতে চেয়েছে রাধা কোন পথে গিয়েছে। বড়াই জানত কৃষ্ণ সাধারণ বালক নয়, তাই তাঁর দেওয়া ফুল তাম্বুল নিয়ে গিয়ে রাধাকে দেওয়ায় প্রথমে তাকে দূতী মনে হলেও সে কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করেই এই কাজ করেছিল। কৃষ্ণের অনুরোধে বড়াই রাধার কাছে দুবার অপমানিত, প্রত্যাখ্যাত হয়েও তৃতীয়বার গিয়েছে, এখানে তার ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয়বার প্রহার করলে বড়াই কৃষ্ণকে প্রতিশোধ নিতে বলেছে।

দানখণ্ডে ও নৌকাখণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণকে সে এক হতে দিয়েছে। নানা সামাজিক বাধা কাটিয়েও রাধার শাশুড়িকে একঘরে হয়ে থাকার ভয় দেখিয়ে বড়াই রাধাকে দধি-দুগ্ধের পসরা নিয়ে বাইরে বের করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর চতুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বড়াই দূতী রূপে দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছেন, কখনও কৃষ্ণের আবার কখনও রাধার দূতী হয়েছেন। ছত্র খণ্ডে বড়াইয়ের কথা মতই কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছত্র ধরেন আবার কখনও রাধার সখীর ভূমিকাও পালন করেছেন। বংশী খণ্ডে বড়াইয়ের কথা মতই রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করেছে।

কাব্যের প্রথম দিকে দেখা যায় কৃষ্ণের কষ্টের কথা সে রাধাকে এসে বলেছে, পরবর্তীতে বা কাব্যের শেষাংশে রাধার দুঃখের কথা কৃষ্ণকে জানিয়েছে এবং কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছে মথুরায় যাত্রা না করার জন্য। সমগ্র কাব্য জুড়ে রাধা কৃষ্ণের প্রেমের বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে বড়াইয়ের চেষ্টায়। বংশী খণ্ড ও রাধাবিরহ অংশে

দেখা যায় বড়াই চরিত্রটি রাধার দুঃখে দুঃখী। রাধার প্রতি বড়াইয়ের যে সহানুভূতি ফুটে উঠেছে তাতে তাঁর মানবিকবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যে বড়াই চরিত্রটিকে প্রথমে দূতী মনে হলেও পরবর্তীতে অন্য মাত্রা পেয়েছে, সে রাধার রক্ষণাবেক্ষণে কর্তব্যনিষ্ঠ, বয়স্ক হওয়ায় পথ চলতে অসুবিধা হলেও সে রাধার সুখের জন্য পিছপা হয়নি। স্নেহের দ্বারাই সে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটাতে চেয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাস বড়াই চরিত্রটিকে স্নেহে, মায়ায়, প্রেমে একটি রক্ত মাংসের মানবিক চরিত্র করে তুলেছেন।

২.৪.৮. সমাজচিত্র

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সাহিত্যিক সমাজবদ্ধ মানুষ, তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজচিত্র ফুটে ওঠে তাঁর রচনায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে রচিত একটি লৌকিক প্রেমের আখ্যান। এখানে সমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র না থাকলেও বহিরঙ্গের চিত্র ফুটে উঠেছে। কাব্যের মধ্যে কোথাও উচ্চবিত্ত জমিদার তন্ত্রের কথা আসেনি এখানেই সাধারণ গোপপল্লীর সমাজ জীবন উঠে এসেছে। সেই সময়ের মানুষের গোপপল্লীর জীবনধারণের জীবিকা ছাড়াও জীবিকা অর্জনের নানা ক্ষেত্র ছিল এবং পেশা অনুসারে জাতি গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন মাঝি, কুমোর, নাপিত, জাদুকর। আবার গোপবধূদের নানা অলংকারে ভূষিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত বড়ু চণ্ডীদাস রাধার সাজসজ্জার বর্ণনায় বিবিধ অলংকারের উল্লেখ করেছেন সোনার চুপড়ি, রুপার খড়ি, গজমতি বা সাতেসরী হার, কঙ্কন প্রভৃতি। নানা রকম ফুলের তৈরি গহনার কথা উঠে এসেছে। সেই সময় নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের সাজ-সজ্জার ও নানা অলঙ্কারের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা গ্রামবাংলার সাধারণ গৃহস্থ বধূ। তাকে দধিদুগ্ধের পসরা নিয়ে হাটে যাওয়া ছাড়াও সংসারের নানারকম কাজকর্ম করতে হয়েছে। রান্নার মাধ্যমে সেই সময়ের খাদ্যাভ্যাসের কথা জানতে পারা যায়। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে দেখা যায় শাক, ঘি, লেবু, নিমঝোল, অম্বল প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মধ্যযুগের রচনা। সেই সময়ের আচার, বিচার, সংস্কার প্রভৃতি কাব্যের কাহিনির মধ্যে স্থান পেয়েছে। কোনো শুভ অনুষ্ঠানে কর্পূর, তাম্বুল উপহার পাঠানো হতো। সেই অনুযায়ী এদেশে এখনও পান, সুপারির ব্যবস্থা প্রচলিত। নানা কুসংস্কারের কথা পাওয়া যায় হাঁচি-কাশি, টিকটিকি কাকের ডাক ইত্যাদি। এছাড়া গ্রামীণ সংস্কার উঠে এসেছে—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ।
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।।

বিবিধ রকম খেলাধুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়। খেড়ী, চাঁচড়ী, গেন্ডুর উল্লেখ আছে। গরু, উট, শিয়াল, ময়ূর, কাক, সাপ প্রভৃতি জীবজন্তুর উল্লেখ আছে। এছাড়া দেব দেবতাদের মধ্যে রামের নাম পাওয়া যায়।

রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল রাধাকে বড়াই চণ্ডী পূজা করার নির্দেশ দিয়েছে কৃষ্ণকে ফিরে পাবার জন্য। চণ্ডী পূজার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তিতে—

'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।

আবার কাব্যের মধ্যে দেবী বাসুলীর কথা পাওয়া গেছে বারবার। বড়ু চণ্ডীদাস নিজেই জানিয়েছেন তিনি দেবী বাসুলীর উপাসক ছিলেন। সব মিলিয়ে বলতে পারি আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মানব জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলিকে আসলে মধ্যযুগের সামাজিক দলিল স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মূলত মধ্যযুগীয় ভাব ভাবনা, চিন্তা চেতনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে।

২.৪.৯. সাহিত্যমূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস শুধুমাত্র প্রাচীন কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ নয় তাঁর শিল্পগুণ অসামান্য। কাব্যটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি ভাগবত পুরাণ থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও লৌকিক ভাবনাও ফুটে উঠেছে। তাই আমরা দেখি কাব্যমধ্যে রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই প্রভৃতি চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের মানব চরিত্র হয়ে উঠেছে।

কাব্যটি রচনার ক্ষেত্রে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। কাব্যের বিভিন্ন অংশে কেদার, মল্লার, ভৈরবী, বসন্ত ইত্যাদি রাগ লক্ষ করা গিয়েছে। সবথেকে পাহাড়িয়া রাগের পদ বেশি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকারের প্রয়োগ কাব্যগুণকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাব্যের মধ্যে প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। ভারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণকে বলেছে—

মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞিঁ।
হাথ বাড়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পায়।।

অর্থাৎ এই প্রবাদের মাধ্যমে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, যা একটি অত্যন্ত প্রচলিত প্রবাদ। বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক থেকে বিচার করে বলা যায় চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে এই কাব্যটি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পরবর্তী কালের নাট্য-সাহিত্যের বীজ নিহিত ছিল এই কাব্যের মধ্যে। সমগ্র কাব্য অবলম্বনে দেখা যায় কাব্যের প্রথমাংশে কৃষ্ণের প্রেম কামনা প্রকাশিত হয়েছে। শেষাংশে কৃষ্ণের প্রেমে রাধা আত্মসমর্পণ করে বিরহকাতর হয়ে উঠেছে। যা পাঠকের চিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। সর্বোপরি বলতে পারি, বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ভাষা, ছন্দ, অলংকার প্রয়োগে এবং জীবনরসের বোধ প্রকাশে কাব্যটিকে অনন্য করে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও বিদ্যমান, যা কাব্যটির সাহিত্যগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

২.৫. সারাংশ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাগীতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপাল গিয়ে এই চর্যাগীতির পুঁথি আবিষ্কার করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রামাণ্য নিদর্শন হলো এই চর্যাগীতি সঙ্কলন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এই গ্রন্থ প্রকাশ পায়। বৌদ্ধ সহজিয়া পদকর্তারা জাগতিক বস্তুজগতকে সামনে রেখে শূন্যবাদের কথা বলেছেন। যদিও সাধন পদ্ধতি এবং জীবনচর্যার কথা বলাই মূল উদ্দেশ্য ছিল, তবে প্রাচীন বাংলা উচ্চবর্গ থেকে শুরু নিম্নবর্গের জনজীবনের একটি সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় এই চর্যাগীতিকোষে। চর্যাগীতিকোষের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের কথা বলতে হয়। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। আদি-মধ্যযুগে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণ কথার স্বরূপ কেমন ছিল তা জানতে অবশ্যই বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রতি আলোকপাত করতে হয়। আদি-মধ্যযুগের নারী-পুরুষের সম্পর্ক থেকে শুরু করে ধর্মাচরণ, ভক্তি ভাবনা, সামাজিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় কথার অবতলে। তাই সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাগীতি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থদ্বয়ের সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

২.৬. অনুশীলনী

❑ **বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতির আবিষ্কার, সম্পাদনা এবং রচনাকাল সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করুন।

২. চর্যাগীতিকে কেন্দ্র করে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালীর গতিপথ নির্দেশ করুন।

৩. প্রাচীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-কৃষ্টির স্বরূপ চর্যাগীতিগুলির মধ্যে কীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

৪. দৃষ্টান্তসহ চর্যাগীতির সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করুন।

৫. রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় আখ্যান ধারায় বড়ুচণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মৌলিকতা নির্দেশ করুন।

৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কার, সম্পাদনা এবং রচনাকাল সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করুন।

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রাধার আত্মপ্রকাশ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা দৃষ্টান্তসহ নির্দেশ করুন।

৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবলম্বনে কৃষ্ণ চরিত্রের মৌলিকতা নির্দেশ করুন।

৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আদি-মধ্যযুগের যে সমাজচিত্র উঠে এসেছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

❑ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

২.৭. গ্রন্থপঞ্জি

১. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ- ২০০৭

২. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০১৪

৩. দাস, নির্মল, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ- ২০১৭

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০১০-২০১১

৫. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ- ২০১৮

৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ- ২০১৬

৭. শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ- ১৪১৯

৮. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১ম খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ- ২০১৩

■ **পত্র-পত্রিকা :**

১. গুপ্ত, তাপস, *গীর্বাণ*, গীতগোবিন্দ বিশেষ সংখ্যা, অষ্টম সংখ্যা, ২০২৩

একক-৩ ❑ প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা ও বৈষ্ণব পদাবলী

৩.১. উদ্দেশ্য

৩.২. প্রস্তাবনা

৩.৩. প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা

৩.৪. কোষগ্রন্থে কৃষ্ণকথা

৩.৪.১. সদুক্তিকর্ণামৃত

৩.৪.২. সুভাষিতরত্নকোষ

৩.৪.৩. প্রাকৃতপৈঙ্গল

৩.৫. বৈষ্ণব পদাবলী

৩.৫.১. বিদ্যাপতি

৩.৫.২. বিদ্যাপতির ব্যক্তিপরিচয়

৩.৫.৩. কবিপ্রতিভা

৩.৫.৪. বাংলা সাহিত্যের বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ

৩.৫.৫. পদকর্তা চণ্ডীদাস

৩.৫.৬. বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব

৩.৫.৭. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা

৩.৬. সারাংশ

৩.৭. অনুশীলনী

৩.৮. গ্রন্থপঞ্জি

৩.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্য পর্বে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কৃষ্ণের বহুমাত্রিক উপস্থিতি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে।
- বৈষ্ণব পদাবলী রচনার পূর্ব সময়পর্বে বিবিধ কোষগ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের পদগুলিতে কৃষ্ণের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

- প্রাক চৈতন্য পর্বের পদকর্তা বিদ্যাপতির ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে তাঁর সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।
- মৈথিলি কবি হয়েও বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনায় বিদ্যাপতি কোন ধারায় শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
- প্রাক চৈতন্য পর্বের বাঙালি পদকর্তা চণ্ডীদাসের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে তাঁর রচিত পদগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে।
- বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কোন ধারার পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৩.২. প্রস্তাবনা

প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা ও বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠ পরিকল্পনায় সংস্কৃত, প্রাকৃত-অপভ্রংশে রচিত কোষগ্রন্থগুলি থেকে শুরু করে ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনা সম্ভারকে এই আলোচনায় আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছি। শুরুতেই প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার বৈচিত্র্যপূর্ণ ধারা বিবরণী উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে কোষগ্রন্থসমূহে রাধা-কৃষ্ণ সম্বলিত প্রেমলীলার প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই বিষয় বর্ণনার পরবর্তীতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধপূর্ণ শাখা বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের ব্যক্তিপরিচয় থেকে শুরু করে পদ রচনায় তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরাই প্রস্তাবিত পাঠ পরিকল্পনার মূল লক্ষ। প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা ও বৈষ্ণব পদাবলী এই পাঠ পরিকল্পনায় কৃষ্ণকথার ধারাবাহিক বিবর্তনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৩.৩. প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালি প্রাণের তৃষ্ণা যে নির্ঝরিণীর ধারাস্রোতে নিবৃত্ত করতেন তার সংক্ষিপ্ত নাম কৃষ্ণকথা। একটি প্রবাদে এই সত্য মূর্ত হয়ে আছে- 'কানু বিনা গীত নাই।' ভারতীয় সাহিত্যের পৌরাণিক যুগেই কৃষ্ণকথার বিকাশ পরিণতির একটা উচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। রাধার আত্মপ্রকাশের বহু পূর্বে কৃষ্ণের প্রকাশ ঘটেছিল। বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ এরা স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। মহাভারতে যে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তাঁর আদি রূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে লক্ষ করি, সেখানে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম অধ্যায়ে ও মহানারায়ণ উপনিষদের বিষ্ণুগায়ত্রী মন্ত্রে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু এই তিনটি নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। বাসুদেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সংযোগ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই হয়েছিল।

প্রাচীন লিপিলেখনে ও ভাস্কর্যে কৃষ্ণকথার স্বরূপ লক্ষ করা যায়। পতঞ্জলির মহাভাষ্য থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই কৃষ্ণবলরামের মন্দির নির্মিত হতো। গুপ্তযুগে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন কৃষ্ণ বাসুদেবের উপাসনা ব্যাপকভাবেই প্রচলিত হয়েছিল। স্কন্দগুপ্তের 'ভিতারী' প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে কংসবধের পর কৃষ্ণ এবং কংসের কারাগারে বন্দী মাতা দেবকীর মর্মস্পর্শী মিলন দৃশ্যের প্রসঙ্গ রয়েছে। উদয়পুর রাজ্যের

প্রাচীন রাজধানী মান্দোরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার প্রাচীনতম শিলালেখ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

কেবলমাত্র উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ভারতেও প্রাচীনকাল থেকেই কৃষ্ণ বিষ্ণু কেন্দ্রিক ভাগবতধর্ম বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য খ্রিস্টপূর্ব যুগে দক্ষিণ ভারতে এই ধর্মের প্রসার ছিল কিনা জানা যায় না। সাতবাহন রাজা গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ সাতকর্ণির একটি শিলালেখ থেকে অন্ধ্রদেশে ভাগবত ধর্মের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি। এটি পাওয়া গিয়েছিল কৃষ্ণ জেলার চিন গ্রামে। আড়বার বা আলোয়ার ভক্তদের উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকেই। তামিল ভাষায় এঁদের চার হাজার পদের সংকলন গ্রন্থের নাম 'দিব্যপ্রবন্ধম। বারোজন সাধক কবির সংকলিত পদে কৃষ্ণকে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে ভজন করা হচ্ছে, এদের মধ্যে মহিলা কবি অণ্ডাল কৃষ্ণকে ভজনা করেছেন প্রেমিক রূপে। পণ্ডিতদের মতে ব্রজলীলা কেন্দ্রিক কৃষ্ণগোপী কথার প্রথম ভক্ত এরাই। ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্যে এরা ভাগবতের পূর্বসূরী।

মহাভারতে কৃষ্ণ রাজনীতিবিদ। মহাভারত এবং ভাগবতে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের জীবনকে দেখা হয়েছে। মহাভারতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আর অন্যদিকে ভাগবতের কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, ভগবান, প্রেমের দেবতা। হরিবংশ পুরাণে শারদ রাসে গোপ ও গোপীরা কৃষ্ণকে ঘিরে নৃত্য করছে। বিষ্ণুপুরাণে যে রাসলীলা বর্ণিত সেখানে কৃষ্ণ ঈশ্বর ও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।

বৈষ্ণব পদাবলী বিষ্ণু ভক্তদের ভক্তিরসাশ্রিত গীতিকবিতা। এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৈষ্ণব পদাবলী মূলত রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে রচিত গান। এই গানগুলি ভক্তি ও রসের এক অপূর্ব মিশ্রণ। চতুর্দশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান কবি বা মহাকবি হিসেবে যে চারজন কবির নাম আমরা পাই তাঁরা হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস। এঁদের মধ্যে বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস হলেন প্রাক্-চৈতন্য পর্বের কবি।

৩.৪. কোষগ্রন্থে কৃষ্ণকথা

বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার ধারা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই সংকলন গ্রন্থগুলির কথা উল্লেখ করতে হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশে লেখা শ্লোকগুলির প্রতি আলোকপাত করলে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে প্রাক্-চৈতন্য কৃষ্ণকথার গতিপথটি কীরূপ ছিল। সুভাষিতরত্নকোষ এবং সদুক্তিকর্ণামৃত —এই গ্রন্থদ্বয় বাংলা দেশেই সঙ্কলিত হয়েছিল। শ্লোক রচয়িতাদের মধ্যে বহু বাঙালি কবি বিদ্যমান। তাই বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার সম্প্রসারণে প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে কোষগ্রন্থগুলির ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৩.৪.১. সুভাষিতরত্নকোষ

কোষকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম সংকলন 'সুভাষিতরত্নকোষ' (নামান্তরে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়')। আনুমানিক একাদশ শতকে বিদ্যাকর এই কোষকাব্য সংকলন করেন। বিদ্যাকর ছিলেন (বর্তমান মালদহ

জেলার অন্তর্গত) জগদ্দল বৌদ্ধ বিহারের আচার্য। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম কোষকাব্য 'সুভাষিতরত্নকোষ' সম্ভবত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের উৎসাহেই সংকলিত হয়। প্রথম সম্পাদক F. W. Thomas অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির প্রথম পদ অনুযায়ী গ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। এই গ্রন্থে অশ্ব ঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, অমরু, বাণ, রাজশেখর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিদের রচনা ব্যতীত এমন অনেক কবির কবিতা পাওয়া যায়, যাঁদের বাঙালি কবিরূপে চিহ্নিত করা চলে (যেমন গৌড় অভিনন্দন, বুদ্ধাকর গুপ্ত, ধর্মাকর, কুমুদাকর মতি, বন্দ্য তথাগত, বীর্যমিত্র, শুভঙ্কর, বৈদ্যধন্য, অপরাজিত রক্ষিত, মধুশীল, ছিওপ, হিম্বোক, যোগোক, সোন্নোক প্রভৃতি)। পাল রাজারা ধর্মমতে ছিলেন 'পরম সুগত' অর্থাৎ বৌদ্ধ এবং তাঁদের রাজত্বকালে গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। আলোচ্য গ্রন্থের সংকলক বিদ্যাকর যে বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। 'নমো বুদ্ধায়' বাক্যটি দিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ এবং প্রথম তিনটি ব্রজ্যায় 'সুগত', 'লোকেশ্বর' ও 'মঞ্জুঘোষে'র স্তুতি সংকলিত; মহেশ্বর, হরি, সূর্য প্রভৃতি হিন্দু দেবতার স্তুতি পরে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থারম্ভের সুগতব্রজ্যা বাদ দিলে সারা গ্রন্থে হিন্দু দেবদেবী বিষয়ক এবং তার মধ্যে আবার হরি বিষয়ক কবিতার সংখ্যাই বেশি। এ ছাড়াও রয়েছে আদিরস সমৃদ্ধ প্রকৃত প্রেমকবিতা ও ঋতুবিষয়ক কবিতা।

'সুভাষিতরত্নকোষ' গ্রন্থে বঙ্গীয় কবিদের কবিতায় কৃষ্ণ-গোপী প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত, তার মধ্যে 'গীতগোবিন্দে' বর্ণিত রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। অজ্ঞাতনামা কোনো কবির একটি শ্লোকে কৃষ্ণ ও গোপীদের কৌতুক সংলাপ—

> কোহয়ং দ্বারি হরিঃ, প্রযাহ্যুপবনং, শাখামৃগেনাত্র কিম?
> কৃষ্ণোহহং দয়িতে, বিভেমি সুতরাং, কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।
> মুগ্ধেহহং মধুসূদনো, ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম
> ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীনো হরিঃ পাতু বঃ।।

৩.৪.২. সদুক্তিকর্ণামৃত

বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' (১২০৫) নামক কোষকাব্য সংকলন করেন। অনুমান করা সঙ্গত যে রাজা কেশব সেনের রাজত্বকালে সংকলনটি সমাপ্ত হয়। শ্রীধর দাসের পিতা বটুদাস ছিলেন লক্ষণ সেনের প্রতিরাজ (অর্থাৎ লেখক), মহাসামন্ত এবং প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সমগ্র গ্রন্থটি মোট পাঁচটি প্রবাহে বিভক্ত— (১) অমর প্রবাহ, (২) শৃঙ্গারপ্রবাহ, (৩) চাটুপ্রবাহ, (৪) অপদেশপ্রবাহ ও (৫) উচ্চবচপ্রবাহ।

অমরপ্রবাহে দেবদেবী সম্বন্ধীয় পদগুলি রয়েছে। এরই একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে কৃষ্ণকথা। শৃঙ্গারপ্রবাহে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমের বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অমরপ্রবাহে শিব, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতার লীলা সংক্রান্ত পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতার রূপ এবং তার বাল্য ও যৌবনলীলার বিভিন্ন কবি রচিত পদ এখানে ক্রম অনুসারে সাজানো রয়েছে। অমরপ্রবাহে কৃষ্ণকথার এই বিচিত্র বিষয়বস্তুর দিকে তাকিয়ে আমরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি। যেমন— গীতগোবিন্দের অন্তর্গত

সর্বভারতীয় দশাবতার স্তোত্র রচনার পিছনে লক্ষ্মণ সেনের সভার অন্যান্য কবিদেরও অবদান আছে। এবং কৃষ্ণলীলা কথাকে আমরা এখানে ধারাবাহিক ভাবে পাচ্ছি।

সংকলক শ্রীধর দাস বিভিন্ন কবি রচিত 'কৃষ্ণশৈশবে'র পদও সংগ্রহ করেছেন। এই পদগুলিতে ভাগবতের অনুরূপ বালক কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ এবং শিশু কৃষ্ণের মুখে জননী যশোদার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ বাৎসল্য রসাত্মক পদে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব প্রকাশিত হয়েছে। 'কৃষ্ণযৌবনম'-এর পদগুলিতে সদ্য যৌবন প্রাপ্ত কৃষ্ণের সঙ্গো রাধা এবং অন্যান্য গোপিনীদের লীলাপ্রসঙ্গা বর্ণিত হয়েছে। তারই সঙ্গো মিশে আছে জননী যশোদার স্নিগ্ধ বাৎসল্য।

৩.৪.৩. প্রাকৃত পৈঙ্গাল

প্রাকৃত পৈঙ্গাল মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এটি শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একটি ছন্দগ্রন্থ। এর রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় এটি চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল। কাশীধামের Prakit Text Society-র সংস্করণে সম্পাদক ড. ভোলাশঙ্কর ব্যাস সংকলনটিকে চতুর্দশ শতকের বলে অনুমান করেছেন। এই গ্রন্থের সংকলন স্থান কাশী অর্থাৎ পূর্বভারত বলে এতে বাঙালির কিছু কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে— এমন অনুমান অমূলক নয়। মূল গ্রন্থ অনুসরণ করলে দেখা যায় এই গ্রন্থে এমন অনেক শ্লোক আছে, যার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষা কৌশল প্রায়ই বাংলার অনুরূপ। প্রাকৃত পৈঙ্গালে কৃষ্ণকথা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এটি মূলত ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থ, এর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কবিতা পাওয়া যায় যেখানে কৃষ্ণ এবং রাধার প্রেমলীলার ইঙ্গিত আছে। এই কবিতাগুলি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কৃষ্ণকথা ও রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় দেয়।

প্রাকৃত পৈঙ্গালের কবিতাগুলিতে কৃষ্ণকে একজন প্রেমিক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে তাঁর বাল্যলীলা এবং ঐশ্বরিক রূপের তুলনায় রাধার প্রতি তাঁর প্রেম এবং বিরহই প্রধান বিষয়। কিছু কবিতায় গোপীদের সাথে কৃষ্ণের সম্পর্কেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, এই গ্রন্থে কৃষ্ণকথা মহাভারত বা পুরাণগুলির মতো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। বরং কয়েকটি পদের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের নৌকালীলার প্রথম প্রসঙ্গা আমরা পাই এই প্রাকৃত পৈঙ্গালের একটি শ্লোকে—

আরে রে বাহহ্নি কাহ্ন নাব,
ছোড়ি ডগমগ কুগতিন দেহি।
তইঁ ইথি ণদিহিঁ সতাঁর দেই,
জো চাহহি সো লেহি।।

ওরে ও কৃষ্ণ, নৌকা বাও, টলমল করিয়ে দুর্গতি দিও না। আগে তুমি নদীটা পার করে দিয়ে যা চাও তাই নিও। প্রসঙ্গাত আর একদিক থেকেও সংকলনটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 'গাথাসপ্তশতী'র রাধা আমাদের কাছে তাঁর দেবী সত্তার পরিচয় নিয়ে আসেনি। কিন্তু প্রকৃত পৈঙ্গালের একটি শ্লোকে রাধাকে অভিজাত পৌরাণিক

দেবীদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী, গৌরী, মহামায়া ইত্যাদি দেবীদের সঙ্গে 'রাঈ' বা শ্রীমতি রাধার নাম একাধিক পুঁথিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত পৈঙ্গালের কৃষ্ণকথা পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রবাহিত করেছে। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের সময়কালে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম যে উচ্চতা লাভ করেছিল, তার বীজ প্রাকৃত পৈঙ্গালের মতো গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩.৫. বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী হল এমন একটি সাহিত্যশাখা যার ভাব, বিষয়বস্তু, ভক্তিবাদ, বাংলা তথা বাংলার বাইরেও পাঠককুলকে চমকিত করেছিল। বৈষ্ণব' কথাটির সাধারণ অর্থ বিষ্ণু যাঁদের উপাস্য দেবতা, আর পদাবলীর 'পদ' কথাটি গান বা গীতিকে বোঝায়। এর ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই; রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পঞ্চরাত্র সংহিতা, পুরাণ সংহিতা, ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে 'পদ' শব্দটি গীতিকেই নির্দেশ করে। এমনকি কালিদাস বীণার সুরধ্বনি অর্থে যে 'পদ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন তাও এক প্রকার গীতির পরিচয়। ড. সুকুমার সেনের মতে— 'বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে যাহা বুঝি তাহা চৈতন্যদেবের আগে উঁচু দরের বৈঠকি গানের মত ছিল।' রাজসভা কেন্দ্রিক ছিল অনেকটা। সাধারণত মধ্যযুগের কবি মাত্রেই কোনো না কোনো রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ক্রমান্বয়ে সেই গান সঙ্গীতপ্রিয় শিক্ষিত শিষ্টজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বব্যাপ্তি ঘটে। আধুনিককালেও সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিকদের মধ্যেও বৈষ্ণব পদাবলীর জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করতে হয়। আসলে বৈষ্ণব পদাবলী একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সামনে রেখে রচিত হলেও তার আবেদন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। যুগে যুগে মানুষ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে প্রেম ভাবনাকে খুঁজে পেয়েছে।

চৈতন্যদেবকে সামনে রেখে সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করতে পারা যায়—

ক. প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলী
খ. চৈতন্য সমকালীন পদাবলী
গ. চৈতন্য-উত্তর পদাবলী

চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে চৈতন্যের জন্ম পর্যন্ত (১৪৮৬) রচিত পদসমূহ প্রাক্-চৈতন্য পর্যায়ের পদাবলী। এই সময় খুব অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়— বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মাধবেন্দ্রপুরী ও মালাধর বসু। উত্তরসাধকেরা এঁদের রচিত পদগুলিকে মহাজন পদাবলী বলে সম্মান জানায়। এই পর্বের বৈষ্ণব সাহিত্যের উপাস্য দেবতা রাধা ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণের আবির্ভাব যাত্রা সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের প্রধান গোপী রূপে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিয়েছে পদাবলী সাহিত্যে। তবে চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলার মাটিতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমরস সঞ্চারিত হয়েছিল। পদাবলীতে প্রেম ভাবনার বিপুল উপস্থিতি

লক্ষ করা গিয়েছিল আলোয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে। দক্ষিণ ভারতের 'আলোয়ার' নামে একদল ভক্তের আবির্ভাব হয়েছিল। তামিল ভাষায় লেখা 'আলোয়ার' সম্প্রদায়ের পদগুলিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছিল। বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর বিকাশ ধারায় সেন রাজসভার কবি জয়দেবের নাম অবশ্যই স্মরণীয়। সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করলেও তাঁর কাব্যে বাংলার বৈষ্ণব প্রেম ভাবনার একটি সামগ্রিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম।।

অর্থাৎ হে ভক্তিরস ভাবুক! যদি হরিস্মরণে মন সরস করিতে ইচ্ছা করো, যদি তাঁহার বিলাস কলা-সমূহে কৌতূহল বোধ করো তবে জয়দেবের কবিতাময় এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো। বস্তুত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব দেখা গিয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য সহ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধময় শাখা হলো এই বৈষ্ণব পদাবলী। আর এই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রাক্-চৈতন্য পদকর্তা রূপে বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

৩.৫.১. বিদ্যাপতি

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্য পর্বের একজন বিশিষ্ট পদকর্তা বিদ্যাপতি। মৈথিলি এবং ব্রজবুলি ভাষাতে তিনি বহু পদ রচনা করেছিলেন। যদিও ব্রজবুলি কোনো বিশেষ জনসমাজে প্রচলিত ভাষা নয় এটি একটি সাহিত্যিক কৃত্রিম ভাষা; অনেকটা বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি ভাষার সংমিশ্রিত রূপ। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' অনুসরণে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বনে বহু পদ তিনি রচনা করেছেন। এইজন্য বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' বলা হয়ে থাকে। আবার মিথিলার একজন বিদগ্ধ কবি হিসেবে তাকে 'মৈথিল কোকিল'ও বলা হয়ে থাকে।

৩.৫.২. বিদ্যাপতির ব্যক্তি পরিচয়

বিদ্যাপতি নিজের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে কোনো কথা বলেননি। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রিয়ার্সনের প্রথম গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি উত্তর মিথিলার দ্বারভাঙ্গা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফি গ্রামে বিদ্যাপতির জন্ম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম, তাঁর কুলপদবী ছিল 'ঠক্কুর', বাংলায় ঠাকুর। মোটামুটি চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে তাঁর জন্ম এবং আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর তিরোধান ঘটে। কুলগত ধর্মে তিনি ছিলেন শৈব, তবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ে তাঁর যে আনুগত্য এবং পদ রচনা তাতে তাকে 'পঞ্চপাসক' হিন্দু বলা হয়ে থাকে (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য)।

বংশানুক্রমে বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষেরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে মিথিলার রাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই ছোটবেলা থেকেই মিথিলার রাজ পরিবারে তাঁর যাতায়াত ছিল। বিদ্যাপতি নিজেও বিভিন্ন সময়ে মিথিলার বিভিন্ন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। যেমন কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও বিশ্বাস দেবী, নরসিংহ ও ধীরমতি, পুরাদিত্য, ভৈরবসিংহ প্রমুখ। 'কীর্তিলতা', 'ভূপরিক্রমা', 'পুরুষ পরীক্ষা', শৈবসর্বস্বসার', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বৈষ্ণব পদাবলী রচনায়। শোনা যায় তিনি রাজা শিব সিংহের বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। তাঁর আমলেই এই বৈষ্ণব পদগুলি রচনা করেন।

৩.৫.৩. কবি প্রতিভা

মিথিলার পণ্ডিতগণ বাংলা দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলিকে শৃঙ্গার রসের পদ বলে বিষয়টাকে খানিকটা খাটো করে দেখতে চান। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার বৈষ্ণবীয় পদ রচনা না করলে বিদ্যাপতি কখনোই মিথিলার গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির হৃদয় মন্দিরে আসন লাভ করতে পারতেন না। শিবকে নিয়ে, দুর্গাকে নিয়ে বহু পদ রচনায় কৃতিত্ব দেখালেও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনায় তাঁর কবিপ্রতিভা শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে।

বিদ্যাপতি অলংকার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-নায়িকা প্রকরণ অনুসারে তিনি রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রথম মিলন, বাসকসজ্জা, অভিসার, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ, পুনর্মিলন প্রভৃতি লীলা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধা কৃষ্ণের বিরহ ও মিলন লীলা বর্ণনা করেছেন। রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের স্তর পরম্পরা বিদ্যাপতির পদে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মাথুর, ভাবোল্লাস, প্রার্থনা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁর রচিত মাথুর পর্যায়ের একটি পদ—

সজল নয়ন করি   প্রিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি।
বিহি বড় দারুণ   তাহে পুন ঐছন
দূরহি করল মুরারি।।

বিরহিণী রাধাকে কোনো সখী কৃষ্ণ মিলনের আশ্বাস দিলে রাধা সখীকে সম্বোধন করে কৃষ্ণবিরহে তাঁর বেদনার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন সজল চোখে কৃষ্ণের আসার পথের দিকে তাকিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে করতে একতিল সময়ও রাধার কাছে চারটি যুগের মতো দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হচ্ছে। বিধাতা অত্যন্ত নিদারুণ। তাই যেন কৃষ্ণকে এই ভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন। ভাবোল্লাস পর্যায়ের একটি পদে বলেছেন—

আজু রজনী হাম   ভাগে পোহাইলুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।

কৃষ্ণের মুখ দর্শন করে রাত্রি যাপন করে রাধা নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করছে, নিজের জীবন যৌবনকে সফল মনে করছে। প্রার্থনা পর্যায়ের একটি পদে বিদ্যাপতি সেই ভাবনা নিদারুণভাবে ফুটে উঠেছে—

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।

উল্লেখিত এই পদে কবির অনুতাপ, আত্মনিবেদনের একান্ত আকুতি লক্ষ করা গিয়েছে।

শৃঙ্গার রসকে আদি রসের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে বৈধী ভক্তির আরাধনা করা ছিল বিদ্যাপতির পদের লক্ষ। বিদ্যাপতির রাধা মানবী রাধা; সংসার জগতে সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি ষড়রিপু দ্বারা চালিত। বিরহে যেমন প্রচণ্ড কাতর হয়, পরক্ষণেই কৃষ্ণকে সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। উত্তর চৈতন্য যুগের পদকর্তারা বলেন—

আমি চাইনা রাধা হতে
হব রাধার পরাণ প্রিয়া।

এই ভাবটি বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই না। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি, নাগরিক জীবনের কবি, তাই তাঁর রাধা চরিত্রেও একটা রাণী ভাব লক্ষ করা যায়, যে কিনা দুঃখে কাতর, কামে জর্জরিত, অভিমানে ক্ষিপ্ত আবার সুখে উল্লসিত মানবী রাধা; রাত্রির গহীন অন্ধকারে বন-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে কৃষ্ণাভিসারে দুঃসাহসিকতাও দেখান।

৩.৫.৪. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণ

বিদ্যাপতি বাঙালি নন, বাংলা ভাষায় একছত্র পদও রচনা করেননি, অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন। মিথিলায় তাঁর জন্ম হলেও তার চিরন্তন বাসভূমি গড়ে উঠেছে বাঙালির হৃদয় মন্দিরে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়—

(ক) বাংলার কবি লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবকে বিদ্যাপতি অনুসরণ করেছেন, বাঙালির প্রাণপ্রিয় রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছেন।

(খ) বিদ্যাপতির পদে যে ভাব পদমাধুর্য, সুললিত ছন্দ তা বাঙালির বড় নিজস্ব বড় আপন।

(গ) ভৌগোলিক দিক থেকে মিথিলা একদা গৌড়বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

(ঘ) মধ্যযুগে বাঙালির প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন। তাই বাংলার ইতিহাসে বিদ্যাপতির জায়গা বা স্থান সহজেই অনুমেয়।

(ঙ) পরবর্তীকালে তথা চৈতন্য যুগে বাঙালি পদাবলীকার গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদকে অনুসরণ করেছেন। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদ সঙ্কলনে বিদ্যাপতির বহু পদ জায়গা করে নিয়েছে।

(চ) বিদ্যাপতি যে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন পরবর্তীকালে অনেক কবি তাঁর রীতিকে গ্রহণ করে অনেক পদ রচনা করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রজবুলিকে অনুসরণ করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করেছিলেন।

সর্বোপরি মধ্যযুগে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী শাখাটি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে দিয়ে। বাংলায় পদ না লিখেও বাংলা সাহিত্যের বিকাশসাধনে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পরোক্ষে। বৈষ্ণবীয় সাধন প্রণালী কিংবা দর্শন শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণব পদ রচনার পূর্বে বিদ্যাপতি প্রাণবন্ত ভাষায় রাধা কৃষ্ণের প্রণয় ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন পদাবলীতে। বাঙালি জনমানসে রাধা-কৃষ্ণের চিরস্থায়ী হয়ে ওঠার মূলে বিদ্যাপতির পদসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতিকে ছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী আলোচিত হতে পারেনা।

৩.৫.৫. পদকর্তা চণ্ডীদাস

মধ্যযুগে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তাছাড়া এই সময়ে একাধিক চন্ডীদাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেক বাইরের পদ আবার পদাবলীর চণ্ডীদাসের নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। পদকর্তা চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পদকর্তা চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে। আবার কারও মতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে তাঁর জন্ম। তবে তাঁর পদে নান্নুরের নামই উল্লেখ পাওয়া যায়, কোথাও ছাতনার নাম নেই। সহজিয়া চণ্ডীদাস যিনি রামী নাম্নী এক রাজকন্যাকে সাধনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেছিলেন। ওই নান্নুর গ্রামের সঙ্গে তাঁরও নাকি সম্পর্ক ছিল। মোটকথা চণ্ডীদাস চৈতন্যর পূর্বে একজন বিশিষ্ট পদকার ছিলেন, এর বেশি কোনো তথ্য সেরকম পাওয়া যায় না।

৩.৫.৬. বৈষ্ণব পদাবলীর চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রায় ছয়শো বছর আগে থেকে আজও বাঙালির হৃদয়ে চণ্ডীদাস বিরাজমান, তাঁর রাধা চরিত্রে অপূর্ব মিস্টিকতার আবরণ যার সমতুল্য দৃষ্টান্ত মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তাঁর পদাবলীর সহজ-সরল বাক্ রীতি সাধারণ শ্রোতাকেও সমানভাবে টেনেছিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিভিন্ন পর্যায়ের পদ রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তবে এর মধ্যে পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদনে তিনি শ্রেষ্ঠ—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।

আবার,

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।

পদদুটি পূর্বরাগ পর্যায়ের। রাধা যেন প্রথম যৌবনেই বৈরাগী সেজেছেন, প্রেমের এক আধ্যাত্মিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে। যার কতকটা ছাপ পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইতে পরাণ গেলে।।
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইতে পাষাণ হ'লে।।

ভাবোল্লাস পর্যায়ের এই পদে রাধার অনুভূতিকে কবি চণ্ডীদাস অপরিসীম মুন্সীয়ানায় তুলে ধরেছেন। বহুদিন বাদে কৃষ্ণকে দর্শন করেও তাঁর আনন্দাশ্রু নিবারিত হয় না। মিলনেও সে সুখ অনুভব করে না, দুঃখ তাকে সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়। চণ্ডীদাসের পদে নেই কোনো ধ্বনিঝংকার, অলংকারের বাহার, নেই কোনো বাক্ চাতুর্য, তাঁর সুরের ওই সহজ ভাবটি তৈরি করেছে অপূর্ব রোমান্টিক মিস্টিকতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই পদকর্তা চণ্ডীদাস সম্পর্কে বলেছিলেন— 'তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠককে দিয়া লিখাইয়া লন।'

৩.৫.৭. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুজনেই চৈতন্য-পূর্বের বিশিষ্ট বৈষ্ণব পদকার। সহজ ভাব প্রকাশে রাজসভার কবি বিদ্যাপতি থেকে চণ্ডীদাস অনেক গুণে স্বতন্ত্র। শিল্পী কবি অলংকারের মাধুর্য চাকচিক্যে বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে— 'ফাটি যাওত ছাতিয়া।' দুঃসাহসী এই রাধাকে চণ্ডীদাস নগরের ঐশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে শান্ত, স্নিগ্ধ পর্ণকুটিরে চিরদুঃখিনী করে রেখেছেন। সংসার জীবনের চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে সন্ন্যাসিনী জীবনে সে যেন বেশি করে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন— 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি।' বিদ্যাপতির রাধা চরিত্রে ক্রমবিকাশের স্তর আছে, চণ্ডীদাসের রাধা চরিত্রে ওঠাপড়া নেই। তিনি সর্বত্র সমান। দুই বিশিষ্ট কবি সত্তার মধ্যে তুলনা টেনে তিনি আরও বলেছেন— 'বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন!' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'বিদ্যাপতির কবিতা স্বর্ণহার। বিদ্যাপতির গান মুরজবীনাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি।' 'শিল্পী কবি' ও 'কবিতাপস' বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস দুজনের পদই চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তেরা আস্বাদন করতেন যার উল্লেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।

৩.৬. সারাংশ

প্রাক্-চৈতন্যপর্বে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশের স্তর এবং বৈষ্ণব পদাবলীর গতিপথটি ছিল বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ‘কানু বিনা গীত নাই’—এই প্রবাদ বাক্য আসলে বাংলায় কৃষ্ণকথার জনপ্রিয়তাকেই নির্দেশ করে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কৃষ্ণের বহুমাত্রিক উপস্থিতি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের প্রমাণ মেলে ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’, ‘সুভাষিতরত্নকোষ’, ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ সহ একাধিক কোষগ্রন্থে। কোষগ্রন্থের পাশাপাশি কৃষ্ণ কথার উপস্থিতি মেলে বৈষ্ণব পদাবলীতে। তবে একদিনে এই বৈষ্ণব পদাবলী ধারা গড়ে ওঠেনি। সমগ্র ভারতবর্ষের নিরিখে বলতে পারি যে, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গান রচনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। তামিল ভাষায় চার হাজার পদের সংকলন গ্রন্থের নাম ‘দিব্যপ্রবন্ধম’। এর মূল বিষয় ভাবনা ছিল কৃষ্ণ প্রেম। আর এই বাংলায় রাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাক্-চৈতন্য পর্বের বৈষ্ণব পদাবলী ধারায় বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী ধারাতে জায়গা করে নিয়েছেন নিজ গুণে। স্বয়ং চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ পাঠ করতেন বলে জানা যায়। বিদ্যাপতির পর এই বাংলায় জাত পদকর্তা চণ্ডীদাস বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। চণ্ডীদাসের রাধা আসলে এই বাংলার এক সাধারণ বধূ স্বরূপ। তাই প্রাক্-চৈতন্যপর্বে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশে কোষগ্রন্থগুলির অবদান স্বীকার করেও বলতে পারি বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী ধারা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের সৌজন্যে।

৩.৭. অনুশীলনী

- **বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১. কোষগ্রন্থ সমূহে কৃষ্ণকথার স্বরূপটি কেমন ছিল তা প্রসঙ্গসহ নির্দেশ করুন।

২. প্রাক্-চৈতন্য পর্বে কৃষ্ণের বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করুন।

৩. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তা নির্দেশ করুন।

৪. বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-চৈতন্য পর্বে রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর গতিপথ নির্দেশ করুন।

৫. মৈথিল কবি হয়েও বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতির অন্তর্ভুক্তির কারণসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৬. বৈষ্ণব পদাবলীতে কোন পর্যায়ের পদে কবি বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৭. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করুন।

- **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

৩.৮. গ্রন্থপঞ্জি

১. গিরি, সত্য (সম্পা.), *বৈষ্ণব পদাবলী*, রত্নাবলী, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৯

২. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ- ২০০৭

৩. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে*, এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০১৪

৪. দাস, ক্ষুদিরাম, *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১৩

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-২০১০-২০১১

৬. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ- ২০১৮

৭. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য*, লেখাপড়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬১

৮. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪

৯. সেন, দীনেশচন্দ্র, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, নিমাইচন্দ্র পাল (সম্পা.), সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, সারস্বতকুঞ্জ সংস্করণ-২০০৯

১০. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ- ২০১৩

একক-৪ ❑ প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যের ধারা

৪.১. উদ্দেশ্য

৪.২. প্রস্তাবনা

৪.৩. মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ

৪.৪. মঙ্গলকাব্যের গঠন বিন্যাস

৪.৫. মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

৪.৬. মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষিত

৪.৭. মনসামঙ্গল

- ৪.৭.১. কানাহরি দত্ত : কবি পরিচিতি
- ৪.৭.২. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়
- ৪.৭.৩. বিজয় গুপ্ত : কবি পরিচিতি
- ৪.৭.৪. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়
- ৪.৭.৫. নারায়ণ দেব : কবি পরিচিতি
- ৪.৭.৬. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়
- ৪.৭.৭. বিপ্রদাস পিপলাই : কবি পরিচিতি
- ৪.৭.৮. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়

৪.৮. রামাই পণ্ডিতের ‘ধর্মমঙ্গল’

৪.৯. সারাংশ

৪.১০. অনুশীলনী

৪.১১. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- এই এককটি পাঠ করলে প্রাক্-চৈতন্য পর্বের বাংলা সাহিত্যের গতিপথ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- মঙ্গলকাব্যের ধারাটি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

- প্রাচীন বাংলায় ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হবে।
- বাংলার জনপদে মাতৃসাধনা বা শক্তিসাধনার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী তথা মধ্যযুগের প্রথমার্ধ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, গঠনবিন্যাস এবং মঙ্গালকাব্যের ধারাটি কেমন ছিল তা জানতে পারবে।
- মঙ্গালকাব্যে পৌরাণিক এবং লৌকিক উপাদানের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হবে।
- মঙ্গালকাব্যের কবির আত্মপরিচিতি অংশকে সামনে রেখে বাংলার জনপদে মঙ্গাল কাব্যের প্রচারের সীমানা নির্ধারণ তথা গতিপথ নির্দেশ সম্ভব হবে।
- তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গাল কাব্যের ধারার সমৃদ্ধি ও বিস্তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় সমাজ সংস্কৃতির একটি গোটা চিত্র সম্পর্কে অবগত হতে পারবে।
- সর্বোপরি প্রাক্-চৈতন্য বাংলা সাহিত্যের বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থিতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য অনুধাবনে সাহায্য করবে।

৪.২. প্রস্তাবনা

প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যের ধারা অংশের পাঠ পরিকল্পনায় মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ, মঙ্গালকাব্যের গঠন বিন্যাস, মঙ্গালকাব্যের বৈশিষ্ট্য, মঙ্গালকাব্য উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিষয়গুলি আবশ্যিক শর্ত। তাই উক্ত বিষয় ভাবনাকে সামনে রেখে প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গালকাব্যের গতিপথকে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এরপরেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গালকাব্যের ধারায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ মনসামঙ্গাল কাব্যের ধারাটি। মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিদের ব্যক্তি পরিচয় থেকে শুরু তাঁদের রচিত গ্রন্থ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই বিষয়ে যথাযথ বিবরণ তুলে ধরার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এবং পরিশেষে রামাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গাল সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে কারণ তুর্কি আক্রমণের অভিঘাত এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

৪.৩. মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ

সাধারণভাবে মঙ্গালকাব্যগুলির রচনাকাল ধরা হয় চৈতন্য-পূর্বযুগ থেকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গাল' কাব্যের সময়কাল পর্যন্ত। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সমকালে কিংবা তার কিছু পরে মঙ্গালকাব্যের প্রথম রূপটি প্রকাশ পায়। সে সময় মঙ্গালকাব্যের কাহিনিগুলি পাঁচালী আকারেই বর্তমান ছিল অর্থাৎ মঙ্গালকাব্য বলতে যা বোঝানো হয় তা হল পৌরাণিক বা লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর পূজা প্রচার ও ভক্তিমূলক আখনধর্মী কাব্য। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ

পর্যন্ত এই কাব্যগুলিকে গান আকারে গাওয়া হতো। এখানে মঙ্গল কথাটি 'কল্যাণ' বা 'শুভ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'মঙ্গালকাব্য' এই নামকরণ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অনেকে মঙ্গালকাব্যকে 'লৌকিক পাঁচালী কাব্য' বলতে চান। এই কাব্যগুলি অবশ্যই লৌকিক, পৌরাণিক নয়। কাহিনি কাব্যের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি সেকালে পাঁচালী নামে পরিচিত ছিল। লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে মঙ্গাল হয়, এই সকল দেবতার বিশ্বাস, ভক্তি স্থাপন করলে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ঘটে —এই অর্থে নামটি সর্বজনীন হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচারে মঙ্গালকাব্যগুলিকে প্রধান ও অপ্রধান এই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, প্রধান মঙ্গালকাব্যগুলির মধ্যে পরে মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল ও শিবায়ন কাব্য। এর মধ্যে প্রাচীনতম মঙ্গালকাব্য হল 'মনসামঙ্গাল' বা 'পদ্মপুরাণ'। চৈতন্য পূর্ববর্তী মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিরা হলেন কানাহরি দত্ত, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই। বাংলা সাহিত্যের ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের মানবধর্ম তথা মানবতাবোধ সমাজে ও সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যগুলিতে প্রকাশ পায়নি। প্রাক্-চৈতন্য যুগে মঙ্গালকাব্যের দেবদেবীরা হিংস্রতা ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৪.৪. মঙ্গালকাব্যের গঠন বিন্যাস

গঠন বিন্যাসের দিক থেকে প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যগুলির চারটি ভাগ ছিল। যথা—

১. বন্দনা খণ্ড
২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা
৩. দেব খণ্ড
৪. নর খণ্ড

প্রথমত বন্দনা খণ্ড গ্রন্থ আরম্ভ হয় যেখানে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে বন্দনা বা স্তুতি করা হয়ে থাকে। এছাড়া গ্রন্থের প্রধান দেবতা ছাড়া এখানে অন্যান্য দেব-দেবী সহ পিতা মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। মঙ্গালকাব্যের দ্বিতীয় অংশের গঠন বিন্যাসে কবির আত্মপরিচয়, স্বপ্নাদেশ ও গ্রন্থ রচনার উৎস নির্দেশ বর্ণনায় মূল আলোচ্য বিষয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে মঙ্গালকাব্যগুলি রচনার পেছনে কবিদের দৈবকৃত স্বপ্নাদেশের কথা উঠে এসেছে। দেবখণ্ডে দেখানো হয়েছে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর মিলন বা সামঞ্জস্য। এই পর্যায়ে স্বর্গলোকের দেব-দেবীরা কোনো কারণে শাপগ্রস্ত হয়েছে এবং স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে পূজা প্রচারের চেষ্টা করেছেন। মঙ্গালকাব্যগুলির মূল অংশ নরখণ্ড। এখানে শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীরা মর্ত্যে এসে নানা উপায়ে পূজা প্রচার করেন এবং বাস্তবায়িত হলে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যায়। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যগুলির বিশেষ অংশ ছিল নর খণ্ড কেননা এখানে দৈব চরিত্রগুলিকে মানব চরিত্রের মর্যাদায় দেখানো হতো অর্থাৎ এখানে মানব চরিত্রের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠত।

৪.৫. মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

চৈতন্য পূর্ববর্তী কাল থেকে মনসামঙ্গাল কাব্যধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। মঙ্গালকাব্য প্রাক্-চৈতন্য যুগের হলেও একমাত্র মনসামঙ্গাল ছাড়া অন্য কোনো মঙ্গালকাব্যে প্রাচীন কবির পরিচয় তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। মনসামঙ্গাল কাব্যধারাতেই দেখা যায় যে চৈতন্যকালে কয়েকজন প্রখ্যাত কবি পূর্ণাঙ্গা কাব্য লিখেছিলেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মনসামঙ্গালের প্রধান তিনজন কবি হলেন কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং বিপ্রদাস পিপলাই। আদি কবি বলা হয় কানাহরি দত্তকে। তিনি চৈতন্য-পূর্বযুগের হলেও তাঁর রচিত কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়নি। তবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সহ অনেকে রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কাব্যকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের ধর্মমঙ্গাল কাব্যের নিদর্শন বলে দাবি করেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যগুলির বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

- **ভণিতা ব্যবহার :** এক্ষেত্রে মঙ্গালকাব্যের কবিরা কোনো প্রসঙ্গা বর্ণনার শেষে নিজের নাম পরিচয় বা আত্মবিবরণ দিতেন। এর মধ্য দিয়ে কবির নিজস্ব পরিচয় বা ব্যক্তিগত অভিলাষ প্রকাশ পেত। যেমন মনসামঙ্গালের কবি বিজয় গুপ্ত লিখেছেন—

  "প্রভাত সময়ে প্রকাশিত দগ্ধ আশা
  স্নান করি বিজয় গোপ্তে পূজিল মনসা।"

  আসলে এই ভণিতার মধ্য দিয়ে সমকালের কবিদের মানসিক ও সামাজিক অবস্থা প্রকাশ পেত।

- **পাঁচালী রীতি :** মঙ্গালকাব্যগুলি মূলত পাঁচালী ঢঙে গাওয়া হত, যা লোকসমাজের ছড়া ও ব্রতকথার মত প্রচলিত ছিল।

- **বারমাস্যা :** মঙ্গালকাব্যের একটি বিশেষ অংশ হলো বারমাস্যা। এখানে কাব্যের নায়িকাদের বারো মাসের দুঃখ বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **নারীদের পতি নিন্দা :** মঙ্গালকাব্যে বিবাহ বাসরে উপস্থিত নারীরা নিজ নিজ পতি নিন্দায় মুখরিত থাকত।

- **চৌতিশা :** মঙ্গালকাব্যের একটি বিশেষ রীতি চৌতিশা। এখানে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণমালার 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত ৩৪ বর্ণের প্রত্যেক বর্ণকে আদি বর্ণ রূপে ব্যবহার করা এবং নায়ক কর্তৃক দেবীর স্তব গান গাওয়া হত। বিপন্ন নায়ক স্তব গান করে বিপদ থেকে রক্ষা পেতেন।

- **রন্ধন প্রণালী :** মঙ্গালকাব্যের নায়িকাদের রন্ধন বিদ্যায় নিপুণভাবে দেখানো হয়েছে। এখানে ভোজন প্রিয় বাঙালির স্বভাব উঠে এসেছে।

এছাড়া রয়েছে অলৌকিকতা বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা। বিশ্বকর্মার শিল্পরীতি, নারীদের সতীত্বের বর্ণনা, দাম্পত্য কলহ, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা প্রভৃতি মঙ্গালকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মঙ্গালকাব্যের এই সমস্ত

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বেশ কিছু তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা মঙ্গালকাব্যে উল্লিখিত দেবদেবী বা নরনারীদের সম্পর্ক, অবস্থান প্রাক্-চৈতন্যযুগে লক্ষণীয়। মধ্যযুগে বাংলা দেশের লৌকিক আখ্যান হিসেবে মঙ্গালকাব্য বিশিষ্টতম। ঘটনার বিন্যাস উত্থান পতন, সংঘাত চরিত্র চিত্রনে যুগোচিত দক্ষতার পরিচয় মেলে। মধ্যযুগের বাঙালির জীবনযাত্রার স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে এই জাতীয় কাব্যে। আহার-বিহার, হাট-বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, পোশাক-অলংকার, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সামাজিক আচার-আচরণের বিবরণ বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন মঙ্গাল কাব্যের কবিরা। এছাড়া দেব চরিত্রের অমার্জিত নিষ্ঠুরতা, পুরুষের বীর্য ও পৌরুষ, সহজ সরল ভক্তি রসের স্থানে শক্তির রূঢ়তা এ যুগের মঙ্গালকাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রথমত, প্রাক্-চৈতন্যযুগের মঙ্গালকাব্যে আদিম সংস্কৃতির উগ্রতার পরিচয় বেশি। যেমন মনসামঙ্গাল কাব্যের মনসা ও চাঁদ সদাগর উভয়েই উগ্র, অনমনীয় ও হিংস্র। এমনকি বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যে চণ্ডী ও মনসা যে কুৎসিত কলহ ও মারামারি করেছে তাতে বিন্দুমাত্র শালীনতা নেই। চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিরা লৌকিক শিবের কামার্ত মূর্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যে নর খণ্ডের উপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত অর্থাৎ মঙ্গালকাব্যের দেবদেবীরা মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যে মনসা চরিত্রের হিংস্রতা ও পূজা, লোলুপতা বড়ো অশোভনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার চরিত্রে নারীসুলভ কোমলতা বা দেবসুলভ মহিমা কোনটাই উল্লেখিত হয়নি বরং তাতে লৌকিক জীবনের টানাপোড়েনে দেখানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, দেব বন্দনায় প্রাক্-চৈতন্য যুগের শিব, বিষ্ণু এবং মনসা কেবলমাত্র স্থান পেয়েছে।

চতুর্থত, চৈতন্য পরবর্তী যুগে মঙ্গালকাব্যগুলিতে যে ভক্তি রসের ভাব দেখা দিয়েছিল সেই বৈষ্ণবতার চিহ্ন মাত্র প্রাক্-চৈতন্য যুগে ছিল না।

৪.৬. মঙ্গালকাব্য উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষিত

প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে তুর্কি আক্রমণের প্রভাব বিদ্যমান। যার ফলে উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হয়েছিল। যে কারণে পরাজিত হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। মঙ্গালকাব্য উৎপত্তির পিছনে ধর্মনৈতিক এবং সাহিত্যিক দুটি কারণই বিদ্যমান। রাজনৈতিক পটভূমিও পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল। তুর্কি বিজয়ের পরবর্তীকালে বাংলা দেশে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য লৌকিক সংস্কৃতির একটা বোঝাপড়া, একটা আপোস সমন্বয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল। বাংলাদেশে ইসলামের ধর্মীয় সর্বগ্রাসিতা যখন প্রবল ও আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠেছিল তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাচ্যুত ও অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিল। তারই ফলে হিন্দু জাতি একটা সংহত জাতি হিসেবে দেখা দিল। পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটল। সেখানেই মঙ্গালকাব্য সৃষ্টির প্রেরণা। রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক কারণে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ হিন্দু ধর্ম সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। এর ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম বিশ্বাসের মিলন ঘটতে লাগল।

তুর্কি আক্রমণের ভয়ে ভীত বাঙালি সেই দুর্বিপাকের দিনে এমন এক দেবদেবীর আবির্ভাব কামনা করেছিলেন যারা এই আগত বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবে। ঠিক একইরকম ভাবে মঙ্গালকাব্যগুলিতেও এরূপ কল্পনা উঠে এসেছে। আসলে ভয় ও বিস্ময় থেকে জাত ভক্তি তথা ধর্মীয় আনুগত্যের চিহ্ন প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যে লক্ষণীয়। তুর্কি আক্রমণের ধ্বংস থেকে মানুষের মধ্যে যত অসহায় চেতনা প্রবল হতে থাকল ততই তৎকালীন মানুষের মনে একজন দেবীর উদ্ভব হতে থাকল।

প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণের ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। এছাড়া তুর্কি আক্রমণের ফলে এই বর্ণসংযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। আসলে আর্য ও অনার্য এই বিভেদের মূলে ছিল পুরুষতান্ত্রিকতা ও মাতৃতান্ত্রিকতা। মঙ্গালকাব্যে যা শিব ও শক্তির বিভেদ। যার ফলে মঙ্গালকাব্যগুলিতে দেখা দিল আর্যীকৃত অনার্য ভাবনা।

বর্ণ হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের দীর্ঘদিন ধরে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে সেই বর্ণ হিন্দুরা পুরনো ঝগড়া ভুলে পুনরায় একত্রিত হওয়ার স্বপ্ন দেখল। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মঙ্গালকাব্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রবল ভেদাভেদ ছিল। প্রাক্-চৈতন্য যুগের মনসামঙ্গাল কাব্যে তাই দেখা গেছে বণিক চাঁদ সদাগরকে দিয়ে পূজা প্রচার করা। সেসময় ব্রাহ্মণ্য সমাজের আধিপত্যতা বেশি ছিল।

এছাড়া মনসামঙ্গাল কাব্যে দেখা গেছে আর্য অনার্য ভাবনার প্রভাব। এখানে চাঁদ সদাগর আর্যদেব শিবের পূজা করেন অনার্য দেবী মনসাকে তিনি পূজা দিতে চাননি। এর মূলে আসলে তুর্কি আক্রমণের প্রভাব কেননা তুর্কি আক্রমণের ফলেই আর্য সমাজে অনার্যদের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। প্রাক্-চৈতন্য যুগের দেব-দেবীরা ভয় ও সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি থেকেই সৃষ্ট হয়েছিলেন যে কারণে প্রাক্-চৈতন্য যুগে মঙ্গালকাব্যের দেবদেবীরা প্রতিশোধ পরায়ণ। কেননা তুর্কি আক্রমণের ফলে মুসলমান ধর্মের অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় জনসাধারণ এক অলৌকিক দৈব শক্তির কল্পনা করেছিলেন।

মুসলমানদের আক্রমণ, পরাজয়ের স্মৃতি মঙ্গালকাব্যের কবিদের পীড়িত করেছিল। তাই বিভিন্ন কল্পকাহিনির আশ্রয়ে আক্রমণাত্মক কাহিনি কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রতিবিধানের সুযোগ করে নিয়েছিল। যে কারণে মঙ্গালকাব্যের প্রধান দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও শিবকে কেন্দ্র করে সেই সময় বেশ কিছু আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছিল। যেখানে মঙ্গালকাব্যের দেব-দেবীদের উদ্ভবের মূলে প্রভাবিত করার কার্যকারণ সম্পর্ক ও ক্ষমতা বা শক্তি প্রদর্শনের তত্ত্ব নিহিত ছিল। তাই মঙ্গালকাব্যগুলিতে দেখা গেছে পৌরুষের অধিকারী ক্ষমতাশালী চাঁদ সওদাগর এবং ধনপতিকে দিয়ে পূজা প্রচারের পরিকল্পনার প্রসঙ্গা বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে। প্রসঙ্গাত এখানে আর্য-অনার্যের সংস্কৃতিক মিলনও দেখানো হয়েছে। যদিও সংঘাতের মধ্যে দিয়েই এই মিলন ঘটেছিল। যে সংঘাত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত অর্থাৎ শিবের বিরুদ্ধে চণ্ডীর সংঘাত। তাই বণিক ব্যবসায়ীদের নৌকা ডুবলে তারা যেমন শিবের উপাসনা ছেড়ে শেষ কালে শক্তির উপাসনা করেছিল। হিন্দু সমাজও ঠিক একইরকমভাবে তুর্কি আক্রমণ তথা ইসলামিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে উচ্চ-নিম্ন ভেদাভেদ ভুলে শক্তির সাপেক্ষে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য দিয়ে বলা যেতে

পারে—

> 'বস্তুত সাংসারিক সুখ-দুঃখ-বিপদ সম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্ট দেবতার বিচার করতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না।.... তাই ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না।.... ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তির উপাসক হইতে হইল।'

অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলির সামাজিক প্রেক্ষিতের দিক থেকে তৎকালীন সময়ের ইতিহাসে ইসলাম ধর্মের অনমনীয় আক্রমণ থেকে বাঁচতে যেমন উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছিল একইভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতেও আর্য-অনার্য শক্তির বিভেদ ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে মিলন দেখানো হয়েছিল।

৪.৭. মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল কাব্য সাধারণত মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের কাহিনি নিয়ে গঠিত আখ্যানকাব্য। এই মনসামঙ্গালের কবিরা হলেন কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ। তবে আলোচ্য পর্যায়ে যে মনসা মঙ্গালকাব্যের কবিদের নিয়ে আলোচনা করব তাঁরা হলেন কানা হরি দত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও নারায়ণ দেব।

৪.৭.১. কানা হরিদত্ত: কবি পরিচিতি

মনসামঙ্গাল কাব্যের আদি কবি বলা হয় কবি কানাহরি দত্তকে। অনুমান করা হয় যে তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জন্ম ময়মনসিংহের সিংরৈল দত্তবাড়িতে। তিনি একজন সুদক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কবির পরিচয় ও আবির্ভাব কাল এখনও রহস্যাবৃত কেননা তার রচিত কোনো কাব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কবির পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গলের অন্য এক কবি বিজয় গুপ্তের কাব্য থেকে। তিনি কবি কানাহারি দত্ত সম্পর্কে বলেছেন—

> মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত, কানাহরি দত্ত।।

৪.৭.২. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়

কানাহরি দত্তের গ্রন্থের দু-একটি পৃষ্ঠা ছাড়া কোন সম্পূর্ণ পুঁথি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেন কয়েকটি ছত্রকে কানাহরি দত্তের ভণিতাযুক্ত রচনা 'পদ্মার সর্পসজ্জা' বলে উল্লেখ করেছেন।

মনসামঙ্গাল কাব্যে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কাহিনি অত্যন্ত প্রকটভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে কানাহারি দত্তের গৌরব। মনসা দ্বারা লাঞ্ছিত চাঁদ সদাগর ও বেহুলা লখিন্দরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে হতভাগ্য

সাধারণ মানুষের জীবনের সংগ্রাম কাহিনি তুলে ধরেছেন কবি। যার দ্বারা পরবর্তী অনেক কবি প্রভাবিত হয়ে মনসামঙ্গালের কাহিনি রচনা করেছে।

৪.৭.৩. বিজয় গুপ্ত: কবি পরিচিতি

মনসামঙ্গাল কাব্যের একজন সর্বাধিক প্রচারিত কবি হিসেবে খ্যাতি বিজয় গুপ্তের। তার জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার গৈলা (ফুল্লোশ্রী) গ্রামে। বিজয়গুপ্ত তাঁর গ্রামের বর্ণনা অনুসারে জানিয়েছেন পশ্চিমে ঘাগড়া নদী এবং পূর্বে খণ্ডেশ্বর নদ। তাঁর পিতার নাম সনাতন গুপ্ত এবং মাতা রুক্মিণী দেবী। জানা যায় কবি সংস্কৃতজ্ঞ ও বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন।

৪.৭.৪. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়

চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের কবি বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনাকাল নিয়ে রীতিমত সংশয় আছে। কাব্য রচনাকাল প্রসঙ্গো কবি হেয়াঁলী করে বলেছেন—

এক. 'ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।' — এই সূত্র অনুযায়ী ঋতু = ৬, শশী = ১, বেদ = ৪, শশী = ১ অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দ এবং ১৪৯৪ (১৪১৬ + ৭৮) খ্রিস্টাব্দ হলো কাব্য রচনাকাল।

দুই. ছায়া শূন্য বেদশশী পরিমিত শক। সনাতন হুসেন শাহ নৃপতিতিলক।। — অর্থাৎ ছায়া = ০, শূন্য = ০, বেদ = ৪, শশী = ১ অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

তিন. ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক। সুলতান হুসেন রাজা পৃথীবী পালক।। — অর্থাৎ ঋতু = ৬, শূন্য = ০, বেদ = ৪, শশী = ১ সুতরাং ১৪০৬ শকাব্দ = ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান হন হুসেন শাহ। তার বছরখানেকের মধ্যে দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি মনসামঙ্গাল কাব্য রচনা করেন যেখানে হুসেন শাহের নাম উল্লেখ আছে। সেই ক্ষেত্রে প্রথম মুদ্রিত অনুযায়ী কাব্য রচনাকাল ১৪৯৪ হওয়াই সঙ্গাত।

মঙ্গালকাব্যের ধারায় বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' প্রথম সন তারিখ যুক্ত কাব্য। বিশাল পরিমাণ পুঁথির সংখ্যা বিশিষ্ট কাব্যটি গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরস প্রয়োগে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে এবং পাণ্ডিত্যগুণে একটি জনপ্রিয় কাব্য। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' ২১টি পালাই বিভক্ত। প্রাক্-চৈতন্য সমাজের অকৃত্রিম বাস্তব চিত্র বজায় রেখেছেন কবি তাঁর কাব্যে। মঙ্গালকাব্যের ধারা অনুসারে হর-পার্বতী গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে বিজয় গুপ্তের কাব্য কাহিনির সূত্রপাত। এই অংশে পুরাণের পরিবর্তে দেব কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। শিবের বয়স্কা কন্যা মনসাকে কেন্দ্র করে শিবের দাম্পত্য কলহের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্য দিয়ে কবি মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের পারিবারিক জীবনের ছবি স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন।

মনসার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে আরও তিনটি কাহিনি বর্ণনা করেছেন কবি কাব্যের মধ্যে। প্রথমে রয়েছে পার্বতীর সঙ্গো মনসার বনিবনা না হওয়ায় নিত্য অশান্তি, যার জন্য শিব মনসাকে বনবাস

যাপনের ব্যবস্থা করে দেয়। অন্যদিকে নরখণ্ডে মূলত মানুষের কাহিনি প্রাধান্য পেয়েছে। মনসা সন্ন্যাসী সেজে রাখাল বালকদের বিশ্বাস অর্জন করে এবং তাদের বিপদে ফেলে পূজা আদায়ের চেষ্টা করে। রাখাল বালকদের মধ্যে নিজ মহিমা প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হলে মুসলমান সমাজে নিজ মহিমা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এভাবে মনসার মাহাত্ম্য প্রচার লৌকিক গল্পকথার ভঙ্গিতে হাস্যকর হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সহায়তা করে জেলে বৃত্তিধারী জালু ও মালুকে। সবশেষে কবির যথেষ্ট কাব্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় চাঁদ বণিকের আখ্যান বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা মনসার জোরপূর্বক নিজ পূজা প্রচারের জন্য মনসার নানা ছলা-কৌশল দেখতে পায়। যেমন চাঁদের গুয়াবাড়ি ধ্বংস, চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, ধন্বন্তরি হত্যা, লখিন্দরের বিবাহ, লোহার বাসর ঘর সাজানো ও বাসরে মৃত্যু, মাতা সনকার হৃদয় বেদনা, পিতা চাঁদের হৃদয়ের হাহাকার এবং ভাগ্যের কাছে পরাজিত বেহুলা প্রভৃতির বর্ণনা পায়। যার মধ্য দিয়ে করুণ রসের প্রাধান্য দেখতে পায় কাব্যে। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে বেহুলা চরিত্রটিকে এক সতী নারীর আদর্শে এঁকেছেন।

শেষ অবস্থায় আমরা দেখতে পাই নিজ পুত্রের প্রাণ ফিরে পাবার জন্য শিবের উপাসক চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে চাঁদকে মনসা বিদ্বেষী প্রতীক চরিত্র রূপে আঁকতে চাননি কিন্তু 'চেং মুড়িকানি' মনসাকে চাঁদ স্বীকার করে নিতে না পারলে শেষ মুহূর্তে শিবের উপাসক হওয়ায় বাঁ হাতে বেল পাতা দিয়ে মনসার পূজা করে। এভাবেই বিজয়গুপ্তের কাব্যটি চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শিল্প তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে।

৪.৭.৫. নারায়ণ দেব: কবি পরিচিতি

মনসামঙ্গল কাব্যধারার প্রাচীন কবি কানাহরি দত্ত ও বিজয় গুপ্তের পরেই অন্যতম প্রভাবশালী কবি নারায়ণ দেবের স্থান। তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়েও নানা মতপার্থক্য দেখা যায়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন— 'নারায়ণ দেব পঞ্চাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন এবং সম্ভবত বিজয় গুপ্তের কিছুকাল পূর্বে কাব্য রচনা করেন।' অন্যদিকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যও জানিয়েছেন— 'নারায়ণ দেব খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।' কবির কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব খুব অল্প পরিমাণ লক্ষ করা যায়, তাই অনেকেই নারায়ণ দেব চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে মনে করেন। তবে কোথাও কবির কাল নির্ণয় উল্লেখ না থাকায় পুঁথির ভাষার সাপেক্ষে তাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি বলা যেতে পারে। নারায়ণ দেবের জন্ম রাঢ় দেশ ছেড়ে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোর গ্রামে। এই গ্রাম শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতা রুক্মিণী দেবী। কবিরা জাতিতে কায়স্থ, গোত্রে মৌদগল্য, গুণাকার গাঞি।

৪.৭.৬. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়

নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। এই কাব্য উত্তরবঙ্গ ছাড়িয়ে আসামে বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আসামে বহুল প্রচলনের জন্য সেখানকার সাহিত্যিকরা নারায়ণ দেবকে তাঁদের কবি বলে মনে

করেন। কবি তাঁর কাব্যের ভণিতায় 'সুকবিল্লভ' শব্দটি ব্যবহার করেন। এই 'সুকবিল্লভ' বা 'কবি বল্লভ' নারায়ণ দেবের উপাধি বলে মনে করা হয়। কবির নামে অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। পুঁথির পাঠগত বৈষম্য থাকলেও অন্যান্য কবির পুঁথি অপেক্ষা নারায়ণ দেবের পুঁথি অনেকখানি প্রমাণসিদ্ধ। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত একখানি প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে সংগৃহীত আছে।

নারায়ণ দেবের 'পদ্মপুরাণ' কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেব বন্দনা, দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক আখ্যান ও তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের পরিচিত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের প্রথম খণ্ডে কবি তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণা ও দেবতার স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন—

বারয় বৎসর কালে দেখিলাম স্বপন।
মহা পরিশ্রম মনে হইল দরশন।।

নারায়ণ দেবের কাব্যে দেবখণ্ডের তুলনায় নরখণ্ডের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। কবি বিজয় গুপ্ত যেমন লৌকিক কাহিনিকে বেশি তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে ঠিক তেমনই লৌকিক কাহিনিকে বাদ দিয়ে পৌরাণিক কাহিনিকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন নারায়ণ দেব। সংস্কৃত পুরাণে অভিজ্ঞ কবি নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ মহাভারত, শিবপুরাণ, কালীকাপুরাণ, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। তাঁর কাব্যের দেব খণ্ডটি পৌরাণিক কাহিনি ও রসে সমৃদ্ধ হয়েছে যা বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত কোনো কবির রচনায় লক্ষ করা যায় না।

নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে ধর্মের শিথিলতার পরিবর্তে মানবধর্মের পূর্ণতার দিকে জোর দিয়েছিলেন। তাঁর অত্যধিক পুরাণ নির্ভরতার কারণে কাব্যের চরিত্রগুলি খুব বেশি বিকশিত হয়নি। কবি চাঁদের পৌরুষ দীপ্তমান না করে অনমনীয় ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে মনসা সাড়ম্বরে পূজার পরিবর্তে অন্যরকম শর্ত আরোপ করে। শিব ভক্ত চাঁদসদাগর মনসার মাথায় নিজের নামের চাঁদোয়া টাঙিয়ে তার ওপর বাম হাতে পিছন ফিরে ফুল জল দিয়ে পূজা করেছেন। কিন্তু কবি তাঁর কাব্যে বেহুলাকে অন্যরকম ভাবে উপস্থাপন করেছে। যেখানে বেহুলা শুধু গৃহচারিণী নারী নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় দেয়। বাসর ঘরে স্বামী লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে দেবালয়ে আরোহণ করে বেহুলা সংগ্রামশীল দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে কাব্য মধ্যে।

নারায়ণ দেবের কাব্যে হাস্যকৌতুক ও করুণরসে মধ্যে ব্যঙ্গের তীর্যকতা লক্ষ করা যায়। যেমন, ডোমিনি বেশিনী চণ্ডীর প্রতি মহাদেবের কামাসক্তি দেখে দেবীর ব্যঙ্গাক্তি—

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিবা পাকাবেল।।
বৃদ্ধ হইলে পাইকের ভাবকীমাত্র সার।
তোমার মুখে চাহ আমাক বশ করিবার।।

এছাড়া বেহুলার বিবাহে আগত নারীগণের পতিনিন্দা ও লখিন্দরকে দেখে বৃদ্ধাগণের নির্লজ্জ কামাসক্তি প্রকাশ হাস্যকর বর্ণনা হয়ে ওঠে কাব্যে, যা সেই সমাজের একটি নিন্দনীয় ঘটনা। অপরদিকে ঐতিহাসিক উপাদানের প্রভাবও যথেষ্ট। যেমন চাঁদের বাণিজ্য যাত্রা, নানা দেশ ও নদ-নদীর বিবরণ সামাজিক আচার-আচরণ ও রীতিনীতি প্রভৃতি। মঙ্গলকাব্যের অপর কবি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস তাঁদের কাব্যে মুসলমান সমাজের হাসান-হুসেনের নাম করলেও নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যে মুসলমান সমাজের প্রতি অনুদারতা দেখান না।

বাস্তবধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে রসোবৈচিত্র্য ও পৌরাণিক কাহিনি প্রকাশে নারায়ণ দেব অধিক প্রশংসনীয়। বিশেষ করে চাঁদ সদাগরের কঠোরতা ও কোমলতার সমন্বয় এবং বেহুলা চরিত্রে বীরাঙ্গনা স্বরূপ দৃঢ় মনোবলের মধ্য দিয়ে যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তাঁর কাব্যে এই গুণকে এক আশ্চর্য কৌশল বলা চলে। যার দ্বারা পরবর্তী পূর্ব বঙ্গের কবি দ্বিজ বংশী দাসও প্রভাবিত হয়েছিলেন। নারায়ণ দেবের এই 'পদ্মপুরাণ' কাব্য উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা আসামে অধিক প্রচলিত ছিল।

৪.৭.৭. বিপ্রদাস পিপিলাই : কবি পরিচিতি

পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি কবি বিপ্রদাস পিপিলাই বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। সুকুমার সেন মনসামঙ্গালের প্রাচীন কবি রূপে বিপ্রদাসকে স্বীকৃতি দিলেও আশুতোষ ভট্টাচার্য তা স্বীকার করেননি। তিনি বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত।

৪.৭.৮. রচনাকাল ও গ্রন্থপরিচয়

কবি বিপ্রদাসের কাব্যের আত্ম-বিবরণী থেকে জানা যায় কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে 'হিন্দু ইন্দু বেদ সব পরিমাণ। নৃপতী হুসেন শাহ গৌড়ের প্রধান।।' অনুমান করা যায় হোসেন শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে (১৪১৭ শকাব্দ) কাব্যটি রচিত হয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যের প্রকৃত নাম পরিষ্কার নয়। 'মনসামঙ্গাল', 'মনসা বিজয়' ও 'মনসাচরিত' তিনটি নামই পাওয়া যায়। তবে আচার্য সুকুমার সেনের কথা অনুযায়ী বিপ্রদাস তাঁর কাব্যে বারংবার 'মনসা বিজয়' নামটি উল্লেখ করেছেন। সেই দিক দিয়ে আমরা বিপ্রদাসের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়' বলতে পারি।

'শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে। শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে।।' বিপ্রদাসের আত্মপরিচয়ের এই শ্লোক থেকে আমরা কবির কাব্য রচনার কথা জানতে পারি। কবি তাঁর কাব্যে বাস্তবতা ও জীবন্ত বর্ণনা ভঙ্গোর মধ্য দিয়ে স্বকীয় কল্পনার পরিচয় দিয়েছে। যেখানে মঙ্গালকাব্যের অন্যান্য কবিরা বেহুলা লখিন্দরের কাহিনিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে বিপ্রদাস সমগ্র কাহিনিকে সুবিন্যস্ত করে তুলে ধরেছেন ১৩টি পালার মধ্যে দিয়ে।

দেব বন্দনা ও মনসার জন্ম কথা নিয়ে কাব্যের সূচনা। ধর্মের আদেশে কালিদহে শিব ফুল আনতে গিয়ে কামার্ত হলে কাম বিন্দু পদ্ম পাতায় পড়ে তা জলে গড়িয়ে যায়, সেখানে থেকে বাসুকির মা নির্মাণের মাথায় পড়ে এবং তা পুতুল বানিয়ে প্রাণ দান করে নাম দেয় পদ্মাবতী। বাসুকির বরে পদ্মাবতী বিষ ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে ওঠে। শিবের মানস কর্মের জন্য শিব কন্যার জন্ম হওয়ায় নাম রাখে মনসা। দ্বিতীয় পালায় সমুদ্রমন্থনের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। পুনরায় শিব সমুদ্র মন্থন করতে চাইলে ব্রহ্মা বলেন—

পুনরপি মথনে হইব পরমাদ।

শিব ব্রহ্মার কথা শুনে বলেন ভালো মন্দ সব নিয়ে মন্থন করবেন। পরবর্তীতে বিশ্বকর্মা মনসার জন্য সিজুয়া পর্বতে বিশাল মনোরমপুরী বানিয়ে দেয়। অনেক সখীদের সঙ্গে সেখানে আনন্দে দিনপাত করেন মনসা। তৃতীয় পর্বে মূলত মনসার বিবাহ প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পেয়েছে। শিব মনসার পাত্র হিসেবে জরৎকার মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন। অতঃপর বাকি অংশ বিজয় গুপ্তের মতোই বর্ণিত। কিন্তু মঙ্গলকাব্য ধারার বাকি কবিদের সাথে তুলনা করলে বিপ্রদাস অনেক এগিয়ে।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য মধ্যে হাসান-হুসেনের পালাটি দীর্ঘতর ও সুপরিকল্পিত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায়। প্রত্যেকটি চরিত্র চিত্রণে বিপ্রদাসের অভিনবত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনসার চরিত্রটি বেশিরভাগ কাব্যে নির্মম ও কঠোর কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা চরিত্রের অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এখানে মনসার করুণা ও স্নেহ মমতার সঞ্চার দেখা যায়। কিন্তু বিপ্রদাসের কাব্য মধ্যে চাঁদের চরিত্র সৃষ্টিতে কবির অসফলতার কিছুটা প্রকাশ পাওয়া যায়। চাঁদের পৌরুষত্ব সেভাবে দীপ্তবান হয়নি এ কাব্যে। শিব ভক্ত চাঁদ মনসার পূজা প্রত্যাখ্যান করলে মনসা নানা কৌশলে চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে এবং সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার সময় চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবিয়ে দেয়। চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের সাথে বেহুলার বিবাহ স্থির হলে মনসা বৃদ্ধ সেজে সাঁতালি পর্বতের সাজানো লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র তৈরি করে চক্রান্ত পূর্বক লখিন্দরের মৃত্যু ঘটায়। পুত্রের মৃত্যুতে চাঁদ দুঃখ প্রকাশ করে বলে—

কত পাপ কৈনু মুঞি জন্মিয়া ভূতলে।
কত দুঃখ বিধি মোর লিখিল কপালে।।

লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা বহু বিপদ অতিক্রম করে স্বর্গে দেবতাদের নৃত্যে তুষ্ট করে। দেবতাদের আদেশে মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে চায় একটি শর্তে, যদি চাঁদ সদাগর তার পূজা করে। কাব্যের শেষে দেখা যায় চাঁদ মনসার বিরোধিতা করে নিজে কষ্ট পায় এবং মনসার কাছে শাস্তি প্রার্থনা করে—

মস্তক উপরে করো চরণ প্রহার।
দোষ নিন্দা এবে শাস্তি হউক আমার।।

এভাবেই মনসার কাছে চাঁদের নতি স্বীকার করার মধ্য দিয়ে বিপ্রদাসের কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে।

৪.৮. রামাই পণ্ডিতের ‘ধর্মমঙ্গাল’

ধর্মমঙ্গাল কথাটা শুনলেই আমাদের মনে হয় মধ্যযুগের মঙ্গালকাব্য ধারায় লৌকিক দেবদেবী নির্ভর এক ধরনের পাঁচালী কাব্য। যেখানেই বাস্তবিক সাংসারিক মানুষের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে দেবতার আবির্ভাব ঘটে এবং পূজা-পার্বণের মাধ্যমে তাঁর মাহাত্ম্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে ‘ধর্মমঙ্গাল’ এমনই একটি মঙ্গালকাব্য যেখানে ধর্মদেবতা একজন পুরুষ দেবতা। ধর্মঠাকুরের পূজা মূলত নিম্নবর্ণের মধ্যে দেখা যায়। বার্ষিক পূজাতে চৈত্র সংক্রান্তিতে ডোমেরা প্রথম পূজা করে তারপর বাকিদের মধ্যে পূজা শুরু হয়। উল্লেখ্য এই পূজায় কোনো পুরোহিত লাগে না।

ধর্মমঙ্গালে মূলত দুটি কাহিনি— রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি, লাউসেনের কাহিনি। প্রথমটি পুরাণকথা নির্ভর, দ্বিতীয়টি অনেকটা সমকালীন ইতিহাস ঘেঁষা। ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, যদুনাথ, শ্যামপণ্ডিত, প্রমুখ কবি ধর্মমঙ্গাল কাব্য রচনা করেছেন। মোটামুটি ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী এই কাব্যের রচনাকাল ধরা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই লোকশ্রুতিকে আশ্রয় করে ধর্ম পুজার মাহাত্ম্য, নিয়মাবলি লিখিত। ঠিকঠাক মূল পুঁথি পাওয়া যায় না। তবে রমাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’ ধর্ম পূজার প্রাচীনত্বের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন— ‘ধর্মঠাকুরের পুঁথি পড়িতে গেলেই একজনের নাম সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার নাম রামাই পণ্ডিত।’ তাঁকে ধর্ম পূজার আদিগুরু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন— ‘বঙ্গের নিম্নশ্রেণির মধ্যে ধর্মপূজার প্রধান পাণ্ডা রামাই পণ্ডিত মহারাজ ধর্মপালের সময় বর্তমান ছিলেন।’ শূন্যপুরাণ থেকে ধর্ম পূজার চারজন প্রধান পুরোহিতের কথা জানতে পারা যায়। সেতাই পণ্ডিত, নীলাই পণ্ডিত, কংসাই পণ্ডিত এবং রামাই পণ্ডিত।

বাংলা সাহিত্যে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। তাঁর শূন্যপুরাণ রচনা ৫১টি অধ্যায়ে। যেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা, ধর্মপূজার পদ্ধতি প্রভৃতি বর্ণিত রয়েছে। ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ নামক একটি অংশ আছে। ইতিহাসগত দিক থেকে এই ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ অংশটি ত্রয়োদশ শতকের বাংলায় তুর্কি আক্রমণ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কথা জানতে পারা যায়। প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গাল’ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩০৪ ব.) প্রবন্ধে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের ‘নিরঞ্জনের রুষ্মা’ অংশে বলা হয়েছে—

ধর্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কালো টুপি, হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলে একনাম।
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত অবতার, মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার।।
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজি, কার্ত্তিক হৈহল কাজি, ফকির হইল যত মুনি।।

....

আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিহুঁ হৈলা হায়া বিবি, পদ্মাবতি হল্য বিবিনুর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে একমন, প্রবেশ করিল জাজপুর।।

এখানে বলা হচ্ছে ব্রাহ্মণদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য ধর্ম ঠাকুরের নির্দেশে দেবতাগণ মুসলমানের বেশ ধারণ করে জাজপুরে প্রবেশ করে। একটা সময় বর্ণ হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর অত্যাচার চালাত, তাদেরকে নানাভাবে হেয় করত। সেখান থেকেই এই নিম্নবর্ণের জনজাতির মধ্যে একটা হিন্দু বিদ্বেষ গড়ে উঠতে থাকে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই সামাজিক অন্যায়, অত্যাচারিত হওয়া এই জনজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষ প্রবলভাবে দানা বাঁধতে থাকে। যার ফলে বাংলায় তুর্কি আক্রমণকে দৈবের মার বলে এক শ্রেণির হিন্দু উল্লসিত হয়েছিল, মুসলমানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল ব্রাহ্মণদের জব্দ করতে। এই থেকে বোঝা যায় বাংলার তুর্কি আক্রমণকে এক শ্রেণির হিন্দু সমর্থন জানিয়েছিল। অর্থাৎ ধর্ম পূজার আদিগুরু বলে চিহ্নিত রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' নামক গ্রন্থ কেবল ধর্ম পূজার বিধান সম্পর্কিত তথ্যই তুলে ধরেনি, পাশাপাশি প্রাক্-চৈতন্য সময় পর্বে প্রাচীন বাংলায় শাসকের পরিবর্তন এবং ধর্মাচরণের সমূহ বিবর্তনকে নির্দেশ করেছে।

৪.৯. সারাংশ

প্রাক-চৈতন্য সময়পর্বেই এই বাংলায় মঙ্গলকাব্যের ধারাটি সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, গঠনবিন্যাস এবং মঙ্গলকাব্যের গতিপথ নির্দেশ করতে গেলে আমাদের মূলত প্রাক্-চৈতন্য সময়পর্বে রচিত মঙ্গলকাব্যের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। অতঃপর মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষিতটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ তুর্কি আক্রমণ পরবর্তী সময়কালে মধ্যযুগের সাহিত্য ভাবনায় সামাজিক উত্থান পতনের ছবিটিও চিত্রিত হয়েছে। উচ্চ ও নিম্নবর্গের সমন্বয় ভাবনা মঙ্গল কাব্যের নির্মাণ ভাবনায় লক্ষণীয়। ১. বন্দনা খণ্ড, ২. গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, ৩. দেব খণ্ড, ৪. নর খণ্ড সমন্বিত মঙ্গলকাব্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপাদান যেমন বিদ্যমান তেমনই সাধারণ মানুষের ভক্তি ভাবনা থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনচর্যার লোকজ উপাদানগুলির উপস্থিতি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। ভণিতা ব্যবহার, বারমাস্যা, চৌতিশা, রন্ধন প্রণালী সহ একাধিক বিষয়ের বর্ণনায় মধ্যযুগের বাঙালি জীবনকে খুঁজে পাওয়া যাবে এই মঙ্গলকাব্যে। প্রাক চৈতন্য পর্বে মঙ্গল কাব্যের শাখায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ হল মনসামঙ্গল কাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি হলেন কানা হরিদত্ত। তবে প্রাক চৈতন্য পর্বে মনসামঙ্গাল কাব্য রচনায় অধিক পরিচিত কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। তবে বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ এক ব্যতক্রমী দৃষ্টান্ত। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তী সময়কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরোধিতা চিহ্ন থেকে শুরু করে বাংলায় যবন তথা মুসলমান শক্তির আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় এই কাব্যে।

৪.১০. অনুশীলনী

❑ **বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

১. মঙ্গালকাব্যের স্বরূপ এবং গঠন বিন্যাস সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

২. মঙ্গালকাব্য উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষিতগুলি প্রসঙ্গাসহ আলোচনা করুন।

৩. মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় আদি কবি বলে কে পরিচিত? উক্ত কবির কাব্য সম্পর্কে আপনার মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করুন।

৪. মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কবি বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব নির্দেশ করুন।

৫. মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কবি নারায়ণ দেবকে কেন মনে রাখব তার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৬. মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের কৃতিত্ব নির্দেশ করুন।

৭. বাংলা সাহিত্যে রামাই পন্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যের অবস্থান নির্দেশ করুন।

৮. প্রাক চৈতন্য পর্বে রচিত মঙ্গলকাব্যের বিশেষ দিকগুলি তুলে ধরুন।

❑ **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

৪.১১. গ্রন্থপঞ্জি

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ- ২০১০-২০১১

২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.), *কবি বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল*, নিউ বইপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭

৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, কলিকাতা বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪

৫. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, আনন্দ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ- ২০১৩

■ **পত্র-পত্রিকা :**

১. কর, প্রদীপ ও মাইতি, তুলসী (সম্পা.) *টেরাকোটা*, মনসা বিশেষ সংখ্যা, জুলাই-অক্টোবর, ২০২৩

মডিউল-২

মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস

(ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

একক-৫ ❑ মঙ্গলকাব্যের ধারা (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ মঙ্গলকাব্য: সাধারণ পরিচয়

৫.৪ মনসামঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

৫.৫ মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু

৫.৬ মনসামঙ্গল কাব্যের কবি-পরিচিতি

 ৫.৬.১ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি

 ৫.৬.২ ষোড়শ শতাব্দীর কবি

 ৫.৬.৩ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি

৫.৭ প্রাক্-চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গল কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা

৫.৮ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

৫.৯ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু

৫.১০ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি-পরিচিতি

 ৫.১০.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি

 ৫.১০.২ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপ্রধান কবি

৫.১১ ধর্মমঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

৫.১২ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু

৫.১৩ রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গল

৫.১৪ কবি পরিচিতি

৫.১৫ অন্নদামঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

৫.১৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনকথা

৫.১৭ অন্নদামঙ্গল কাব্য: বিষয়বস্তু

৫.১৮ অন্নদামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য

৫.১৯ অন্নদামঙ্গল কাব্যের চরিত্রচিত্রণ

৫.২০ সারসংক্ষেপ

৫.২১ অনুশীলনী

৫.২২ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাব্য পাঠের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগে নিম্নবর্গের সমাজে প্রচলিত লৌকিক দেব-দেবীর পরিচয় আধুনিক শিক্ষিত জনসমাজে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিটি মঙ্গালকাব্যে প্রচলিত আখ্যানের মধ্যে থেকে সমকালের সামাজিক স্তর-বিভাজন, নিম্নবর্গের মানুষের জীবনধারা, লোকবিশ্বাস, সংস্কৃতির নানা উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গাল কাব্যে দেবী মনসাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সমাজজীবন, চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে কেন্দ্র করে ব্যাধ সমাজের পরিচয়, ধর্মমঙ্গাল কাব্যে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে রাঢ় জনজাতির পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি। এগুলির মধ্যে থেকে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটা বিস্তীর্ণ সময়ের চালচিত্র বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা লাভ করতে পারি। সমকালীন ইতিহাসচর্চার যা একটি মুখ্য উপাদান। এছাড়াও মঙ্গালকাব্যগুলি রচনার নির্দিষ্ট কাঠামো, সমকালীন ভাষারীতি, শব্দ, ছন্দ ইত্যাদি প্রকরণগত দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা মঙ্গালকাব্য পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫.২ প্রস্তাবনা

তুর্কি আক্রমণের দীর্ঘ দু'শো বছর পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি বিজাতীয় শাসকদের রূঢ়তা, সমসাময়িক অস্থিরতা কাটিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পদমর্যাদার প্রলোভনে অনেকটা নিশ্চিত জীবন-যাপনের আশ্বাস পেয়ে নিম্নবর্ণের একটি বিরাট অংশের মানুষ ইতিমধ্যেই দল বেঁধে বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে শুরু করলে উচ্চবর্ণের চমক ভাঙল। অনার্য সম্প্রদায়ের দীর্ঘলালিত অসন্তোষ আর মানসিক অস্থিরতা তারা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁরা বুঝলেন নিজস্ব ধর্মে আঘাত লাগলে যন্ত্রণায়-বেদনায়, ক্ষোভে-রোষে মানুষ উগ্র হয়ে ওঠে। ধর্মীয় দেব-দেবীকে প্রাধান্য দিলে অতিসহজেই মানুষ মানুষের আপনজন হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণির মানুষকে কাছে টানবার উদ্দেশ্যে তাঁরা নিম্নশ্রেণির মানুষের দেব-দেবীকে মর্যাদা দিলেন। তাদের লোককথাকে নিয়ে লিখলেন নতুন রীতির কাব্য। ফলে প্রচলিত লৌকিক রীতির মধ্যে রাখালিয়া সমাজের কাহিনি আর অপাংক্তেয় হয়ে রইল না। নারীদের ব্রতকথার সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রচলিত হল নতুন রীতির সাহিত্য। আর সেসব সাহিত্যের নাম দেওয়া হল মঙ্গালকাব্য। মঙ্গালকাব্যগুলি তাই 'বৃন্তহীন পুষ্পসম' আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠেনি। আর্য-অনার্য সমাজের তীব্র জল-অচলভেদ থেকেই জন্মলাভ করেছিল এই নতুন ধারার লৌকিক সাহিত্য। এই এককে মনসামঙ্গাল, চণ্ডীমঙ্গাল, ধর্মমঙ্গাল কাব্যের বিষয়বস্তু থেকে কবি পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য আলোচনার সাপেক্ষে সমকালের সমাজ-রাজনীতির স্বরূপ পর্যালোচনা করব।

৫.৩ মঙ্গালকাব্য: সাধারণ পরিচয়

'মঙ্গাল' নাম কী ও কেন? —এ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। এ বিষয়ে 'নানা মুনির নানা মত'। কেউ মনে করেন, গৃহস্থের কল্যাণ বা মঙ্গাল সাধনাই এই জাতীয় দেব-দেবীর পূজা

প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেউ বা মনে করেছেন, 'মঙ্গাল' একটি বিশিষ্ট সুর বা রাগিণীর নাম। ব্রতকথা বা পাঁচালিতে এই সুরে কাব্যটি গীত হত। কারো কারো মতে, মঙ্গালকাব্যের কাহিনি দীর্ঘ আটদিন ধরে দু'বেলা সমাজে গাওয়া হত। এক মঙ্গালবারে গান শুরু হত, তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলত পরের মঙ্গালবার পর্যন্ত। দীর্ঘ আটদিন ধরে পরিবেশনের দরুণ কেউ কেউ মঙ্গালকাব্যগুলিকে 'অষ্টমঙ্গালা' নামেও অভিহিত করেছিলেন।

গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মঙ্গালকাব্যের চারটি বিভাগ লক্ষ করা যায় : (১) বন্দনা ২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও আত্মবিবরণী অংশ (৩) দেবখণ্ড (৪) নরখণ্ড। কাব্যের প্রথমেই কবিগণ আরাধ্য দেব-দেবীর বন্দনা করেছেন। এরপর গ্রন্থ রচনার বস্তুনিষ্ঠ কারণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেবখণ্ড অংশে স্বর্গীয় দেব-দেবীদের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নরখণ্ড অংশটিতে শাপভ্রষ্ট দেবতাদের মর্ত্যধামে জন্মলাভের কথা বলা হয়েছে।

মঙ্গালকাব্যের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একাধিক ধারা। এগুলির মধ্যে, সাপের দেবী মনসাকে নিয়ে লেখা হল মনসামঙ্গাল কাব্য, পশুপাখিদের দেবী চণ্ডীকে নিয়ে লেখা হল চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য, লৌকিক দেবতা শিবের মাহাত্ম্যকথা নিয়ে লেখা হল শিবমঙ্গাল কাব্য প্রভৃতি। এগুলিই মূলত মঙ্গালকাব্যের প্রধান ধারা। এছাড়াও অঞ্চল বিশেষে চালু ছিল নানা রীতির অপ্রধান ধারার মঙ্গালকাব্য। যেমন, শীতলামঙ্গাল, কালিকামঙ্গাল, রায়মঙ্গাল প্রভৃতি। আমাদের আলোচনায় মঙ্গালকাব্যের প্রধান প্রধান ধারাগুলিই উঠে আসবে।

৫.৪ মনসামঙ্গাল : প্রারম্ভিক পরিচিতি

নদীমাতৃক বাংলা দেশ এবং তা ভীষণ সর্পসংকুলও বটে। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে মনসা দেবী জনমানসে সমধিক পরিচিত। লৌকিক ভয়ভীতি থেকেই তার আবির্ভাব। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে মনসাকে শিবের মানসকন্যা বলা হয়েছে। মনসা শিবকন্যা রূপে গৃহীত হলে অনার্যদেবীর আর্যীকরণ ঘটে; এই জন্ম সংক্রান্ত কাহিনি প্রাগার্য উৎসের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। প্রাচীন পদ্মাপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মনসার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে সর্পদেবী জাঙ্গুলির কথা আছে। সাধনমালায় দেবীকে জাঙ্গুলি বা জাঙ্গালি তারা বলা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্পদেবী জাঙ্গুলিকেই মনসার ভিত্তিরূপে প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পদেবী 'মঞ্চাম্মা' থেকে মনসার উৎপত্তি বলে মনে করেন। ক্ষিতিমোহন সেন মনে করেছেন, এর থেকে মনসা মা শব্দবন্ধের উদ্ভব। এই মনসাদেবীর প্রসঙ্গা যে কাব্যের বিষয় সেই কাব্য মনসামঙ্গাল কাব্য রূপে পরিচিত। মনসা লৌকিক দেবী হলেও ড. সুকুমার সেন তাঁকে পৌরাণিক দেবীর রূপান্তর বলে মনে করেছেন। প্রাথমিক পর্বে মনসা দেবী অভিজাত সমাজে গৃহীত হননি, মূলত জেলে, দরিদ্র কৃষকদের দ্বারাই পূজিত হতেন। মনসাকথা, মনসাগান, মনসামঙ্গাল কাব্যেও এই সামাজিক অবস্থানের প্রভাব লক্ষণীয়। মূলত মহিলাদের দ্বারা পূজিত হওয়ার ফলে মনসাকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের দেবীরূপে কল্পনা করেছেন।

৫.৫ মনসামঙ্গাল কাব্যের বিষয়বস্তু

মনসামঙ্গাল কাব্য-কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চম্পকনগরীর সে এক প্রতিষ্ঠিত বণিক, প্রভূত তার নামডাক। এহেন প্রতাপশালী বণিক চাঁদ সওদাগর কিছুতেই মনসাপূজা করতে নারাজ। অথচ

চাঁদের কাছে পূজা আদায় করতে না পারলে মনসার দৈবী-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই মনসা চাঁদের পূজা পাবার জন্য তাকে বিভিন্নভাবে অনুরোধ-উপরোধ করেছে এবং পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে চাঁদের ওপর আক্রমণ করেছেন। চাঁদের ছয় পুত্র মারা গেছে, চৌদ্দ ডিঙা মধুকরের সলিলসমাধি ঘটেছে কিন্তু তাতেও অপ্রতিরোধ্য চাঁদকে টলানো সম্ভব হয়নি। অবশেষে পুত্রবধূ বেহুলার মধ্যস্থতায় চাঁদ সওদাগর নিমরাজি হয়। এবং অবজ্ঞাভরে মনসার প্রতি পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে। এভাবেই মনসার দৈবশক্তি ও চাঁদের পুরুষকারের শক্তির আপস মীমাংসার মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গালের কাহিনি শেষ হয়। শিবের উপাসক চাঁদ সওদাগরের হাতে মনসা পূজা প্রচলনের কাহিনি আর্য সমাজে অনার্যদেবীর প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনি।

৫.৬ মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি-পরিচিতি

মনসামঙ্গাল কাব্যকে নানাধারায় ভাগ করা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখ্য (১) রাঢ়বঙ্গের ধারা, (২) পূর্ববঙ্গের ধারা এবং (৩) উত্তরবঙ্গের ধারা।

রাঢ়বঙ্গের কবিদের মধ্যে বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ, পূর্ববঙ্গের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুগ বা কালের বিচারে মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) প্রাক-চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি (২) উত্তর-চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গাল কাব্যের কবি।

(১) প্রাক-চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিদের মধ্যে কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রামাণিক পুথির বিচারে আদি কবি হিসেবে বিজয় গুপ্তের নাম জানা যায়।

(২) উত্তর চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গাল কাব্যের কবিদের মধ্যে তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

৫.৬.১ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি

বিজয় গুপ্ত : আদি কবি হিসেবে বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে কানাহরি দত্তের নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর কোনো প্রামাণিক পুথি পাওয়া যায়নি। উল্লেখ আছে—

> "মূর্খে রচিত গীত না জানে মাহাত্ম্য।
> প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত।।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গাল কাব্যধারার অতি জনপ্রিয় কবি ছিলেন বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে তাঁর কাব্যের প্রচার ছিল বেশি। এই কারণে তাঁর কাব্যের একাধিক পুথি পাওয়া

যায়। যেগুলিতে প্রাপ্ত রচনাকালের সন তারিখের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেমন, "ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত। অঙ্কস্য বামা গতি" নিয়মে দাঁড়ায় ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয়ত, "ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক" অর্থাৎ ১৪০০ শকাব্দ বা ১৪৭৮ খ্রিষ্টাব্দ। তৃতীয়ত, "ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক।।" অর্থাৎ ১৪০৬ শকাব্দ বা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ। হুসেন শাহের তথ্য অনুযায়ী কাব্যটি মোটামুটি ১৪৯৪ সালে রচিত, এরূপ ধরা হয়।

বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান বরিশাল জেলার গৈলাফুল্লশ্রী গ্রাম। পিতা সনাতন, মাতা রুক্মিণী দেবী। তবে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে মানবজীবনের কবি। দেবতা চরিত্রকে বস্তুনিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন। তাদের তিনি দোষগুণে গড়া মানুষের মতো প্রবৃত্তিতাড়িত রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হিসাবে নির্মাণ করেছেন। বাস্তব জগতের নিখুঁত চিত্রাঙ্কণে ও মনসা, চাঁদ সদাগর, বেহুলা, সনকা প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে করুণরস, হাস্যরস পরিবেশনে তিনি সুকৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নারায়ণ দেব : পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যধারার পূর্ববঙ্গের অপর এক জনপ্রিয় কবি ছিলেন নারায়ণ দেব। তাঁর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রাম। তাঁর পিতা নরসিংহ ও মাতা রুক্মিণী। তাঁর উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। তাঁর কাব্য 'পদ্মপুরাণ' নামে পরিচিত। মহাভারত, কুমারসম্ভব, শৈবপুরাণ প্রভৃতি কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি কাব্যকায়া নির্মাণ করেছিলেন। এই কারণে তাঁর কাব্যে পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতি যথোচিত মর্যাদা ফুটে উঠেছে। বিজয় গুপ্তের মতো তিনিও চরিত্রচিত্রণে উন্নততর শিল্পকর্মের পরিচয় দান করেছেন। পুরুষকারের অনমনীয় সমুন্নতিতে চাঁদ সদাগর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেহুলার পতিভক্তিতে অবিচল নিষ্ঠা ফুটে উঠেছে। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে সে যাত্রা করেছে স্বর্গের উদ্দেশ্যে। যাত্রাকালে স্বামীর মৃতদেহকে সম্বোধন করে তার বিলাপ একান্ত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে—

"জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।।
তুমি ত আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহরে তুমি গলার হার।।"

রসসৃষ্টিতে, বিশেষত করুণরসের বর্ণনায় নারায়ণ দেব ছিলেন অপ্রতিহত শিল্পী। সনকা চরিত্র করুণরসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "মনসামঙ্গল করুণরসের আকর। এই করুণরসের স্বাভাবিক বর্ণনায় নারায়ণ দেবের সমকক্ষ বড়ো কেহ নাই।" বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ ও কৌতুকরস সৃষ্টিতেও কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

বিপ্রদাস পিপলাই : ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের পুথিটি প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যটি 'মনসাবিজয়' নামে সমধিক পরিচিত। কাব্যরচনাকাল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন,

"সিন্ধু ইন্দু বেদ শক পরিমাণ
নৃপতি হোসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।"

সন-তারিখের হিসেবে যা, ১৪৯৪ খ্রি. (১৪১৭ শক), বাংলায় তখন হোসেন শাহের রাজত্বকাল। চব্বিশ পরগণা জেলার নাদুড়্যা গ্রামে কবি জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা সম্পর্কে হুগলি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, ইছাপুর, খড়দহ, রিষড়া, কোন্নগর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি আধুনিক স্থানের নামোল্লেখ আছে। এছাড়াও এই কাব্যের ভাষারীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; যা ভারতচন্দ্র ও ঘনরামকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এইকারণে এই কাব্যের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন।

৫.৬.২ ষোড়শ শতাব্দীর কবি

দ্বিজ বংশীদাস : চৈতন্য-পরবর্তীকালে মনসামঙ্গল কাব্যের কবি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন দ্বিজ বংশীদাস। কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোকে তিনি জানিয়েছিলেন—

"জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রাঢ়ে দ্বিজবংশী পুরাণ পদ্মার।।"

অর্থাৎ ১৫৭৫ সালে তিনি তাঁর কাব্যটি রচনা করেছিলেন। তাঁর পদ্মাপুরাণ কাব্যটি আকারে বৃহৎ। তাঁর কাব্যে চাঁদ শৈব নয়, শাক্ত। সে দেবী চণ্ডীর ভক্ত। চণ্ডীর আদেশেই চাঁদের সঙ্গে শিবের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

৫.৬.৩ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ : সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের আর এক জনপ্রিয় কবি ছিলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেতকাদাস কবির নাম নয়, সম্ভবত উপাধি। মনসার অপর নাম কেতকা—"কেয়া পাতে জন্মাইল কেতকাসুন্দরী"। তাই কবির উপাধি 'কেতকাদাস'। ক্ষেমানন্দ কবির প্রকৃত নাম। সেইকারণে কাব্যটি 'ক্ষেমানন্দী' নামেও পরিচিত ছিল।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে কবি ইতিহাস এবং ভূগোলের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয় দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পথঘাট, নদ-নদী এবং বহু জনপদের নিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। কলার মান্দাসে চড়ে স্বর্গের পথে বেহুলার ভেসে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে দামোদর ও তার শাখানদীগুলির নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এছাড়াও চরিত্রসৃষ্টি এবং হাস্যরস ও কৌতুকরস সৃষ্টিতেও তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল : মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যান্য অপ্রধান কবি হিসেবে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষালের নাম পাওয়া যায়। কাব্য দুটি পরস্পরের পরিপূরক। তন্ত্রবিভূতির সংক্ষিপ্ত অংশগুলি বিস্তৃতভাবে জগজ্জীবনের কাব্যে পাওয়া যায়। তবে তন্ত্রবিভূতির কাব্যে আদিরসের প্রকাশ আছে। যদিও তিনি সংযতভাবে ও সংহত ভাষায় সেই অংশগুলি বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, বিষ্ণু পাল, ষষ্ঠীবর দত্ত প্রমুখ কবি মনসামঙ্গল রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়াও পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের বেশ কিছু সংকলন গ্রন্থের প্রচার ছিল। এগুলির

মধ্যে ছয়জন কবি সংকলিত ষট কবির মনসামঙ্গাল এবং বাইশজন কবি সংকলিত 'বাইশা'-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫.৭ প্রাক-চৈতন্য ও উত্তর-চৈতন্যপর্বের মনসামঙ্গাল কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা

ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রেম-ভক্তিবাদের আলোয় স্নাত হয়ে উঠেছিল ষোড়শ শতকের সমাজ ও সাহিত্য। মহাপ্রভুর ভক্তিধর্মের প্রভাবে বৈষ্ণব রসসাহিত্যের মতো মঙ্গালকাব্যও প্রভাবিত হয়েছিল। প্রাক্-চৈতন্য পর্বের বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেবের বর্ণনায় চরিত্রগুলির মধ্যে আদিমতা, হিংস্রতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল। তাঁদের কাব্যে চণ্ডী ও মনসার কুৎসিত কলহ ও বিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা হয়ে উঠেছিল রূঢ়, অশালীন। সেখানে শিবের কামনা-বাসনার অনাবৃত চেহারা প্রকাশিত হয়েছে। শিবের সম্পর্কে চণ্ডীর রূঢ়, রুক্ষ কথাবার্তা—

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সৈতে পারি।
নিজের ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চরে বেড়ায় দুই বলদে তারে খাউক বাঘে।।"

মনসার পূজাপ্রাপ্তির লোলুপতায় তার দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চাঁদ সদাগরের আচরণেও রুক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। বিপ্রদাসের চাঁদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বিনা প্ররোচনায় মনসার মন্দির লুঠ করেছিল। পূর্ববঙ্গো রচিত মনসামঙ্গাল কাব্যে দেব-দেবীর অভিশাপ দানের প্রসঙ্গা বর্ণিত হয়েছে। মনসা নিজেকে গোদাকে অভিশাপ দিয়েছে। কেতকাদাসের কাব্যে বেহুলা গোদাকে অভিশাপ দিয়েছে। চৈতন্য পরবর্তীকালে দেবচরিত্রের রূঢ়, রুক্ষ আচরণ অনেকাংশেই লোপ পেয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বেহুলার চরিত্রে নারীসুলভ কমনীয়তা ও প্রেমপিপাসা সঞ্চার করেছেন। নারীর সতীত্বধর্মকে তিনি উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের লেখাতেও বেহুলার সতীত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে। তিনি মনসার দাসীমাত্র।

উদাহরণে দেখি, আসন্নযৌবনা বেহুলার মুক্তসার নদীতে স্নানযাত্রার দৃশ্যটি অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিজয় গুপ্ত; স্নানার্থে গমনরতা বেহুলার যাত্রাপথ, সঙ্গীসাথী ও বেহুলার রূপের বর্ণনা তিনি করেছেন। অন্যদিকে বিপ্রদাস কেবল বেহুলার রূপের বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, অন্যদিকে ক্ষেমানন্দ কেবলমাত্র স্নানের উল্লেখ করে মনসার অভিশাপ বর্ণনা করেছেন। যদিও সে অভিশাপে রূঢ়তা কম। ফলে বিজয় গুপ্তের কাব্যে যেভাবে বেহুলার যৌবনের রূপ-সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে কেতকাদাসে বা বিপ্রদাসে তা পাওয়া যায় না।

চৈতন্যোত্তর যুগে দেববন্দনাও অসাম্প্রদায়িক। কোনো কোনো কাব্যে চৈতন্যবন্দনাও করা হয়েছে। চণ্ডী, মনসা চরিত্রের রুক্ষতা এই পর্বে অনেকটাই ম্লান। উপকাহিনিগুলি পালারূপে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের ভাষা-শিল্প এই পর্বে চূড়ান্ত সুষমা লাভ করেছে।

৫.৮ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

স্ত্রী-দেবতা হিসেবে বাংলা দেশে মনসার পাশাপাশি চণ্ডীপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনেকেই মনে করেন, 'চণ্ডী' শব্দটি একটি অনার্য দ্রাবিড় শব্দ। ছোটনাগপুর সন্নিকটস্থ ওঁরাও প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে শিকারের দেবী হিসেবেই চণ্ডী পূজার প্রচলন দেখা যায়। হিন্দুর প্রাচীন পুরাণে এই দেবীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য সমকালীন পর্বে শিবজায়া দেবী চণ্ডীর বা দুর্গার সঙ্গে এই দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই দেবী সিংহবাহিনী নয়, ইনি শবর বা ব্যাধ জাতির পূজিতা অষ্টভুজা অথবা বণিকজাতি পূজিতা চতুর্ভুজা কমলেকামিনী মূর্তিতেই পরিচিতি পেয়ে এসেছে। প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের বর্ণনায় 'অভয়া' নামে উল্লিখিত এই দেবী আদিতে পুরাণে বর্ণিত দেবী মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ছিলেন না। অভয়া মুখ্যত বনদেবী যা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অরণ্যানী স্তবের সাথে সম্পৃক্ত। চণ্ডীমঙ্গালের কালকেতু-আখ্যানে তিনি দ্বিভূজা, তাঁর প্রতীক মঙ্গালঘট, পূজার উপচার মাঙ্গাল্য ধানদূর্বা। তিনি পশুমাতারূপে পূজিতা। চণ্ডীমঙ্গাল রচনার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই তিনি পৌরাণিক চণ্ডীর সঙ্গে মিলে গিয়েছেন। এই দেবীর কাহিনি নিয়ে রচিত কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গাল' কাব্য নামে পরিচিত। কাব্যটি 'অভয়ামঙ্গাল', 'অম্বিকামঙ্গাল' প্রভৃতি বহু নামেও সমাদৃত ছিল।

৫.৯ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য দেবখণ্ড ও নরখণ্ড—এই দুইভাগে বিন্যস্ত ছিল। নরখণ্ড অংশটি আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ডে বিন্যস্ত। আখেটিক খণ্ডে আছে কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি, বণিক খণ্ডে রয়েছে ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনি।

আখেটিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর কৃপায় দরিদ্র কালকেতুর ধনী হবার কাহিনি বলা হয়েছে। কালকেতুর দৈনন্দিন জীবন, শিকার-ভোজন-বিবাহের বর্ণনা, পশুহত্যায় তাঁর নিপুণতা ও সাফল্য, চণ্ডীর আশ্রয়ে পশুদের আত্মরক্ষার চেষ্টা, গোধিকার ছদ্মবেশে চণ্ডীর কালকেতুকে ছলনা এবং অবশেষে তাকে প্রভূত ধনদানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। দেবীর ধনসম্পদ নিয়ে কালকেতু বন কেটে নগর প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ভাঁড়ুদত্তের চক্রান্তে কলিঙ্গারাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতুর পরাজয় ও দেবী চণ্ডীর কৃপায় তার মুক্তিলাভ এবং কালকেতু কর্তৃক দেবী চণ্ডীর পূজাপ্রচারের মধ্যে দিয়ে কাব্যের কাহিনি পরিসমাপ্ত হয়েছে।

বণিকখণ্ড মূলত ধনপতি ও খুল্লনার কাহিনি। উজানি নগরের ধনাঢ্য বণিক ধনপতি। ঘরে স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও ধনপতি খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। এরপর শুরু হয় দুই স্ত্রী-র মধ্যে কলহ। কাহিনির মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। উপাখ্যানে দেখানো হয়েছে লহনা অপগত যৌবন এবং সন্তানহীনা। ধনপতি-লহনা-খুল্লনার কাহিনিটি পারিবারিক রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। দাসী দুবলার কুপরামর্শে লহনা খুলনার সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে থাকে। জঙ্গালে চণ্ডীপূজা করে নবীন যুবতী খুল্লনা সন্তানবতী হয়, দেবীর স্বপ্নাদেশে লহনা তার সঙ্গে সুব্যবহার করতে থাকে। এর পরের অংশে সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে

ধনপতি যখন সিংহল যাত্রা করে তখন চণ্ডীর কোপে তা ডুবে যায়। সিংহলের পথে কালীদহে পৌঁছে ধনপতি কমলেকামিনীর অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পায়। পরবর্তীতে এই দৃশ্য সিংহলরাজকে দেখাতে না পারার কারণে ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অভিশপ্ত গান্ধর্ব মালাধর শ্রীমন্ত নামে খুল্লনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করে ও পিতাকে উদ্ধার করে।

৫.১০ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি-পরিচিতি

- **৫.১০.১ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি**

মানিক দত্ত : মানিক দত্তই সর্বপ্রথম চণ্ডীমঙ্গালের গীত রচনা করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে একাধিকবার মানিক দত্তকে আদি কবি বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

'মানিকদত্তরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।'

মানিক দত্তের দুটি পুথি মালদহ অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। বোঝা যায়, কবি মালদহের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যে বৌদ্ধ প্রভাব আছে। যদিও এই কাব্যের কাল পরিচয় নিয়ে কিছু সন্দেহ রয়ে গেছে। ভাষা বৈশিষ্ট্য দেখে কবিকে প্রাচীন বলা যায় না। গ্রন্থে 'হার্মাদ' শব্দের প্রয়োগ আছে। এতে মনে হয় পরবর্তীতে এই কাব্যে অনেক প্রক্ষেপ ঘটেছে। চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচরদের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন কবি।

দ্বিজমাধব : ষোড়শ শতকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী জনপ্রিয় কবি ছিলেন দ্বিজমাধব। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাঁর কাব্য বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কাব্যের নাম 'সারদাচরিত'। কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোকে তিনি লিখে গেছেন,

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজমাধব গায় সারদাচরিত।।"

অর্থাৎ কাব্যটি ১৫০১ শক বা ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কাব্যটি বাস্তব গুণে সমৃদ্ধ ছিল। কালকেতুর বীরত্ব, ভাঁড়ুদত্তের ভাঁড়ামি, মুরারি শীলের প্রবঞ্চনা, ফুল্লরা-খুল্লনার নারীধর্ম তাঁর কাব্যে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। সহজ, সাবলীল ভাষায় অনাড়ম্বর ছন্দে প্রত্যক্ষগোচর চরিত্রগুলিকে তিনি মূর্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : গোটা মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যধারার অপ্রতিহত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁর আত্মজীবনীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের কালজ্ঞাপক পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন,

"শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।।"

অর্থাৎ ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ। বর্ধমান জেলার রত্না নদীর তীরে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে কবির সাতপুরুষের বসবাস ছিল। কবির পিতা হৃদয় মিশ্র এবং মাতার নাম দৈবকী। কাব্যরচনা প্রসঙ্গো তিনি

জানিয়েছেন,

"মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।"

সেইসময় চাষবাসই ছিল কবিদের প্রধান উপজীবিকা। কবির পরিবার দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে নেমে এল দারুণ রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক সংকট; সমকালের সংকট মুকুন্দরামের রচনায় স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন মুকুন্দরাম।

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণু পদাম্বুজভৃঙ্গা
গৌড়বঙ্গা উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।"

বিধর্মী শাসকের অত্যাচারে কবির জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র, ভাই ও সঙ্গো এক অনুচরকে নিয়ে কবি পথে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি মেদিনীপুরে ব্রাহ্মণভূমির জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে এবং রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে কাব্যটি রচনা করেন। রঘুনাথ রায় তাঁকে কবিকঙ্কণ উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কাব্য 'অম্বিকামঙ্গল', 'অভয়ামঙ্গাল' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। শ্রেণিচরিত্র চিত্রণে মুকুন্দরামের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর ভাঁড়ুদত্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি।" দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সমাজজীবনের নিপুণ চিত্রাঙ্কনে মুকুন্দরাম পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ফুল্লরার বারমাস্যা রচনায় তিনি স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। কাহিনির বিভিন্ন অংশে মুকুন্দরামের নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্রচিত্রণ ক্ষমতা তাঁর কাব্যকে উপন্যাসোচিত মর্যাদা দান করেছে।

- **৫.১০.২ চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের অপ্রধান কবি :** সপ্তদশ শতাব্দীতে স্বল্প কিছু চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে দ্বিজ রামদেবের 'সারদাচরিত' কাব্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শতাব্দীর শেষভাগে চণ্ডীমঙ্গাল কাব্য রচনা করেন মুক্তারাম সেন, দ্বিজ জনার্দন, রামানন্দ যতি প্রমুখ।

৫.১১ ধর্মমঙ্গল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা নিয়ে রচিত হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। 'ধর্ম' শব্দটি অনার্য অস্ট্রিক 'দড়ম্' বা 'দরম্' শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই। এই দেবতা নিরাকার। ডোম জাতির লোকেরাই প্রধানত ধর্মপূজা করে থাকে। সাধারণত শালগ্রাম শিলা বা নির্জন গাছের তলায় পাথরের কোনো মূর্তিকে তারা পূজা করে থাকে। রাঢ়বঙ্গোর ইতিহাস ও জনজীবনের চেহারা এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। মঙ্গালকাব্যের প্রথাসিদ্ধ কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব।

রাঢ় জনজাতির শৌর্য ও বীর্যের পরিচয়, নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এই কাব্যে প্রতিভাত হয়েছে। ফলে কাব্যটি হয়ে উঠেছে বীররসাত্মক এবং যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কাব্যটিকে রাঢ়দেশের জাতীয় মহাকাব্য বা National Epic বলে চিহ্নিত করেছেন।

৫.১২ ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু

ধর্মমঙ্গল কাব্যে দুটি কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে— রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনি এবং বীর লাউসেনের কাহিনি। প্রথম কাহিনিতে অপুত্রক রাজা হরিশচন্দ্র ও রানি মদনা ধর্মঠাকুরের কৃপায় সন্তান লাভ করেন। তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়। পুত্রের নাম রাখা হয় লুইধর। এরপর একদিন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ধর্মঠাকুর লুইধরের মাংস আহারের অভিলাষ ব্যক্ত করলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা তা পালন করেন। তাদের অবিচলিত নিষ্ঠায় খুশি হয়ে ধর্মঠাকুর লুইধরের পুনর্জীবন দান করেন।

দ্বিতীয় কাহিনিতে নায়ক লাউসেনের জন্ম থেকে স্বর্গগমন পর্যন্ত কাহিনি চব্বিশটি সর্গ বা বারোটি পালায় বিভক্ত। মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য শাপভ্রষ্ট দেবনর্তকী জাম্ববতীকে মর্ত্যে পাঠানো হয়। তার নাম হয় রঞ্জাবতী। তার বড়ো বোন ছিলেন গৌড়রাজের পত্নী, ভাই মহামদ প্রধান অমাত্য। ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন ছিলেন গৌড়েশ্বরের অধীনে এক সামন্ত রাজা। ঢেকুরগড়ের বিদ্রোহী সামন্ত রাজা ইছাই ঘোষকে দমন করতে গিয়ে তার ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হলেন। ইছাই ঘোষ ছিল চণ্ডীর বরপুত্র, মহাশক্তিশালী। গৌড়েশ্বর তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিয়ে দেন। অমত থাকায় মহামদ নানাভাবে তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। বহুদিন পর ধর্মঠাকুরের কৃপায় কর্ণসেন এক পুত্রসন্তান লাভ করেন এবং তার নাম হয় লাউসেন। কালক্রমে বীর যোদ্ধা লাউসেনও মাতুল মহামদের কোপদৃষ্টিতে পড়ে। তার ষড়যন্ত্রে বন্দি লাউসেন গৌড়েশ্বরের কাছে নিজ বাহুবলের পারদর্শিতা দেখিয়ে কারামুক্তি লাভ করে। ময়নাগড়ে কালু ডোম ও তার স্ত্রী লখাই-এর বন্ধুত্ব লাভ হয়।

ক্রূরমতি মহামদের পরামর্শে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। সেখানেও রাজাকে পরাভূত করে সে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করে গৌড়ে সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর ঢেকুররাজ ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য লাউসেনকে পাঠান হয়। ধর্মের আশীর্বাদে লাউসেন বিজয়ী হলেন। পরিশেষে মহামদ গৌড়েশ্বর আদেশ দিলেন লাউসেনকে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখাতে হবে, না পারলে মৃত্যুদণ্ড হবে। ধর্মের কৃপায় লাউসেন সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখালেন। মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলে তাকে প্রতিহত করতে প্রাণ দেন কালু ডোম, ডোমনী লখাই ও প্রথম রানি কলিঙ্গা। এরপর লাউসেন দেশে ফিরে ধর্মের স্তব করতে লাগলেন। ধর্মের অনুগ্রহে সকলে প্রাণ ফিরে পায় এবং ধর্মের কোপে মহামদের কুষ্ঠ হয়। লাউসেনের দয়ায় তার কুষ্ঠ সারে। সুখে-শান্তিতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে সপরিবারে লাউসেন স্বর্গে ফিরে যায়।

৫.১৩ রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গাল

ধর্মমঙ্গালকে যদিও দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য বলা হয়ে থাকে এবং দেবতার পূজা প্রচারের পর এই কাব্যের কাহিনির পরিসমাপ্তি হয়েছে; তথাপি এই কাব্যের ঘটনা ও কাহিনি বিশ্লেষণ করলে সেখানে মহাকাব্যের কাঠামো উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত এই কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গোর রাঢ় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মনসা বা চণ্ডীর মতো গোটা বাংলা দেশে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উপরন্তু ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট কোনো মূর্তি নেই, তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীর থেকে ছোটোনাগপুরের অরণ্যভূমি পর্যন্ত ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচার লক্ষ করা যায়। ডোম, চণ্ডাল, জেলে, হাঁড়ি, শুঁড়ি, কামার, চামার, ধোপা প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় জনজাতির বাসস্থান ছিল এই অঞ্চল। তাদের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির নিগূঢ় পরিচয় কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। রাঢ় অঞ্চলের বাইরে এইকাব্যের সীমা প্রসার লাভ করতে পারেনি। এছাড়াও রাঢ় অঞ্চলের নদ-নদী, ভৌগোলিক স্থান, রাঢ় জনজাতির জীবনচর্যা এই কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে। রাঢ়ের লালমাটির রুক্ষতা, কাঠিন্য এখানে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়।

রাঢ় জনজাতির প্রধান পরিচয় তাদের বীরত্ব। চরিত্রগুলি তাদের বীরধর্মের স্বাতন্ত্র্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এছাড়া এই কাব্যে কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণতা ফুটে ওঠেনি। রাঢ়ের জনজাতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান এই পূজায় অল্পবিস্তর গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য মঙ্গালকাব্যের মতো ধর্মমঙ্গালের উদ্দেশ্য পূজাপ্রচার হলেও এতে ঘটনা-সংঘাত, বিচিত্র চরিত্রের ভীড়, শাখাকাহিনির প্রাচুর্য, অধিকাংশ চরিত্রের পূর্বজীবনের পৌরাণিক আখ্যান, ইন্দ্রিয়বিলাস, মিথ্যা ও অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় আর কোনো মঙ্গালকাব্যে নেই। রাঢ় জনজাতির দ্বারা পূজিত হওয়ায় আর্যেতর সংস্কৃতির লক্ষণগুলিই এই পূজার সঙ্গো ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। আর্যসংস্কৃতির পরিচিতি এই কাব্যে তেমন ফুটে ওঠেনি। রাঢ় বাংলার চৌহদ্দির মধ্যেই চরিত্রগুলির বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। তাদের জোরজুলুম, বিশ্বাসঘাতকতা, আনুগত্য, সংস্কার, কূটনীতি ইত্যাদি রাঢ় অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির জীবনচর্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই এই কাব্যকে রাঢ়ের 'জাতীয় কাব্য' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.১৪ ধর্মমঙ্গাল কাব্যের কবি-পরিচিতি

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। অন্যান্য কবিদের মধ্যে শ্যাম পণ্ডিত, ধর্মদাস, রামদাস আদক, সীতারাম দাস, যাদুনাথ বা যাদবনাথ পণ্ডিত, খেলারাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলির নাম উল্লেখ করা যায়। কবিরা ছিলেন মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দীর।

ধর্মমঙ্গাল কাব্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি রূপরাম চক্রবর্তী। তিনি আনুমানিক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি 'অনাদিমঙ্গাল' নামে পরিচিত। ড. সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গাল কাব্যের আদিকবি রূপে স্বীকৃত। বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। প্রকাশভঙ্গীর সরলতা ও সরসতা এই কাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যের চরিত্র চিত্রণ দক্ষতা প্রশংসনীয়। অত্যন্ত বাস্তবোপযোগী করে তিনি চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বাধিক প্রচারিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। কলকাতার বঙ্গাবাসী কার্যালয় থেকে তাঁর কাব্যটি প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্যলাভ করে। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁর কবিপ্রতিভা ছিল অসাধারণ। যেকারণে তাঁর শিক্ষাগুরু তাঁকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের অপরূপ সমাবেশ ঘটেছে ঘনরামের কাব্যে।

উল্লিখিত প্রধান প্রধান মঙ্গাল কাব্যধারার বাইরেও বেশ কিছু অপ্রধান মঙ্গালকাব্য রচিত হয়েছিল। যেমন, চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে ষোড়শ শতকে রচিত জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গাল, আঠারো শতকে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত সূর্যমঙ্গাল, গঙ্গামঙ্গাল, শীতলামঙ্গাল, লক্ষ্মীমঙ্গাল, ষষ্ঠীমঙ্গাল, সরস্বতীমঙ্গাল, রায়মঙ্গাল, কালিকামঙ্গাল, সারদামঙ্গাল ইত্যাদি। এগুলিতে সমসাময়িক সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন-জীবিকা ইত্যাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

৫.১৫ অন্নদামঙ্গাল কাব্য: প্রারম্ভিক পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজজীবনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতার সূচনা ঘটেছিল। এইসময় বাংলায় সুবাদার ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নির্মম পন্থা অবলম্বন করতেন। অতিরিক্ত করভার বৃদ্ধি করে জমিদার থেকে প্রজাসাধারণ— সকলের জীবন তিনি দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন। রাজকর আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কড়াকড়ির ফলে অর্ধাহার, অনাহার হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের জীবনসঙ্গী। খাজনা দিতে না পারায় প্রজাদের সম্পত্তি ক্রমশ নিলামে উঠছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ-র পর সুজাউদ্দিন, সরফরাজ, নবাব আলিবর্দী খাঁ বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠেছিলেন। অনাদায়ী প্রজাদের জীবন কয়েদ-বন্ধন-অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিপন্নতা ও প্রতিবন্ধকতার মাঝে ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গাল কাব্য'। ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাংলায় দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলন করেন। তিনিই ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন এবং দেবীর মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটি কাব্য রচনার অনুরোধ করেন। তিনি 'যুগসন্ধি'র কবিরূপে খ্যাত হয়েছিলেন।

৫.১৬ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনকথা

অষ্টাদশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। হুগলি জেলার ভুরশুট পরগনার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে তিনি এক প্রসিদ্ধ জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নরেন্দ্র রায়। পৈতৃক সম্পত্তি বর্ধমান রাজার চক্রান্তে বেদখল হয়ে গেলে কবি মাতুলালয়ে লালিত হন। সেখানেই তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে নিজের মনোনীত কন্যাকে বিবাহ করে তিনি সকলের বিরাগভাজন হন। হীন চক্রান্তে পড়ে বর্ধমান রাজের নির্দেশে কারারুদ্ধ হন কবি। পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সভাকবির পদ অলংকৃত করেন (১৭৪৬) এবং 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজা তাঁকে চল্লিশ টাকা বেতন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। বসতবাটির জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মূলাজোড় গ্রামটি ইজারা দেন। তাঁর আদেশে ভারতচন্দ্র ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনা প্রণালীতে অন্নদামঙ্গল রচনা করতে শুরু করেন।

ভারতচন্দ্র রায়ের প্রথম রচনা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালি'। 'অন্নদামঙ্গল' কবির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর একটি অনুবাদ কাব্য হচ্ছে 'রসমঞ্জরী'। এটি মিথিলার ভানু দত্তের একটি কাব্যের অনুবাদ। ভারতচন্দ্রের দুটি দীর্ঘ কবিতা রয়েছে, 'গঙ্গাষ্টক' ও 'নাগাষ্টক'। 'গঙ্গাষ্টক' একটি সংস্কৃতপ্রধান কাব্য। অপরদিকে, 'নাগাষ্টক' কাব্যটি রচিত হয়েছে মহারাজার ইজারাদার রামদেবের প্রশস্তি গেয়ে। এতে সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ আছে। তাঁর রচনায় মুগ্ধ হয়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতচন্দ্রকে বলেছেন

"The father of a very ville school of poetry though himself a man of element genius."

৫.১৭ অন্নদামঙ্গল কাব্য : বিষয়বস্তু

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে ভারতচন্দ্র রচনা করেন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তিনটি অংশ (i) অন্নদামাহাত্ম্য (অন্নদামঙ্গল) (ii) বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল) (iii) মানসিংহ (অন্নপূর্ণামঙ্গল)।

(i) অন্নদামাহাত্ম্য (অন্নদামঙ্গল) : আলিবর্দী খাঁ-র আক্রমণে বাংলাদেশ যখন বিপর্যস্ত সেইসময় অলোচ্য কাব্যের সূচনা। নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে কয়েদ করলে বিপন্ন রাজা দেবী অন্নপূর্ণাকে বন্দনা করেন। পৌরাণিক আখ্যান অনুসরণে (কাশীখণ্ড) সতীপ্রসঙ্গ, হর-পার্বতী বিবাহ এবং তাদের গার্হস্থ্যজীবন বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থে বর্ণিত হরিহোড় এবং ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনি কবির স্বকপোলকল্পিত।

(ii) বিদ্যাসুন্দর (কালিকামঙ্গল) : বর্ধমানরাজ বীরসিংহের রূপসী ও বিদুষীকন্যা বিদ্যার সঙ্গে কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর সুযোগ্য পুত্র সুন্দরের গোপন মিলনই এই খণ্ডের প্রধান আখ্যানবস্তু। দেবী কালিকার কৃপায় গোপন সুড়ঙ্গপথে সুন্দর রাজকন্যা বিদ্যার শয়নগৃহে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অবৈধ প্রেমের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে কবি রুচির সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তবে প্রমথ চৌধুরী এর মধ্যেও আর্টের প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। বিদ্যা ও সুন্দরের এই রুচিবিগর্হিত প্রণয় কাহিনি কানুনগো ভবানন্দ মজুমদারের মুখ থেকে শুনেছেন মোগল সেনাপতি মানসিংহ। বিদ্যাসুন্দরের সুর মূলত গীতিরস প্রধান।

(iii) মানসিংহ (অন্নপূর্ণামঙ্গল) : গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড অন্নপূর্ণামঙ্গল। প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে মানসিংহ বাংলায় এলে ভবানন্দ কানুনগো নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর সাহায্য নিয়ে মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করেছেন। ঝড়বৃষ্টিতে দুর্গত মোগল-রাজপুত বাহিনীকে ভবানন্দ দেবী অন্নদার কৃপায় অন্নদান করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য দমনের পর মানসিংহ দিল্লী গিয়ে জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎলাভ ও খেতাব গ্রহণ করেন।

পরিশেষে, জাহাঙ্গীর অন্নপূর্ণার ভক্ত হয়েছেন। কাব্যের তৃতীয় খণ্ডেই কাব্যের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়। শ্লোকটি হল—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।।"

অর্থাৎ কাব্যটির রচনাকাল ১৬৭৪ শক বা ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দ। বলাবাহুল্য, কাব্যটিকে কবি সেইসময়ের 'নতুন মঙ্গাল' কাব্য রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর যাবতীয় কবিখ্যাতির অন্যতম কারণ হল এই 'অন্নদামঙ্গাল কাব্য'। এতে তিনি লিখেছেন—

"নতুন মঙ্গাল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।"

তাঁর সমসাময়িক বা তাঁর পূর্বের কবিরা যেখানে কাব্যরচনার কারণ হিসাবে দেব-দেবীর আদেশ বা স্বপ্নাদেশকে দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্র সেখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশকে কাব্যরচনার প্রধান কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন।

৫.১৮ অন্নদামঙ্গাল কাব্যের বৈশিষ্ট্য

দেব-দেবী চরিত্রের মানবায়ণ এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিব, অন্নপূর্ণা ও ব্যাসদেবকে মর্ত্যজীবনের জলহাওয়ার উপযোগী করে সাধারণ মানুষের ব্যঞ্জনাদান করা হয়েছে। হর-গৌরীর বিবাহে, শাশুড়ি ও এয়োগণের বিড়ম্বনা বর্ণনায় কৌতুকরসের উৎসার ঘটেছে। বৃদ্ধপতি শিবকে দেখে উমার মন্তব্য—

"তামার শলা বুড়ার জটা উমার কেশ চামর ছটা
তায় বেড়িয়া খোঁপায় ফণী দেহে আসে জ্বর লো।
উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।।"

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, ভারতচন্দ্র দেবাদিদেব শিবকে নিতান্ত বেদিয়ার মতো করে চিত্রিত করেছেন। চরিত্রের মানবায়ণ ভারতচন্দ্রের কাব্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাছে যেমন সাধারণ মানুষের জীবনরসের সন্ধান (হরিহোড়, ঈশ্বরী পাটনী, দাসু-বাসু) পাওয়া যায় তেমনি পৌরাণিক চরিত্রগুলিরও নব নব রূপায়ণ এই কাব্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে। দেব-দেবীকে তিনি একান্ত ঘরোয়া ভাবে রূপদান করেছেন। শিব, অন্নপূর্ণা, ব্যাসদেব চরিত্রে পৌরাণিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়েছে। মানবশিশুরা পর্যন্ত তাকে নিয়ে রঙ্গাব্যঙ্গা শুরু করেছে।

"কেহ বলে, ওই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।"

বৃদ্ধ শিবকে দেখে শাশুড়ি ও এয়োগণের বর্ণনায় কৌতুকরসের প্রকাশ ঘটেছে।

সেইসময় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলার দরুণ সাধারণ মানুষের ঘরে খাদ্যের অভাব প্রকট হয়ে পড়েছিল। অভাব, দুর্বিপাকের মাঝে ঈশ্বরী পাটনীর মতো ছা-পোষা মানুষেরা নিজ নিজ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তায় রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। যা প্রকাশ পায় পাটনীর বয়ানে—

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।"

ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত কবির ব্যক্তিমনের প্রতিফলন এই কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। তাই সমকালীন দুর্বিষহ দারিদ্র্যের চিত্র এই কাব্যের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে।

কাব্যের ছন্দোনির্মাণে কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সেইকারণে পয়ার-ত্রিপদী ছন্দের গতানুগতিক অনুবর্তনে কাব্যকে তিনি আবিল করে তোলেননি। বিভিন্ন ধরনের ছন্দ যেমন— ভুজঙ্গপ্রয়াত, তূণক, তোটক ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ছন্দের অনুসরণ ঘটিয়ে কাব্যকে আঙ্গিকের দিক থেকে বিচিত্র মূর্তিদান করেছেন। এই বিষয়ে তাঁকে ছন্দশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে। তাঁর ছন্দসৃষ্টির নমুনা

সংস্কৃত :

ভুজঙ্গপ্রয়াত— "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভস্তম ভভস্তম শিঙ্গা ঘোর বাজে।।"

তূণক— "ভূতনাথ ভূতনাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষরক্ষ লক্ষলক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।।"

বাংলা :

পয়ার— "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।।"

ত্রিপদী— "কহ মানসিংহ রায় গিয়াছিলা বাঙ্গালায়
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ কহ তার বিবরণ
না জানি পাইলা কত ক্লেশ।।"

লেখক কাব্যের বহিরঙ্গ সজ্জার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "তিনি কাব্যের বহিরঙ্গ শোভার দিকে এত বেশি মনোযোগ দিতেন যে ভাবের সূক্ষ্মতা ও আবেগের গভীরতার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। দেব-দেবীর চিত্রাঙ্কনে তিনি সুলভ কৌতুকরস ও আলংকারিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই।" এভাবেই মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি বা ঐতিহ্যের মধ্যে

দাঁড়িয়েও কবি ভারতচন্দ্র কাব্য পরিকল্পনায়, কাব্য কাঠামো নির্মাণে যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন সেইকারণে তাঁকে অনায়াসে 'যুগসন্ধিক্ষণের কবি' অভিধায় ভূষিত করা যায়।

৫.১৯ অন্নদামঙ্গাল কাব্যের চরিত্রচিত্রণ

ঈশ্বরী পাটনী : মঙ্গালকাব্যধারায় সমগ্র মধ্যযুগে এক অদ্বিতীয় চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী। গ্রামীণ সরলতার সে এক অপরূপ প্রতিমূর্তি। কাঠের সেঁউতি দেবী অন্নপূর্ণার পাদস্পর্শে সোনায় রূপান্তরিত হলে বিস্মিত পাটনীর সন্দেহ, "এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।" খুব স্বাভাবিক কারণে, নৌকা থেকে নেমে সে দেবীকে অনুসরণ করেছে। তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দেবী তাকে আসল পরিচয় দান করেন। তার ভক্তিবিনম্র ভাব, হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা শুনে দেবী মুগ্ধ হয়েছেন। এবং তাকে পছন্দমতো বরদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তাতে সরলা পাটনী চেয়ে নিয়েছে তার উত্তর প্রজন্মকে চিরসুখে রাখার আশীর্বাদ, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।" যা বাংলার নারী হৃদয়ের চিরন্তন কামনা-বাসনাকেই মূর্ত করে তোলে।

হরিহোড় : ইনি ছিলেন স্বর্গের দেবতা কুবেরের অনুচর। পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে অন্নপূর্ণা কর্তৃক শাপভ্রষ্ট হয়ে তিনি বড়গাছি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হরিহোড়ের জীবন ছিল দারিদ্র্যে পূর্ণ। জঙ্গাল থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে অতি কায়ক্লেশে তাঁর সংসার জীবন চলত। দেবী অন্নদার কৃপায় তার সংসারে সমৃদ্ধি নেমে আসে। পরে বৃদ্ধ বয়সে যুবতী স্ত্রী বিবাহ করে আনলে তার সংসারে শুরু হয় অশান্তির পর্ব। দেবী অন্নদা তাঁর বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে ভবানন্দ মজুমদারের বাড়ি চলে যান।

ব্যাসদেব : ব্যাসদেব কোনো মহাভারতীয় রূপকল্পে বিন্যস্ত উচ্চবর্গের চরিত্র নন, তিনি গোঁড়া বৈষ্ণব ধর্মাদর্শে পরিকল্পিত এক সংকীর্ণ গোষ্ঠী নেতা। কখনও অবশ্য তিনি গোঁড়া শৈব। কখনও তাঁর উপাস্য গঙ্গা আবার কখনও তাঁর উপাস্য অন্নদা; তিনি সুবিধাবাদী, আত্ম-অহংকারী চরিত্র। সুতরাং বলা যায়, পরিকল্পিত ব্যাসদেব চরিত্রটি যুগের শৈথিল্য, সংশয়, অস্থিরতার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ধর্মপ্রচারের থেকেও সে আত্মপ্রচারে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে বেশি।

দেবী অন্নদা : 'অন্নদামঙ্গাল' নামক কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী অন্নদা। কাহিনির তিনিই নিয়ন্তা, পূজাপ্রচারের জন্যই তাঁর মর্ত্যে আবির্ভাব। তবে তিনি দেবী মনসা বা দেবী চণ্ডীর আদর্শে পরিকল্পিতা নন। তাঁর স্বভাবধর্মে কপটতা বা বৈরীভাব নেই, তিনি বরদা, নিরন্নকে অন্নদানই তাঁর ব্রত। তিনি কৃপাপ্রার্থী। ঈশ্বরী পাটনীর মতো নিতান্ত দীনদরিদ্র পাটনী তাঁর দর্শনলাভে বঞ্চিতা হয় না। ব্যাসদেবের মুখেও তাঁর রূপগুণের প্রশস্তি শোনা যায়।

হীরা মালিনী : 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে রক্তমাংসে গড়া উজ্জ্বল চরিত্র হীরা মালিনী। সে কুট্টনী জাতীয় চরিত্র। সে কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'বণিকখণ্ড'-এর দুবলা দাসীর উত্তরসূরী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর হীরা মালিনীর পূর্বসূরী। তার 'চুড়াবান্ধা চুল', 'গালভরা গুয়াপান'। সে বালবিধবা কিন্তু রসিকা। রাজবাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত। মিছরির ছুরির মতোই তার কথাবার্তা অতি তীক্ষ্ণ। "কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম"।

ভারতচন্দ্র তার সম্পর্কে আরও লিখেছেন—

"আছিল বিস্তর ঠাঁট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে।।"

বৃদ্ধা বয়সেও তার সরস কথাবার্তা। সে সজীব, ধূর্ত। সুন্দরকে সাহায্য করার অপরাধে তাকে মাথা মুড়িয়ে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হলে চতুরা হীরা ঘুষ দিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। এছাড়াও 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' অংশে কৌতুকরস সৃষ্টি করেছে ভবানন্দের দুই স্ত্রী পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী এবং ভবানন্দের দু'জন অনুচর দাসু ও বাসু। প্রতিদিনের জীবন থেকে চরিত্রগুলি তুলে ধরেছেন ভারতচন্দ্র। কাহিনি বর্ণনায়, চরিত্র বিশ্লেষণে কবির কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। চরিত্র-চিত্রণ, বিষয়বিন্যাস, অলংকার পারিপাট্যে কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের কবি হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেছিল। তাই তিনি লিখেছিলেন, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গাল গান রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো— যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য্য"।

৫.২০ সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেল মনসা, চণ্ডী এবং দেবী অন্নদা তিনটি কাব্যেই নারী দেবতার প্রাধান্য। একমাত্র ধর্মমঙ্গাল কাব্য পুরুষ দেবতাকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। সময়ের ভিত্তিতে ধর্মমঙ্গাল ও অন্নদামঙ্গালের জনপ্রিয়তা মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতে। যদিও সপ্তদশ শতাব্দীতেও অনার্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মমঙ্গাল কাব্যের প্রচার ছিল। সমগ্র মঙ্গাল কাব্যধারার মধ্যে মনসামঙ্গাল প্রাচীনতম। অনার্য দ্রাবিড় সংস্কৃতি থেকে এর উদ্ভব। মনসা সর্পদেবী। বণিক চূড়ামণি শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের প্রবল বিরুদ্ধতা এবং পরিশেষে দেবতার কাছে পরাজয় স্বীকারের মধ্যে দিয়ে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি। মনসা, চাঁদ, বেহুলা এই কাব্যের প্রধান চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি কালকেতুর পূজা প্রচারের মধ্যে দিয়ে মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। চণ্ডী মূলত হিংস্র পশুদের দেবী। চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনিটি ধনপতি সওদাগরের কাহিনি। মনসামঙ্গালের চাঁদ সওদাগরের সমান্তরালে এই অংশে বিত্ত বান সমাজের দ্বারা দেবীর পূজা প্রচারিত হয়েছে। ধনপতি, লহনা, খুল্লনা—এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অন্নদামঙ্গালে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য। এই কাব্যে মনসা বা চণ্ডীর মতো দেবীর উগ্রতা বা কোপন স্বভাব প্রাধান্য পায়নি। বলাবাহুল্য, এই কাব্যের প্রতিনিধিত্ব করেছে মানুষ। ঈশ্বরী পাটনীর মতো চরিত্র চিরাচরিত বঙ্গামাতার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গাল কাব্যে লাউসেনের ওপর অনার্য দেবতা ধর্মঠাকুরের কৃপা বর্ষিত হয়েছে। কাব্যটি মূলত কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র লাউসেনের সংগ্রামী জীবনের ইতিকথা। এই কাব্যে দেব চরিত্রের আড়ালে রাঢ় জনজাতির ইতিহাস এবং তাদের আঞ্চলিক পরিচিতি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই এককে আমরা প্রধান চারটি মঙ্গালকাব্য, বিভিন্ন কালপর্বের মঙ্গালকাব্য রচয়িতা এবং কাহিনির স্বরূপ, সমকাল সম্পর্কে একটি ধারণা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

৫.২১ অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণগুলি লেখো।

২. মনসামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করে যেকোনো একজন কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

৩. মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উপন্যাসসুলভ কোন কোন লক্ষণ প্রতিভাত হয়।

৪. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অবলম্বনে কালকেতু চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

৫. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবির সমাজ-সচেতনতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো।

৬. ধর্মমঙ্গল কাব্যটিকে 'রাঢ়ের জাতীয় কাব্য' বলার যৌক্তিকতা বিচার করো।

৭. ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করো। প্রসঙ্গক্রমে যে-কোনো একজন কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

৮. ভারতচন্দ্রকে 'যুগ সন্ধিক্ষণের কবি' বলা হয় কেন লেখো।

৯. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

১০. অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবির শিল্পদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. মঙ্গলকাব্য বলতে কী বোঝায়?

২. মঙ্গলকাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির নাম উল্লেখ করো।

৪. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকটি লেখো।

৫. সপ্তদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কবির নাম লেখো।

৬. 'বাইশা' বলতে কী বোঝায়?

৭. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়টি অংশ ও কী কী?

৮. ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'নতুন মঙ্গল' বলা হয় কেন?

৯. হীরা মালিনীর পরিচয় দাও।

১০. ধর্মমঙ্গল কাব্যের দু'জন নারী চরিত্রের নাম লেখো।

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদিকবির নাম লেখো।

২. অষ্টমঙ্গালা বলতে কী বোঝ?

৩. বিজয় গুপ্তের কাব্য কী নামে পরিচিত?

৪. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদিকবি কে ছিলেন?

৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়টি খণ্ড?

৬. ভারতচন্দ্র কোন্ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন?

৭. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবির নাম কী?

৮. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রসিদ্ধ বণিকের নাম লেখো।

৯. কলিঙ্গা কোন্ কাব্যের চরিত্র?

১০. কোন্ কাব্যকে 'নতুন মঙ্গল' কাব্য বলা হয়?

৫.২২ গ্রন্থপঞ্জি

১. অরবিন্দ পোদ্দার, '*মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*', ইন্ডিয়ানা লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫২।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, '*বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*', এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লি., ২০০৬।

৪. ক্ষুদিরাম দাস, '*কবিকঙ্কণ চণ্ডী*', দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৭।

৫. ক্ষেত্র গুপ্ত, '*বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*', গ্রন্থনিলয়, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ২০২২।

৬. গোপাল হালদার, '*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*', ১ম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লি., ১৩৬৭।

৭. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, '*অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র*', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

৮. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, '*সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়*', প্রাচীন ও মধ্যযুগ, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, ১৯৮৭।

৯. ভূদেব চৌধুরী, '*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*', প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪।

১০. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, '*কবি ভারতচন্দ্র*', দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।

১১. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫।

১২. সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, '*কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল*', মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৯৭৫।

একক ৬ ❑ অনুবাদ সাহিত্যের ধারা (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ

৬.৪ রামায়ণ: কথামুখ

৬.৫ কৃত্তিবাস ওঝা: কবিকথা

৬.৬ আত্মপরিচয় বিতর্ক ও 'কৃত্তিবাস' সমস্যা

৬.৭ কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈশিষ্ট্য

৬.৭.১ বাঙালিয়ানা

৬.৭.২ শৈলীগত বৈশিষ্ট্য

৬.৮ রসবিচার

৬.৮.১ করুণরস

৬.৮.২ হাস্যরস

৬.৮.৩ ভক্তিরস

৬.৯ কৃত্তিবাসী রামায়ণ : বাল্মীকি বহির্ভূত কাহিনি

৬.১০ রামায়ণের অন্যান্য কবি

৬.১১ মহাভারত: কথামুখ

৬.১২ মহাভারতের অনুবাদক

৬.১২.১ আদি অনুবাদক

৬.১২.২ শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস : কবিকথা

৬.১৩ কাব্য বৈশিষ্ট্য

৬.১৪ মহাভারতের অন্যান্য কবি

৬.১৫ ভাগবত : কথামুখ

৬.১৬ কবি পরিচিতি : মালাধর বসু

৬.১৭ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য' : প্রাথমিক পরিচিতি

৬.১৮ ভাগবতের অনুবাদ : জনপ্রিয়তার অভাব

৬.১৯ সারসংক্ষেপ

৬.২০ অনুশীলনী

৬.২১ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্য শাখার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলির পরিচয় ঘটানোই এই এককের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়াও যেহেতু এগুলি ভাবানুবাদ, তাই কাব্যগুলির বিষয়বস্তু পরিবেশনের পাশাপাশি কবিরা কাব্যরচনায় কতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন তা পরিবেশন করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে কবিদের ব্যক্তিজীবন, তাঁদের কল্পনাপ্রবণতা ইত্যাদি নানাদিকের উদ্‌ঘাটনও এই অধ্যায়ের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও প্রাচীন রীতি, সংস্কৃতি, সমসাময়িক সমাজ, পরিবারজীবনের আদর্শ, মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিতকরণও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে প্রকরণগত দিক থেকেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে এই কাব্যগুলি কতগুলি অনুসরণ করেছে সেদিকটি বুঝে নেওয়া আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৬.২ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অনুবাদ সাহিত্য বলতে বোঝায় এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় রূপান্তর। অনুবাদের মূলত দুটি ধারা— (ক) আক্ষরিক অনুবাদ এবং (খ) ভাবানুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ বলতে অক্ষরের রূপান্তর সাধন, বর্ণীকরণ বা লিপ্যন্তর বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কেবল এক ভাষার বর্ণকে অন্যভাষায় রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে ভাবানুবাদের মধ্যে দিয়ে দেশ-কাল-সংস্কৃতি অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপান্তর ঘটানো হয়। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি বা মানসিকতার প্রতিফলন ঘটে। অনুবাদ সাহিত্য রচনার যথাযথ প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে। তুর্কি আক্রমণোত্তর সেই পর্বে নিম্নশ্রেণির বা অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে নিজেদের দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা প্রচারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপকভাবে বাংলা অনুবাদ হতে দেখা গেল। এগুলির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ছিল প্রধান। এই ধরনের রচনার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং বাংলা সাহিত্যে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়েই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব।

৬.৩ অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ

মধ্যযুগে বাংলায় উচ্চবর্ণের ধর্মসাহিত্য-সংস্কৃতি যেগুলি মূলত ছিল সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী, তুর্কি আক্রমণোত্তর পর্বে সেই রচনাগুলি ব্যাপকভাবে বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস অনুসরণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, তুর্কি আক্রমণ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল প্রায় দুশো বছর। তাদের চণ্ডশাসনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বাংলার সাধারণ মানুষ। বলা যেতে পারে, একটা প্রবল রাস্ট্রিক বিপর্যয়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘসময় ধরে আর্য-অনার্যের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সীমাহীন দূরত্ব। বাধ্য হয়েই নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছিল। অবশেষে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে প্রায় দীর্ঘ দু'শো

বছরের অরাজকতা কাটিয়ে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পালে নতুন করে হাওয়া বইতে শুরু করল। এই সময়টা ছিল হোসেন শাহের রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫১৯)। সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকেও অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিহার্য ছিল। তখন সমাজে আর্য-অনার্যের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ ছিল। সামাজিক সম্মিলন ও পুনর্গঠনের তাগিদে এই প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। একদিকে আর্য-অনার্যের ভেদাভেদ অতিক্রম করে অখণ্ড জাতি গঠনের প্রচেষ্টা অন্যদিকে বিদেশি শাসকের এই ভূখণ্ডের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ অনুবাদ সাহিত্য রচনার পথকে প্রশস্ত করেছিল।

সেকারণেই, অনুবাদ সাহিত্য নিছক সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, আর্য ও অনার্য সম্প্রদায়ের সেতুবন্ধনের কাজে এই সাহিত্যের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। মনে রাখতে হবে, গোটা মধ্যযুগব্যাপী মানুষ ছিল ধর্মাশ্রিত। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে গড়ে উঠেছিল জল-অচলভেদ। অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি অনেকটা প্রতিহত হল। নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চবর্ণের দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকথা শুনতে তৎপর হল। সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

৬.৪ রামায়ণ : কথামুখ

অনুবাদ সাহিত্যের যে ধারাগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছিল তার মধ্যে রামায়ণ ছিল প্রধান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামায়ণ রচনার পথিকৃৎ ছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তাঁর রচিত রামায়ণ 'শ্রীরামপাঁচালি' নামে পরিচিত ছিল। কাব্যটি সাতটি খণ্ড বা কাণ্ডে বিভক্ত ছিল। এগুলি হল আদিকাণ্ড বা বালকান্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড।

আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ডটি রামায়ণ রচনার ভূমিকা হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই চারজন পুত্রের, বিশেষত রামচন্দ্রের বাল্যজীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসনিধন, জনকের রাজসভায় হরধনুভঙ্গ ও সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিবাহ এই কাণ্ডের বিষয়বস্তু।

অযোধ্যাকাণ্ডে রামের অভিষেকের প্রস্তুতি, দশরথের দ্বিতীয়া পত্নী কৈকেয়ীর প্রার্থিত দুটি বরে রামচন্দ্রের চোদ্দ বছর বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক, রামের পিতৃসত্য পালনের জন্য লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের পথে যাত্রা। পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু এই সর্গের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অরণ্যকাণ্ডে দণ্ডকারণ্যে মুনিদের অনুরোধে রামচন্দ্রের অসংখ্য রাক্ষসবধের দৃষ্টান্ত, শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণছেদন, সীতার অনুরোধে রামের মায়ামৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ, রাবণের সীতাহরণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালিবধের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।

সুন্দরকাণ্ডের বিষয়বস্তু হল, হনুমান কর্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন ও অশোকবনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ডে বানরসেনারা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে। এর ফলে সুগ্রীবের সৈন্যসহ রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। লঙ্কায় প্রবেশের পর রাবণের ভাই বিভীষণের সঙ্গে রামচন্দ্র মিত্রতা স্থাপন

করলেন। রাক্ষসদের সঙ্গো তুমুল যুদ্ধে সবংশে রাবণ নিহত হল। সীতাকে উদ্ধার করার পর সতীত্বের প্রমাণ দিতে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও রামায়ণ পাঠের ফলশ্রুতি ইত্যাদি ঘটনা এই কাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরকাণ্ডের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রাচীন গল্পকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। রামচন্দ্র ও সীতার পরবর্তী জীবনের বর্ণনা বিশেষ নেই। সীতার চরিত্র বিষয়ে প্রজাদের সন্দেহের কথা রামচন্দ্র জানতে পেরে গর্ভবর্তী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন। এরপর সেখানেই সীতা নির্বাসিত হলেন। এছাড়াও বাল্মীকির আশ্রমে সীতার যমজপুত্র কুশ ও লবের জন্ম, তাদের শাস্ত্র ও শস্ত্র বিষয়ে শিক্ষালাভ, রামচন্দ্রের সঙ্গো সাক্ষাৎ ইত্যাদি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

৬.৫ কৃত্তিবাস ওঝা: কবিকথা

আত্মপরিচয় থেকে কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানা যায়, পূর্ববঙ্গো ছিল কবির পূর্বপুরুষের আদি নিবাস। পরে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে তাঁরা পালিয়ে এসে গঙ্গার তীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন মুরারি ওঝা। মুরারির পুত্র বনমালী ওঝা কবির পিতা। মালিনী ওঝা কবির মাতা। কবিরা ছয় ভাই, এক বোন। রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথির পুণ্যলগ্নে কবির জন্ম হয়। ফুলিয়া গ্রামে শুরু হয় বিদ্যাচর্চার হাতেখড়ি। বয়স যখন বারোয় পৌঁছায় তখন পড়াশোনার নিমিত্ত তিনি পদ্মা নদী পেরিয়ে উত্তরবঙ্গো যাত্রা করেন। দীর্ঘ দশ-বারো বছর সেখানে কাটিয়ে তিনি গৌড়ে ফিরে আসেন এবং গৌড়েশ্বরের দরবারে সভাকবির পদলাভ করেন। যদিও গৌড়েশ্বরের পরিচিতি নিয়ে সঠিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। কেউ মনে করেন, রাজা গণেশই গৌড়েশ্বর নামে খ্যাত ছিলেন। আবার অনেকের মতে, রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্ গৌড়েশ্বর রূপে খ্যাত হতে পারেন। সেই গৌড়েশ্বরের অনুরোধেই তিনি রামায়ণ কাব্য রচনা করেছিলেন। কৃত্তিবাস বলেন—

"বাপ মায়ের আশীর্বাদ, গুরু আজ্ঞা দান।
রাজ আজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান।।"

নিজের সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন,

"সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ, নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে।।"

৬.৬ আত্মপরিচয় বিতর্ক ও 'কৃত্তিবাস' সমস্যা

নগেন্দ্রনাথ বসু সর্বপ্রথম ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গোর জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় শীর্ষক পয়ারের প্রথম ন'টি ছত্র উদ্ধৃত করেন। তাঁর পরে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) কৃত্তিবাসের একটি ১৫২ ছত্রের পূর্ণাঙ্গ আত্মবিবরণী প্রকাশিত

হয়। তিনি উক্ত আত্মবিবরণীটি হুগলি জেলার বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। যদিও আসল পুথি হারাধন দত্ত ভক্তনিধি তাঁকে দেননি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষক ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা চারটি পুথির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে ওই আত্মবিবরণী জাল বা মিথ্যা নয়।

নগেন্দ্রনাথ বসুর মৃত্যুর পর ১৩৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পুথিগুলি নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগ্রহ করে *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় আত্মবিবরণীটি প্রকাশ করেন। উদ্ধার হওয়া দুটো আত্মবিবরণীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থে উদ্ধৃত আত্মপরিচয়ের পংক্তি সংখ্যা একশো বাহান্নটি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর উদ্ধার করা আত্মপরিচয়ের পংক্তি সংখ্যা একশো বিরাশিটি। যদিও দুই পুথিতে পঞ্চাশটি ছত্র হুবহু এক। এছাড়াও পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসের কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। যেগুলির ভাষা, লিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের। দ্বিতীয়ত, উদ্ধার হওয়া আত্মপরিচয়গুলিতে জন্মমাস, কাব্যরচনাকাল এবং গৌড়েশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। গবেষকদের একাংশের মতে কবি কৃত্তিবাস রাজা গণেশের রাজত্বকালে (১৪১৪-১৪১৮) আবির্ভূত হন। গণেশই পরবর্তীকালে দনুজমর্দনদেব নামধারণ করেন। আবার কেউ বা মনে করেন, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবলগ্ন রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৪৯-১৪৭৪) আমলে। এভাবেই কৃত্তিবাসকে ঘিরে পণ্ডিতমহলে বহুমাত্রিক মতামত তৈরি হয়েছে। সমস্যার কুহকভেদ করে প্রকৃত সত্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদিও নিজের আবির্ভাবলগ্ন সম্পর্কে কৃত্তিবাস জানিয়েছিলেন—

> "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য) মাঘ মাস।
> তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

এই শ্লোক অনুযায়ী মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি ছিল ১৩৫২, ১৩৭২, ১৩৭৫ এবং ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ গণনার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি রবিবার রাত্রিতে কৃত্তিবাসের জন্ম। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ 'পূর্ণ মাঘ মাস' ধরে বিচার করে উক্ত মত সমর্থন করেছেন। গোপাল হালদার মনে করেন, ১৪৩২ নয়, ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম এবং এই সময়ে গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবত গণেশ বা দনুজমর্দনদেব। ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (প্রথম পর্যায়) গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেছেন, কংসনারায়ণের রাজত্বকাল ছিল আনুমানিক ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩২-৩৩ খ্রি.) জাত কবির পক্ষে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোনো রাজসভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। বসন্তরঞ্জন রায় বা অপর কোনো প্রতিপক্ষীয় বিশেষজ্ঞ ড. নলিনীকান্তের এই আপত্তি খণ্ডন করেননি।

৬.৭ কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈশিষ্ট্য

৬.৭.১ বাঙালিয়ানা : কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলি বাঙালি লোকজীবনের সমান্তরালে বেড়ে উঠেছে। তাঁর রামায়ণ হয়ে উঠেছে সনাতন বাঙালি জীবনের মহাকাব্য। যেখানে চরিত্রদের বীরত্ব, পৌরুষত্ব কম; দুঃখে

কাতর। চরিত্রগুলি প্রেমে দুর্বল, স্নেহ-মমতায় কোমল। সীতাই রামচন্দ্রের জীবনসর্বস্ব। সীতা ছাড়া সে দুর্বল, দৈবীসত্তা বিস্মৃত হয়ে অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন—

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।।"

রাজা দশরথও স্ত্রৈণ, বৃদ্ধ পতি। সীতা দুঃখসহনশীলা বাঙালি কুলবধূ। বাংলার পরিবার জীবনের সমান্তরালে লিখিত হয়েছে এ কাব্য। মহাকালের কষ্টিপাথরে সেকারণেই কাব্যটি বিলীন হয়ে যায়নি।

বাঙালির আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বেশভূষা বা সংস্কৃতির ছবি কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুর্লভ নয়। রামচন্দ্রের জন্মের পাঁচদিন পরে পাঁচুটি, ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা, আটদিনে অষ্টকলাই, ত্রয়োদশ দিনে জন্মশৌচান্ত, ছয়মাসে অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কারের ছবি বাঙালি জীবনধর্ম থেকে আহৃত। গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণকালে বাংলার বিভিন্ন স্থান নাম উঠে এসেছে। এগুলির মধ্যে নদিয়া, নবদ্বীপ, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম, মাহেশ প্রমুখ জনপদগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালির প্রাত্যহিক খাদ্যদ্রব্য স্থান পেয়েছে। ভরতের আগমনে গুহক অতিথিকে কই, চিতল, নারিকেল, আম, কলা, কাঁঠাল, দুধ, দই দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। ভরদ্বাজের আশ্রমেও ছিল নানাপ্রকার পায়েস-পিঠাসহ উত্তম ভোজনের ব্যবস্থা—

"চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সামলী
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পুলি।।"

ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে রামচন্দ্রের সমরবাহিনীও নানারকম সুখাদ্যে মগ্ন ছিল। এগুলির মধ্যে মতিচুর, মণ্ডা, রসবড়া, মনোহরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠা, লুচি, জিলাপি, পাঁপড়, পায়েস, কচুরি, ক্ষীর, ছানাবড়া, ছানাভাজা, খাজাগজা উল্লেখযোগ্য। বাঙালি ভোজনরসিক। উত্তরকাণ্ডে সীতা নিজে রান্নাবান্না করে দেবর লক্ষ্মণকে খাইয়েছেন। খাওয়ার আয়োজন সবই চলেছে বাঙালি মতে। শাক দিয়ে শুরু হয়েছে ভোজনপর্ব। সুপ, ভাজা, ঝোল ইত্যাদি পঞ্চাশ ব্যঞ্জনযোগে চলেছে ভুঁড়িভোজন—

"শেষে অম্বলান্তে হল ব্যঞ্জন সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।।"

বাঙালিরা নিজেদের ঘর-গৃহস্থালি ও চিরপরিচিত হেঁসেলের ছবি এখানে খুঁজে পায়। সীতার মধ্যে বাঙালি নারী সমাজের সুখ-দুঃখই যেন উপলব্ধি করতে চেয়েছে। সীতা চরিত্র বাঙালিদের কাছে শুধু একটি প্রাচীন পৌরাণিক নারীচরিত্র নয়, তার মধ্য দিয়ে বাঙালি সর্বংসহ স্ত্রীসমাজকেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। সাহিত্যকে পাঠকের হৃদয়গ্রাহী রূপে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর অনূদিত রামায়ণে যে এই বাঙ্গালিয়ানার আমদানি করেছেন তা অনুবাদ কাব্যটিকে স্বকীয়তা দান করেছে।

৬.৭.২ শৈলীগত বৈশিষ্ট্য : ছন্দ রচনায় কবি প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে পয়ার ছন্দের অনুবর্তন করেছেন। তাই আট ও ছয় মাত্রার বিন্যাস দেখা যায় তাঁর রচনায়—

"ত্রাসেতে কান্দেন সীতা / হইয়া কাতর। (৮ + ৬)
কোথা গেলে প্রভুরাম / গুণের সাগর।।" (৮ + ৬)

শুধু ছন্দোগুণেই নয়, উপমাচয়ন বা অলংকার যোজনাতেও কবি মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন।

উপমা : "জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।"
উৎপ্রেক্ষা : "কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেতুঁলের গাছে।।"

কবির কাব্য রচনার অসাধারণ উৎকর্ষের কথা বিবেচনা করে মাইকেল মধুসূবন দত্ত লিখেছেন, "কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি এ বঙ্গের অলংকার"।

৬.৮ রসবিচার

৬.৮.১ করুণরস : কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল রস করুণরস। দুঃখ-যন্ত্রণায় আবেগপ্রবণ বাঙালি কাঁদতে ভালোবাসে। রামায়ণ কাব্যের বিভিন্ন কাণ্ডে করুণ রসের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামের নির্বাসন থেকে আরম্ভ করে উত্তরকাণ্ডে সীতার নির্বাসন ও সীতার ধরিত্রী মাতার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ সর্বত্রই করুণ রসেরই প্রাধান্য। দশরথের মৃত্যুর প্রসঙ্গ, কিংবা রামের নির্বাসনে অযোধ্যাবাসীর বিলাপের প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। পঞ্চবটী বনে সীতাহরণের পর নিঃসঙ্গ রামের বিলাপ খুব মর্মস্পর্শী রূপ নিয়েছে।

রামের সঙ্গে উপস্থিত সকলেই কাঁদছেন। "রামের ক্রন্দনে কাঁদে সর্ব দেবগণ।" শুধু তাই নয়—

"কান্দিয়া বিফল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখি।।"

অর্থাৎ সমগ্র রামায়ণ জুড়ে সীতার বিহনে রামের মর্মক্রন্দন প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বালীবধে তারার বিলাপ, রাবণবধ এবং তার বিধবা পত্নীদের দুঃখ-শোক প্রভৃতি নানা ঘটনা করুণরসের নিবিড় আলিঙ্গানে বাঁধা।

"অযোধ্যার নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন।
শ্রীরামের ক্রন্দন হৈল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।।"

এভাবেই সমগ্র কাব্যের কাহিনিবিন্যাসে বাংলার সহজ জীবনরসের সুর কবি কৃত্তিবাস মূর্ত করে তুলেছেন।

৬.৮.২ হাস্যরস : করুণরস সৃষ্টিতে কবি যতখানি যত্নবান ছিলেন হাস্যরস সৃষ্টিতে ততখানি যত্নশীল না হলেও হাস্যরসের কিছু কিছু পরিচয় গোচরে বা অগোচরে কৃত্তিবাসের কাব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। যেমন, হরধনু উত্তোলনে ব্যর্থ হলে চরম বিড়ম্বনায় পড়ে রাবণ—

"কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।। "

'সুন্দরকাণ্ড'-এ রাবণের অনুচরবৃন্দের হাতে বন্দী হওয়ার পর নির্বিকার হনুমান—

"মনে মনে হাসে তবে পবন কুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল স্কন্ধের উপরে।। "

বন্দি হনুমানকে দেখে রাক্ষসীরা পরিহাস রসিকতা শুরু করলে হনুমান জানিয়েছে—

"হনুমান বলে, ইহা নাহি জান নারী।
রাবণের কন্যা আছে পরম সুন্দরী।।
কুলীন ভাবিয়া বিভা দিবেক আমারে।
বিভা নাহি করি, তাই বান্ধিয়াছে করে।।"

'অঙ্গাদের রায়বার' অংশটি কবির হাস্যরস সৃষ্টির উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা বহন করেছে। চটুল ব্যঙ্গাবিদ্রূপ, গালিগালাজকে এই অংশে কবি রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। অঙ্গাদের ভয়ে সভাসদসহ রাবণ শত শত মূর্তি ধারণ করলে যুবরাজ অঙ্গাদ ইন্দ্রজিতকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে—

"ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্যরে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাবি কেমনে রাখে।।"

ধামালি ছন্দে পরিবেশিত এই অংশটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি উজ্জ্বল সংযোজন।

৬.৮.৩ ভক্তিরস : ভক্তিভাবুকতা বাঙালির চিরাচরিত সংস্কার। কৃত্তিবাস সেই চিরায়ত সংস্কারের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন কাহিনির মধ্যে। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক এখানে আন্তরিকতা, নিষ্ঠায়, মহত্তর রূপধারণ করেছে। হনুমানের আত্মনিবেদনে দাস্যভক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। রামচন্দ্রই তার প্রভু, তার জীবনসর্বস্ব। দুঃখ-দুর্বিপাকে সেই তার একমাত্র ভরসা—

"তুমি পিতা, তুমি মাতা তুমিই সকল।
তুমিই হনুর এক জুড়াবার স্থল।।"

রামচন্দ্র এখানে আরাধ্য দেবতা। বিভীষণ পুত্র তরণীসেন রামচন্দ্রের সঙ্গো যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তার সারা গায়ে 'রাম' নাম লেখা ছিল। যুদ্ধে মারা গেলেও তরণীসেন বা রাবণের মনে কোনো দুঃখ ছিল না। কারণ—

"যদ্যপি রামের হাতে হয়ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব, না হয় খণ্ডন।।"

যুদ্ধে আহত ও মুমূর্ষু রাবণ রামচন্দ্রকে জানায়—

"অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।"

এভাবেই ভক্তিরসের আধারে রামায়ণকে বাঙালি মন ও মানসিকতার অনুকূলে নবরূপ দান করেছিলেন কবি কৃত্তিবাস। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন, "ভক্তিবাদের দেশে কৃত্তিবাস রামভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে রামনাম তত্ত্ব নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দস্যু রত্নাকর এই 'রাম' নাম করতে করতে উদ্ধারলাভ করেন। অন্ধমুনির পুত্রকে হত্যা করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠপুত্র রামদেবের নির্দেশে তিনবার 'রাম' নাম করে মহাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন। লঙ্কাযুদ্ধে দুরাচারী রাক্ষসরা এই নাম উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ করে। কাব্যে আছে—

"রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার করিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা।।
রাম নাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আদলে নাম তত্ত্বকে কবি প্রকাশ করেছেন। বাঙালির সহজাত ভক্তিবাদ কৃত্তিবাসের রামায়ণে স্বাতন্ত্র্য সংযোজন করেছে।

৬.৯ কৃত্তিবাসী রামায়ণ : বাল্মীকি বহির্ভূত কাহিনি

বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণ করে কৃত্তিবাস বাংলা অনুসারী সাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন একথা তিনি কাব্যমধ্যে একাধিকবার স্বীকার করেছেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখি—

"বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ"

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ হতে কিছুটা স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ হলেও এটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তাই অনেক অংশ তিনি যেমন বর্জন করেছেন, তেমনি কাহিনিকে আক্ষ্ণ র্কষণীয় করার জন্য, কৃত্তিবাসের ভাষায় বলা যায়, "লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত"—এই কারণে তিনি নিত্যনতুন কাহিনির সন্নিবেশও ঘটিয়েছেন। পুরাণ ও লোককথাকে অনুসরণ করেছেন, ব্যক্তিগত কল্পনার সুর সংযোজন করেছেন। ফলে রচনার মধ্যে কবির মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের যেসমস্ত কাহিনি কবি বর্জন করেছেন, সেগুলি হল—কার্তিকের জন্মকথা, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ প্রসঙ্গ, বিশ্বামিত্র কথা, অম্বরীষ যজ্ঞ এবং রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য হৃদয় স্তবপাঠ। বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত নতুন কিছু বিষয় তিনি সংযোজন করেছেন। এগুলি হল—সৌদাস-দিলীপ-রঘুর

কাহিনি, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, গণেশের জন্মকথা, সম্বরাসুর বধ, কৈকেয়ীর বরলাভ, গুহকের সঙ্গো মিতালি, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে করতলে ধারণ, বীরবাহুর যুদ্ধ, তরণীসেন-মহীরাবণ-অহীরাবণ কাহিনি, রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চণ্ডিকার অকালবোধন এবং নীলপদ্মের কাহিনি, গণকের ছদ্মবেশে মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করেছে হনুমান, মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা, দেবর বধূদের অনুরোধে সীতা কর্তৃক খড়ির দ্বারা রাবণ মূর্তি অঙ্কন, তা দেখে রামের মনে সন্দেহ এবং সীতাকে নির্বাসন, লব-কুশের যুদ্ধ ইত্যাদি।

তবে মনে রাখতে হবে, পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাস একাধিক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাই কাব্য পরিকল্পনায় তিনি শুধু বাল্মীকি রামায়ণকেই নির্ভর করেননি, প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিয়েছেন—

“নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।”

আদি, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডের বহু অংশ কবি ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, যোগবশিষ্ট রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বৃহৎপুরাণ ও কালিকাপুরাণ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও কবি কাব্যটিকে বাঙালি লোকজীবনের সমান্তরালে পরিবেশন করেছিলেন। বাঙালির আচার-আচরণ, রীতিনীতি মেনে কাব্যটির নানা জায়গায় তাঁকে নানা পরিবর্তন ও নতুন কাহিনিবস্তু সংযোজন করতে হয়েছিল। সবমিলিয়ে একাব্য তিনি জনমানসের পক্ষে উপযোগী, হৃদয়াগ্রাহী করে কাব্যটিকে উপস্থাপন করতে পেরেছিলেন।

৬.১০ রামায়ণের অন্যান্য কবি

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা ছাড়াও সপ্তদশ শতকের রামায়ণ অনুবাদক ছিলেন অদ্ভুত আচার্য ও মহিলা-কবি চন্দ্রাবতী। অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের প্রচলন ছিল উত্তরবঙ্গো। অদ্ভুত আচার্যের প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ। নিজের কবিত্বগুণ ও সংগীতচর্চার সুবাদে ‘অদ্ভুত আচার্য’ উপাধিতে তিনি পরিচিত ছিলেন। বৃহদায়তন কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। কাব্যের মধ্যে বহু পৌরাণিক তথ্য সংযোজিত হয়েছে। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ নির্মাণে কবির পাণ্ডিত্য খুব একটা উচ্চস্তরের ছিল না। মহিলা-কবি চন্দ্রাবতীর পুথি আবিষ্কার করেন চন্দ্রকুমার দে। ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-বাসর, বর-অভিষেক ছাড়াও অন্যান্য মঙ্গালোৎসবের সময় এই রামায়ণের গান গেয়ে থাকেন। কাব্যটি অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত। সীতার বনবাস পর্যন্ত এ কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যের মধ্যে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ। কাব্যের ভাষা বর্ণনা, বাগভঙ্গিমায় নারীসুলভ কোমলতার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যান্য রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজ হরিচরণ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, কৈলাস বসু, দ্বিজ লক্ষ্মণ, ঘনশ্যাম দাস, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ প্রমুখ কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায় এরা খুব একটা উচ্চস্তরের কবি ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ অনুবাদ করেন জগৎরাম রায়, শিবচন্দ্র সেন, রামানন্দ ঘোষ, দ্বিজ সীতাসুত, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রমুখ। শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ ‘বিষ্ণুপুরী রামায়ণ’ নামে পরিচিত।

৬.১১ মহাভারত : কথামুখ

প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধারণ জনজীবনের কল্পনামিশ্রিত কাহিনিই মহাভারত। কবির কথায়, "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"; অর্থাৎ মহাভারত ভারতবর্ষের ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুর আকর গ্রন্থ। প্রাচীন রাজারাজড়াদের কল্পনামিশ্রিত কাহিনি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি এই কাব্যে সংস্কৃত ভাষায় বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিতভাবে রূপায়িত হয়েছে। মধ্যযুগে বিশেষত, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বিশালকায় এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু সেসময়ের অনুবাদ বলতে কেবল আক্ষরিক অনুবাদ বোঝায় না, গ্রন্থটি ভাবানুবাদ করা হয়। বাংলা দেশে এই গ্রন্থ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে সাড়া ফেলে দেয়। বহুচর্চিত এই গ্রন্থটি বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হল।

৬.১২ মহাভারতের অনুবাদক

৬.১২.১ আদি অনুবাদক : বাংলা মহাভারতের আদি অনুবাদক সম্ভবত ছিলেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর। অনুমিত হয়, 'কবীন্দ্র' ছিল তাঁর উপাধি। তিনি হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ-র সভাকবি ছিলেন। তাঁর নির্দেশে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি এ কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত মহাভারতের নাম 'পাণ্ডববিজয়'। পরাগল খাঁ-র নির্দেশে রচিত হওয়ায় কাব্যটি 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রচলিত ছিল। সমগ্র মহাভারতকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ করে এর কাহিনি, রসবস্তুর প্রতি তিনি বিজাতীয় শাসকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কাহিনির সমান্তরালে বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। সেদিক থেকে কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ছিলেন মহাভারতের আদি অনুবাদক। পঞ্চদশ শতকে সংস্কৃতে যখন কোনো যথাযথ অনুবাদের আদর্শ ছিল না তখন বাংলায় অনুবাদ করে কবি এ কাব্যের মধ্যে দিয়ে অনুবাদরীতির আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সরল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের বিন্যাসে কাব্যটিকে তিনি শিল্পরূপদান করেন। কাব্যের প্রয়োজনে ফারসি শব্দের বর্জন ঘটিয়েছেন এবং অতিরিক্ত তৎসম শব্দপ্রয়োগ করেছেন।

পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়'-এর পর ষোড়শ শতাব্দীতে জৈমিনি-সংহিতা অবলম্বনে কেবল মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব' অংশের অনুবাদ করেছিলেন শ্রীকর নন্দী। কবির ব্যক্তিগত জীবনকথা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন পরাগল খাঁ-র পুত্র ছুটি খাঁ। এইকারণে কেউ কেউ তাকে ছোটো খাঁ রূপেও অভিহিত করেছেন। তাঁর আসল নাম নুসরত খান। সুদক্ষ প্রশাসকের পাশাপাশি ছুটি খাঁ ছিলেন কাব্য ও সাহিত্যের উত্তম পৃষ্ঠপোষক। সভাকবি শ্রীকর নন্দীকে তিনি মহাভারত রচনায় উৎসাহিত করেন। সেকারণে কাব্যটি 'ছুটিখানী মহাভারত' নামে সমাজে প্রচলিত ছিল।

গতানুগতিক কাব্যচর্চার অভিনবত্ব আনতে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ অশ্বমেধ পর্বকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই জৈমিনী মহাভারত অবলম্বনে তিনি কাব্যরস পরিবেশনে সমর্থ হয়েছিলেন। উৎকর্ষের বিচারে তাঁর কাব্য 'পরাগলী মহাভারত' অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। অশ্বমেধ পর্ব আকারে সংক্ষিপ্ত হওয়া

সত্ত্বেও কবি বেশ কিছু কাহিনি সংযুক্ত করেছেন। এগুলির মধ্যে— যৌবনাশ্ব, নীলধ্বজ, জনা, চণ্ডিকা, সুধন্বা, সুরথ, হংসধ্বজ, প্রমীলা-অর্জুন, বভ্রূবাহন, তাম্রধ্বজ ও চন্দ্রহাসের কাহিনি প্রভৃতি প্রধান। এছাড়াও কাব্যের মধ্যে কৌতুকরসের বেশ কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

৬.১২.২ শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস : কবিকথা

বাংলা মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস। এর জন্ম হয়েছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্তী সিঙ্গি মতান্তরে সিদ্ধিগ্রামে। তার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁর জন্ম হয়। আত্মপরিচয় অংশে তিনি লিখেছেন—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।।
কায়স্থ কূলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাসের পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।।"

তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর কৌলিক পদবী ছিল 'দেব'। গুরু অভিরাম মুখটির নির্দেশে তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর কাব্য 'ভারত পাঁচালি' নামে পরিচিত ছিল। অষ্টাদশ পর্বে তিনি কাব্যটি রচনা করেছিলেন। যদিও সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।।"

কবির ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা মিলে কাব্যের বাকি পর্বগুলি রচনা করে কাব্যটির সম্পূর্ণতা দান করেন।

৬.১৩ কাব্যবৈশিষ্ট্য

কাশীরাম দাসের মহাভারত ছিল আঠারো পর্বে বিন্যস্ত এক সুবিশাল কাব্য। ব্যাসদেবের মহাভারত ও জৈমিনী মহাভারত অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করলেও কবি মূল কাহিনির হুবহু অনুসরণ করেননি। ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারতের বেশ কিছু অংশ তিনি বর্জন করেছিলেন। পাশাপাশি লোকপুরাণ, উলটপুরাণ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান, পারিজাতহরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের আগমন প্রভৃতি কাহিনি ব্যাসদেবের মহাভারতে নেই। কাশীরাম দাস কাব্য পরিকল্পনায় সংস্কৃত ঐতিহ্য ও রীতিকে অনুসরণ করলেও বাঙালি জীবনাদর্শের প্রতিফলন কাব্যকে নানাভাবেই প্রভাবিত করেছিল। ভীম, অর্জুন চরিত্রের ক্ষাত্রতেজ, দৃঢ়তা বর্তমান কাব্যে অনুপস্থিত। দ্রৌপদী

যেন রন্ধনপটীয়সী বাঙালি ঘরের বধূ। ভীমপত্নী হিড়িম্বাকে দেখে তার মধ্যে জেগে ওঠে সপত্নীসুলভ ঈর্ষা। বিনা কারণে পুত্র ঘটোৎকচের অতিরিক্ত প্রশংসা করলে দ্রৌপদী হিড়িম্বাকে গালি দেয় "পুত্রের করহ গর্ব খাও পুত্র মাথা"। শুরু হয় দুই সতীনে চুলোচুলি। এভাবেই বাঙালি জীবনধর্মের অনুকূলে কাব্যরস পরিবেশন করেছেন কবি।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত প্রেম-ভক্তিবাদের আদর্শ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কাশীরাম দাসের 'ভারতপাঁচালি' ও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের রূপ বর্ণনায় মণ্ডণকলার ঐশ্বর্য ফুটে উঠছে। ক্লাসিক কাব্যকায়া নির্মাণের প্রসঙ্গ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখবার বর্ণনাটি উল্লেখ করা যায়—

"সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটখানি কিরীটভূষণ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুন্তল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল।।"

কাশীরাম দাস ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় একজন যোগ্য পণ্ডিত। ব্যাসদেবের অনুসরণে স্বচ্ছ অনুবাদকার্যে তিনি সফলতা অর্জন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাসদেবের মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকের প্রশ্ন :

"কা চ বার্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতে।
মামৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নানকথয়িত্বা জলং পিব।।"

কাশীরাম দাসের 'ভারতপাঁচালি'-তে :

'কিবা বার্তা কি আশ্চর্য পথ বলি কারে।
কোনজন সুখী হয় এই চরাচরে।।
পাণ্ডু পুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি।।'

ঘটনাবিন্যাসে, নাটকীয়তায়, সরস উক্তি-প্রত্যুক্তি ও হাস্যরসের পরিবেশন ঘটিয়ে কাশীরাম দাস কাব্যটিকে কৃত্তিবাসের মতো জনচিত্তজয়ী করে তুলেছিলেন। কাব্যে একইসঙ্গে গ্রামীণ সরলতার পাশাপাশি নাগরিক আড়ম্বরের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বীররস প্রধান কাহিনিতে ভক্তিভাব মিশে এক অপরূপ আস্বাদ নির্মিত হয়েছে। কাব্যে একাধিক ভণিতা সত্ত্বেও কাহিনির মধ্যে অসঙ্গতি খুব বেশি দেখা যায় না। ললিত, প্রাঞ্জল ভাষারীতির মধ্যে দিয়ে সংযত, সংহত আকারে মূল মহাভারত কথাকে যেভাবে তিনি বিন্যস্ত করেছেন, তা হয়ে উঠেছে 'অমৃত সমান'। যাকে বন্দনা করে মধুকবি লিখেছেন—

"ভারতরসের স্রোত আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।।"

৬.১৪ মহাভারতের অন্যান্য কবি

অষ্টাদশ শতকে মহাভারত রচনার স্রোত একেবারে মন্দীভূত হয়ে পড়ে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালি জীবনে তখন তেমন সজীবতা ছিল না। ফলে মহাভারত রচনা হয়ে পড়ে গতানুগতিক ও নিষ্প্রাণ। অষ্টাদশ শতকে মহাভারত রচনা করেছিলেন কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, সুবুদ্ধি রায়, সরলা দাস, রাজেন্দ্র সেন প্রমুখ কবি। উল্লেখযোগ্য কবিত্বশক্তি না থাকায় তাঁদের কাব্য তেমন জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়াও কাশীরাম দাসের কাব্যের আড়ালে অনেক কবিপ্রতিভাই ঢাকা পড়ে গেছে।

৬.১৫ ভাগবত : কথামুখ

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোটি মহাপুরাণ ও আঠারোটি উপপুরাণ, পুরাণের মধ্যে জনজীবনে ভাগবত পুরাণের প্রভাব সবচেয়ে সমাদৃত। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পুরাণকে প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলে গ্রহণ করেছেন। কথিত আছে, মহামুনি ব্যাসদেব পুরাণ সমূহের রচয়িতা। কিন্তু পুরাণসাহিত্য গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, কোনো একক রচনাকারের সৃষ্টি নয়। ভাগবতে বিষ্ণুপুরাণের অনেক কথা পুনরুক্ত হয়েছে। এতে মহাভারত ও গীতার প্রভাবও লক্ষ করা যায়। প্রাদেশিক ভাষায় ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্দের অনুবাদ বিশেষ প্রচলিত ছিল। দশম স্কন্দে যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত তা বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে। ভাগবতে রাসলীলার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

৬.১৬ কবি পরিচিতি : মালাধর বসু

মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতা ছিলেন ইন্দুমতী। মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসু। রামানন্দ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অন্যতম ভক্ত ও পার্ষদ। মালাধর বসু কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে জানিয়েছেন—

"তেরশ প'চানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

এই শ্লোকের প্রামাণিকতা স্বীকার করলে কবি ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রচনাকার্য শেষ করেন। সুতরাং সাল-তারিখের বিচারে বলা যায়, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দী। কাব্য রচনা সম্পর্কে মালাধর বসু জানিয়েছেন—

"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।
তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন।।"

কবি আরো জানিয়েছেন যে তাঁর কবিত্বশক্তিতে প্রীত হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধি প্রদান করেছিলেন "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান"। গৌড়েশ্বরের পরিচিতি নিয়ে বেশ কিছু ধন্দ রয়ে গেছে। কেউ মনে করেন গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৪৯-১৪৭৪) আমলে তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন। আবার কারো মতে, এই গৌড়েশ্বর আসলে হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)। মোটামুটিভাবে বলা যায়, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন—

"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
আর এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।"

৬.১৭ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য : প্রাথমিক পরিচিতি

মালাধর বসু রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। তবে কাব্যটি 'গোবিন্দবিজয়', 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত ছিল। মালাধর বসু গ্রন্থ রচনার কারণ হিসাবে লিখেছেন—

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বন্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালি রচিয়া।।"

মালাধর বসু ব্যাসদেব রচিত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেননি। বারোটি স্কন্দে বিভক্ত ভাগবতের তিনি কেবল দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেছেন। ভাগবতের দশমস্কন্দে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দ্বারকালীলা পর্যন্ত শান্ত জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে এবং একাদশ স্কন্দে যদুবংশ ধংস, কৃষ্ণের দেহত্যাগ ও উদ্ধবের কথোপকথনের মাধ্যমে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও মুক্তির নানা তত্ত্বকথা স্থান পেয়েছে।

মালাধর বসু ভাগবতের কাহিনিকে তাঁর কাব্যে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত করেছেন। এগুলি হল আদিখণ্ড বা বৃন্দাবনলীলা, মধ্যখণ্ড বা মথুরালীলা এবং অন্ত্যখণ্ড বা দ্বারকালীলা। বৃন্দাবনলীলা খণ্ডে রয়েছে কংসের অত্যাচারের হাত থেকে জগৎবাসীকে বাঁচানোর জন্য কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলাভ, অতঃপর গোকুলে নন্দগৃহে কৃষ্ণের প্রতিপালন, পুতনা বধ প্রভৃতি। মথুরালীলায় রয়েছে কৃষ্ণ-বলরাম কর্তৃক কংসের পিতা পরম ধার্মিক উগ্রসেনের মুক্তি ও মথুরার সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জরাসন্ধ বধ, কৃষ্ণ-বলরামের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনা। দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মিনীহরণ, সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ, ঊষার সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহ, শিশুপালবধ, যদুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের তনুত্যাগ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে মালাধর বসু ভাগবতকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন।

মালাধর বসুর কাব্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার প্রভাব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তবু বহু অংশে তাঁর কল্পনাশক্তির নিদর্শন মেলে। কবির নম্রতা, বিনয় ও ভক্তিভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ হয়ে উঠেছে এই কাব্য। এই সূত্রে বাঙালিয়ানার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে মাতা-পুত্রের নিবিড় সম্পর্ক ধরা

পড়েছে। যশোদা কৃষ্ণকে বলেছে, "ভাত খায়্যা পুনরপি খেলহ আসিয়া"। কৃষ্ণের মথুরা গমনে গোপীগণের হাহাকার ইত্যাদি অংশে আবেগপ্রবণ বাঙালির চিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া বৃন্দাবনের প্রকৃতি এবং বাংলার প্রকৃতি তাঁর কাব্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

৬.১৮ ভাগবতের অনুবাদ: জনপ্রিয়তার অভাব

মহাকায় ভাগবত কাব্যটি গতানুগতিক ধারায় রচিত। এর মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষিত হয়। এটি মূলত কৃষ্ণাশ্রয়ী কাব্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে অনুবাদকেরা কৃষ্ণের মহিমান্বিত অবতার মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা দেশে কৃষ্ণভক্তির দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব, দ্বিতীয় ধারায় কৃষ্ণের মাধুর্য ভাব চোখে পড়ে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রেম-ভক্তিবাদের প্রভাবে কৃষ্ণলীলার মাধুর্যের দিকটি রসিক বৈষ্ণব ভক্তদের আকৃষ্ট করেছিল। তারা বৈষ্ণবপদাবলির রসে তৃপ্ত হয়েছে। ভক্ত-ভগবান, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখায়নি। ভাগবতের অন্যতম অবলম্বন দার্শনিকতা। রামায়ণ-মহাভারত রসে পুষ্ট, গল্পপিপাসু বাঙালির অস্থি-মজ্জায় ভাগবত একাত্ম হতে পারেনি। তত্ত্বের আবেদন মুখ্য বলে ভাগবত প্রধানত পণ্ডিত সমাজের অনুশীলনের বিষয় হয়েছে।

ভাগবতে রাধাপ্রসঙ্গ নেই, এখানে কাহিনির আবেদন গৌণ। ফলে বাংলার সাধারণ মানুষ তত্ত্বের নীরস জগতে রস আস্বাদন করতে পারেনি। তাই ভাগবত পাঠককে পণ্ডিতের মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে ভাগবতের কোনো অনুবাদ কৃত্তিবাস, কাশীরামের অনুবাদ গ্রন্থের মতো ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করেনি। এছাড়াও মনে রাখতে হবে, প্রতিভাশালী কবির রচনা উৎকর্ষে কাব্যসাহিত্য পাঠকমহলে সমাদর লাভ করে। রামায়ণ-মহাভারত শাখার তুলনায় ভাগবত অনুবাদক কবির সংখ্যা কম। তাই উচ্চশ্রেণির কবিপ্রতিভার অভাবে অনুবাদ সাহিত্যের এই শাখাটি তেমন পুষ্টিলাভ করেনি।

মহাপ্রভুর সমসাময়িককালে ভাগবত রচনা করেন ভাগবতাচার্য রঘুনাথ পণ্ডিত। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'। এছাড়াও এইসময় কবিশেখর 'গোপালবিজয়' কাব্য রচনা করেন। চৈতন্য পরবর্তীকালে ভবানন্দের 'হরিবংশ' কাব্য উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ভক্তকবি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে কাশীরাম দাসের অগ্রজ কৃষ্ণদাস, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত প্রমুখ কবির নাম স্মরণ করা যায়। তবে কাব্যগুণে সেগুলি জনমানসে বিশেষ সাড়া ফেলতে পারেনি।

৬.১৯ সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত আলোচনায় সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত কাব্যের বাংলা অনুবাদে কবিদের বিশেষ কৃতিত্ব, স্বকীয়তা ধরা পড়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণে বিপন্ন বাঙালি জাতির কাছে উল্লেখিত কাব্যগুলি বিশেষ প্রাণরসের সঞ্চার করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আপামর বাঙালি সংস্কৃত রাম-সীতার কাহিনি

কিংবা মহাভারতের কাহিনির বৈচিত্র্য সন্ধানে বঞ্চিত ছিল। সেই অজ্ঞাত কাহিনিকে লোকজীবনের অনুকূলে পরিবেশন করলেন অনুবাদ কাব্যের কবিরা। এর ফলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব-কৌরব ইত্যাদি চরিত্রগুলির মধ্যে বাঙালি তার ব্যক্তিগত জীবনসাম্য অনুভব করতে পারল। দেবতাদের দৈবীখোলস অপসৃত হল। ফলে শতাব্দীবাহিত পথে লেখক পরম্পরায় একই বিষয়ের অনুবর্তন হয়ে চলল। প্রীতির সঙ্গে ভক্তি আর বিষয়ের সঙ্গে প্রকরণের সংযোগ ঘটল। এভাবেই বাংলা সাহিত্য পঞ্চদশ থেকে দীর্ঘ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক নতুন ধারার সাহিত্যসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

৬.২০ অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. অনুবাদ সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? অনুবাদ সাহিত্য রচনার কারণ উল্লেখ করো।

২. কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণগুলি লেখো।

৩. কৃত্তিবাসের কাব্যে বাল্মীকি রামায়ণ বহির্ভূত কাহিনিগুলির পরিচয় দাও।

৪. কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ও কবি-পরিচিতি উল্লেখ করো। বাংলা সাহিত্যে ‘কৃত্তিবাস সমস্যা’ বলতে কী বোঝায়?

৫. মহাভারতের অনুবাদক হিসেবে কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৬. কাশীরাম দাসের মহাভারতের জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করো।

৭. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করো।

৮. ভাগবত অনুবাদে মালাধর বসুর কৃতিত্ব বিচার করো।

৯. অনুবাদ সাহিত্যের তিনটি ধারার মধ্যে ভাগবত কাব্যের কম জনপ্রিয়তার কারণ উল্লেখ করো।

১০. মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. পাঁচালি বলতে কী বোঝ?

২. কৃত্তিবাসের কাব্যটি কয়টি খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?

৩. কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রাপ্ত কালজ্ঞাপক শ্লোকটি লেখো।

৪. একজন মহিলা রামায়ণকারের নাম লেখো। তিনি কোন্ সময়ের কবি ছিলেন?

৫. মালাধর বসুর কাব্য রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি লেখো।

৬. ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৭. ‘পরাগলী মহাভারত’ কী?

৮. কাশীরাম দাসের কাব্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৯. 'ছুটিখানী মহাভারত' বলতে কী বোঝ?

১০. মালাধর বসুর কাব্যে ভাগবতের কোন্ কোন্ অংশ অনূদিত হয়েছে?

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী প্রথম কে উদ্ধার করেন?

২. কৃত্তিবাসের কাব্যটি কী নামে পরিচিত?

৩. "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস"—'আদিত্যবার' শব্দের অর্থ কী?

৪. 'অঙ্গদের রায়বার'—পালাটিতে কোন্ রসের পরিচয় পাওয়া যায়?

৫. মালাধর বসু কোন্ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন?

৬. "নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবির রচিত?

৭. কাশীরাম দাসের কাব্যের নাম লেখো।

৮. মহাভারতের আদি অনুবাদকের নাম লেখো।

৯. 'ছুটিখানী মহাভারত' কে লিখেছিলেন?

১০. 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি কার লেখা?

৬.২১ গ্রন্থপঞ্জি

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫।

২. ক্ষেত্র গুপ্ত, '*বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*', গ্রন্থনিলয়, চতুর্বিংশ সংস্করণ, ২০২২।

৩. খগেন্দ্রনাথ মিত্র (সম্পা), '*মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়*', রত্নাবলী, ১৯৯০।

৪. গোপাল হালদার, '*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*', ১ম খণ্ড, প্রাচীন ও মধ্যযুগ, এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লি., ১৩৬৭।

৫. দীনেশচন্দ্র সেন, '*রামায়ণী কথা*', সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১৩১১।

৬. পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, '*সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়*', প্রাচীন ও মধ্যযুগ, জয়দুর্গা লাইব্রেরি, ১৯৮৭।

৭. ভূদেব চৌধুরী, '*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*', প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪।

৮. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*', প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫

৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস বিরচিত '*রামায়ণ*', ১৩৬৩।

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, '*মহাভারত*', ১৩৩৫।

একক-৭ ❑ পদাবলি সাহিত্যের ধারা (বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল এবং গীতিকা)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বৈষ্ণব পদাবলি: প্রাথমিক পরিচয়

৭.৪ বৈষ্ণব পদাবলি: পর্যায় বিভাগ

৭.৪.১ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা

৭.৪.২ পূর্বরাগ ও অনুরাগ

৭.৪.৩ অভিসার

৭.৪.৪ প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

৭.৪.৫ মাথুর

৭.৪.৬ ভাবসম্মিলন

৭.৪.৭ প্রার্থনা

৭.৪.৮ নিবেদন

৭.৫ বৈষ্ণব পদাবলি: কবি-পরিচিতি

৭.৫.১ প্রাক-চৈতন্য পর্বের কবি (বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস)

৭.৫.২ চৈতন্য সমকালীন পর্বের কবি

৭.৫.৩ চৈতন্যোত্তর পর্বের কবি (জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস)

৭.৬ শাক্ত পদাবলি: প্রাথমিক পরিচয়

৭.৭ শাক্ত পদাবলি: কবি পরিচিতি

৭.৭.১ রামপ্রসাদ সেন

৭.৭.২ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৭.৭.৩ অন্যান্য শাক্ত পদকর্তা

৭.৮ শাক্ত পদাবলির সমাজচিত্র

৭.৯ শাক্ত পদাবলির কাব্যমূল্য

৭.১০ বাউল গান: প্রাথমিক পরিচিতি

৭.১১ বাউল গান: কবিকথা

৭.১২ বাউল গান: কাব্যমূল্য

৭.১৩ গীতিকাসাহিত্য: প্রাথমিক পরিচিতি

৭.১৩.১ নাথ-গীতিকা
৭.১৩.২ মৈমনসিংহ গীতিকা
৭.১৩.৩ পূর্ববঙ্গগীতিকা
৭.১৪ গীতিকার বৈশিষ্ট্য
৭.১৫ সারসংক্ষেপ
৭.১৬ অনুশীলনী
৭.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারা প্রচার করা বৈষ্ণব পদাবলি পাঠের যেমন অন্যতম উদ্দেশ্য, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেম-ভক্তিবাদের গুরুত্ব, স্বরূপ, ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপও বৈষ্ণব পদাবলি নিবিড় পাঠের মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। শাক্ত পদাবলি পাঠের মধ্যে দিয়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত দেব-দেবীর সঙ্গো শিক্ষার্থীর পরিচিতি ঘটানো এবং সমকালীন ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি শাক্ত ধর্ম ও দর্শনের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মহিমা প্রকাশ করাও এই এককের লক্ষ্য। বাউল গানের মাধ্যমে দেহতত্ত্বের পরিচয়, মানবাত্মা ও পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সংযোগের দিকটি তুলে ধরা এই অধ্যায় পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭.২ প্রস্তাবনা

ষোড়শ শতাব্দীতে আখ্যানকাব্যের পাশাপাশি গীতিসাহিত্যের একটি নতুন ধারা গড়ে উঠল, যাপদাবলি সাহিত্যের ধারা নামে পরিচিত। বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল এবং গীতিকাসাহিত্য—এই ধারার প্রধান বিষয়। এই ধারাগুলি গড়ে উঠেছিল বিশেষ ধর্মসাধনার প্রেক্ষাপটে। যাদের আবেদন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না, যেগুলি মূলত ছিল গোষ্ঠীগত ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য। রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলামাধুরীকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবপদাবলির ধারা গড়ে উঠেছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাস-ব্যভিচার ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত বাঙালিজীবনে সেই প্রেম-ভক্তিবাদের প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেল এবং মাতৃদেবীর পূজার্চনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শাক্তপদাবলির নব প্রবর্তিত ধারা। শক্তিসাধনাই হয়ে উঠল এই ধারার মূল বিষয়। অন্যদিকে ঈশ্বরপ্রেমে ব্যাকুল সুফি, সহজিয়া সাধকেরা এইসময় বাউল সাধনায় নিমগ্ন হলেন। নানা গাথা-গীতিকা সাহিত্যের প্রভাবে কবিদের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তনের নিরিখে এই ধারাগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলা সাহিত্যের এই বহুমুখী সাহিত্য সংরূপের ধারা, তাদের স্বরূপ প্রসঙ্গো আমরা আলোচনা করব।

৭.৩ বৈষ্ণব পদাবলি: প্রাথমিক পরিচয়

রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব লীলারস ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নব নব ভাবে পল্লবিত হয়ে উঠল। কবিরা এক বিশেষ ধর্মীয় তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে তাদের অপূর্ব সুন্দর পদগুলি রচনা করেছিলেন। এই পদগুলির সর্বজনীন আবেদন এত গভীর যে আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য শক্তি ও সৌন্দর্যে পল্লবিত হয়ে উঠল। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণরূপের জীবন্ত বিগ্রহ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৮৬) তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণের পর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য প্রেম-ভক্তিবাদের দার্শনিক মহিমায় উন্নীত হয়। রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেম অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক রূপ লাভ করে। রাধা ও কৃষ্ণ হয়ে ওঠেন জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ। পরমাত্মার আহ্বানে সংসারের নিত্য বন্ধনকে অনায়াসে তুচ্ছ করে জীবাত্মাকে পথ নামতে হয়। জীবাত্মা-পরমাত্মার নিবিড় বন্ধনের মধ্যে দিয়েই বৈষ্ণব পদগুলি রসরূপ লাভ করে।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের মূলভিত্তি পঞ্চরস। এগুলি হল— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসে ভক্তরা ঐকান্তিক নিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করতে চান। দাস্যরসে ভগবানকে প্রভুরূপে ভক্তরা সেবা করে। সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণকে সখা বা বন্ধুভাবে সাধনা করা হয়। নিষ্ঠা, সেবা ও বিশ্বাস-আদর্শ সখ্যের প্রধান লক্ষণ। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম এই রসেই কৃষ্ণভজনা করেছেন। বাৎসল্যরসে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে এখানে পাল্য ও পালক সম্পর্ক। ভগবান সন্তান, ভক্ত তার পিতা-মাতা। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের মমত্ব এখানে অনেক বেশি। যশোদা ও নন্দ সন্তানরূপে দেখেছে কৃষ্ণকে। শাসন, তর্জন-গর্জন এই রসে দেখা যায়। যাদবেন্দ্র দাসের পদে সেই সুর ধ্বনিত হয়—

"আমার শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।।"

মধুররসে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক মধুর। ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে মধুর রসই পঞ্চরসের শ্রেষ্ঠ রস। এর প্রধান গুণ কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, সৌহার্দ্য, পালন ও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন।

৭.৪ বৈষ্ণব পদাবলি: পর্যায় বিভাগ

একাধিক পর্যায় পরম্পরায় বৈষ্ণব সাহিত্য রসোৎকর্ষ লাভ করেছে। এগুলির মধ্যে, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা, পূর্বরাগ ও অনুরাগ, অভিসার, প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, প্রার্থনা, নিবেদন প্রভৃতি পর্যায়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭.৪.১ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা : ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবলীলাকে কেন্দ্র করে ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি রচনা করেছিলেন।

গৌরচন্দ্রিকার পদে রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবমাধুরী ভক্তদের মনের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কীর্তনগানের গোড়াতে মুখবন্ধস্বরূপ এই পদগুলি গাওয়া হয়।

৭.৪.২ পূর্বরাগ ও অনুরাগ : বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণ লীলারসের একটি বিশেষ পর্যায় পূর্বরাগ। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জীবগোস্বামী বলেছেন—

"রতির্যা সঙ্গামাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ যে রতি মিলনের পূর্বে দর্শন-শ্রবণাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের হৃদয়কে উন্মীলিত করে তাকেই বলা হয় পূর্বরাগ। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ের বহু পদ লেখা হয়েছে। কৃষ্ণের নাম শ্রবণেই রাধার হৃদয়ে জেগে উঠেছে পূর্বরাগ। ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে রাধা। কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য সে আকুল। তার আকুলতার চিত্র এঁকেছেন চণ্ডীদাস—

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

পূর্বরাগের পদ রচনায় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ কবিদের পদগুলি উৎকর্ষতার স্বাক্ষর বহন করে।

৭.৪.৩ অভিসার : বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের নাম অভিসার। প্রিয় মিলনের উদ্দেশ্যে সংকেতকুঞ্জের পথে গমনকে অভিসার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"যাভিসরতে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
যা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যাবেশাভিসারিকা।।"

অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস। তাঁর পদে দেখি—

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।"

পথের বাধাকে রাধা অনায়াসেই এড়িয়ে চলে। বর্ষার দুর্যোগ, রাতের অন্ধকার কোনোকিছুই তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

৭.৪.৪ প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ : বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। 'বৈচিত্র্য' শব্দের চিত্তব্যাকুলতা। 'প্রেমবৈচিত্ত্য' প্রেমের এমন এক বিশিষ্ট রসাস্বাদন, যার মধ্যে একই সাথে প্রকাশ পায় মিলনের আনন্দ এবং বিরহের যন্ত্রণা। প্রেমের উৎকর্ষতাবশত প্রিয়ের সন্নিধানে

থেকেও তাঁর সঙ্গো বিচ্ছেদ ভয়ে যে বেদনার উপলব্ধি তাকেই বলা হয় 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। চণ্ডীদাসের পদে, "আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া"। আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের অতি নিকটে থেকেও পরস্পর বিচ্ছেদ ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েন। একেই বলে প্রেমবৈচিত্র্য। মিলন বা সম্ভোগের মধ্যে এখানে বিপরীত রসের ছায়াপাত ঘটে। মিলনেও বিরহের যন্ত্রণা অনুভব করেন রাধা-কৃষ্ণ। রাধার প্রেমবৈচিত্ত্য পর্যায়ের পদ, "দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। অন্যদিকে কৃষ্ণবিরহে রাধার হৃদয়জুড়ে যে আক্ষেপ তাকে আক্ষেপানুরাগ বলা হয়। এটি প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি বিশেষ পর্যায়।

৭.৪.৫ মাথুর : শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে রাধার হৃদয়ে তথা সমগ্র বৃন্দাবন জুড়ে যে অনন্তশূন্যতা সৃষ্টি হয় তা-ই মাথুর পর্যায়ের বিষয়। নিঃস্ব, রিক্ত রাধা এই পর্যায়ে মর্মন্তুদ বেদনায় ভেঙে পড়ে। বিদ্যাপতি এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তাঁর লেখায় পাই—

"এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

'মাথুর' পর্যায়ের সঙ্গো জড়িয়ে আছে বিপ্রলম্ভের সুর। চিরবিরহের বালুকাবেলায় রাধার অন্তহীন কান্নাই এই পর্যায়ের পদগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

৭.৪.৬ ভাবসম্মিলন : 'ভাবসম্মিলন' অর্থে অন্তরের বা ভাবলোকের সম্মেলন। কংস দমনের উদ্দেশ্যে রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ চিরতরে মথুরায় চলে গেছেন। এই সময় বিরহ যন্ত্রণার আবেশে রাধা মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করছেন। রাধার ভাবলোকে তখন যে নিত্যমিলন তাই 'ভাবসম্মিলন' নামে খ্যাত। ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন সংক্রান্ত পদরচনায় বিদ্যাপতির অপরিসীম শ্রেষ্ঠত্ব। ভাবাবেশে বিহ্বল রাধা কৃষ্ণকে দেখেছে তার অন্তরে। এতেই তার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই কবি বলেন—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ।
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।।"

৭.৪.৭ প্রার্থনা : বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে 'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদগুলি কবির আত্মদোষত্রুটির স্বীকৃতিমূলক পদ। কবি নিজের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি স্বীকার করে ভবসিন্ধু পার হওয়ার জন্য কৃষ্ণের কাছে মিনতি জানান। 'প্রার্থনা' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁর একটি পদে—

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"

প্রাক্-চৈতন্যোত্তর পর্বে 'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদগুলি লেখা হয়েছিল। সেইসময় বৈষ্ণব কবিদের রচিত পদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময়সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। ভগবানের শ্রীচরণে কবি আত্মসর্মপণ করেছিলেন। এই পর্যায়ের পদ

রচনাতে বিদ্যাপতির অতুলনীয় কবিকৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'প্রার্থনা'-পর্যায়ের পদে—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলু
অব মঝু হব কোন কাজে।।"

৭.৪.৮ **'নিবেদন'** : 'নিবেদন' পর্যায়ের পদেও কবি নিঃশেষে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। 'প্রার্থনা' পর্যায়ের মতো কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব এখানে অনুপস্থিত। কৃষ্ণ এখানে প্রাণপ্রিয় সখা। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁর পদে দেখি—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।"

৭.৫ বৈষ্ণব পদাবলী: কবি-পরিচিতি

৭.৫.১ প্রাক্-চৈতন্য পর্বের কবি

বিদ্যাপতি : পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা বিদ্যাপতি। বিহারের মিথিলায় মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফি গ্রামে এক বিদগ্ধ শৈব ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁদের পারিবারিক উপাধি ছিল ঠক্কর বা ঠাকুর। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদরচনা করে তিনি অপরিসীম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। প্রাক্-চৈতন্যপর্বে মিথিলায় পাঠরত ছাত্রদের মুখে মুখে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি। বিদ্যাপতির পদে রাধা চরিত্রটি ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে। পদগুলিতে রাধাচরিত্র নির্মাণে কবি রীতিমতো পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। আলংকারিকতায়, ভাষার দৃঢ়তায় বিদ্যাপতি ছিলেন অনন্য। যে কারণে শ্রীচৈতন্যদেবও ছিলেন বিদ্যাপতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।"

'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি রাধার প্রেমোন্মেষ থেকে পরিণতি পর্যন্ত বিবর্তনের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রেখা চিত্রিত করেছেন। 'বয়ঃসন্ধি' পর্যায়ের পদে দেখি—

"খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন ধূলি তনুভরঈ।।
খনে খনে দশন ছটা ছুট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস।।"

বিদ্যাপতির রাধা 'মাথুর' পর্যায়ের পদে অন্তহীন বেদনায় ভেঙে পড়েছে। এই পর্যায়ের পদে তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ।

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।।"

রাধার বিরহের শূন্যতা বিদ্যাপতির রচনায় অসাধারণ রসনিষ্পত্তি লাভ করেছে—

"এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

ভাব-ভাষা-ছন্দে বিদ্যাপতির দক্ষতা প্রশ্নাতীত। রূপতন্ময় রাধিকার বিরহক্ষীণা মূর্তি অঙ্কনে, ব্রজবুলি শব্দসৃজনে বাংলার কবিগোষ্ঠীকে তিনি আকৃষ্ট করেছেন। ষোড়শ শতকে কেবল গোবিন্দদাসই 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নাম গ্রহণ করেননি, উনিশ শতকের সত্তরের দশকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আপ্লুতচিত্তে নির্মাণ করেছেন, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত, বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢলঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি।... আপনাকে আধখানা প্রকাশ এক আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে।"

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদ রচনায় প্রাক্-চৈতন্য পর্বে চণ্ডীদাস ছিলেন একজন প্রতিভাশালী কবি। তিনি সহজ ভাবের ও সহজ ভাষার কবি। তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলারসের পদগুলি স্বয়ং মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।।"

তাঁর ব্যক্তি পরিচিতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন বাশুলি বা দেবী চণ্ডীর উপাসক। রামী নামক তাঁর একজন সাধনসঙ্গিনী ছিল। তাঁর রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদে রাধার আকুলতা ও কৃষ্ণাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে যোগিনীবেশে কৃষ্ণকাজল মেঘের দিকে রাধা ধ্যানতন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ভাবে বিভোর রাধার মুখে কোনো কথা নেই। তার এই বিরহবিধুর যোগিনীমূর্তি নির্মাণে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়। বাহ্যজগৎ সম্পর্কে সে উদাসীন, একান্ত আত্মমগ্ন। চণ্ডীদাস লিখেছেন—

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।"

'ভাবসম্মিলন' বা 'নিবেদন' পর্যায়ের পদগুলিও চণ্ডীদাসের কবিকৃতিত্বের অসাধারণ স্বাক্ষর বহন করে। ভাষার সারল্যে আর ব্যঞ্জনা পারিপাট্যে তা কালজয়ী অমরত্ব অর্জন করেছে। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাসের রাধার অনুভূতি, "দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"— স্বয়ং মহাপ্রভুর চিত্তকেও স্পর্শ করেছিল।

প্রায় সমকালীন কবি হলেও বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার কবি। তাঁর পদে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, অলংকারের পারিপাট্য ফুটে উঠেছে। চণ্ডীদাসের পদগুলিতে গ্রামীণ সরলতা ও নিবিড় ব্যঞ্জনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে যে আনন্দ-উল্লাস, তার কণামাত্র চণ্ডীদাসে নেই। তাঁর রাধার গভীর বেদনা অপার্থিব রূপ ধারণ করেছে। এইকারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।"

৭.৫.২ চৈতন্য সমকালীন পর্বের কবি : চৈতন্য সমকালীন পর্বে বৈষ্ণব পদ রচনায় যে সমস্ত কবি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেবের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের বর্ণনা এইসমস্ত পদকর্তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে।

৭.৫.৩ চৈতন্যোত্তর পর্বের কবি

জ্ঞানদাস : চৈতন্যোত্তর পর্বে বৈষ্ণব পদ রচনায় যে সমস্ত কবি পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অপরিসীম। চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য হিসাবে তাঁর পরিচিতি। রাধাকৃষ্ণের অধ্যাত্মলীলাকে নিয়ে রচিত তাঁর পদগুলি রোমান্টিক পর্যায়ে উন্নীত। বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে ১৫৩০ সালে ব্রাহ্মণ বংশে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষভাগে অনুষ্ঠিত খেতুরীর মহোৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় তিনি অসংখ্য বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন। জ্ঞানদাস রূপদক্ষ কবি। পূর্বরাগ পর্যায়ের পদে কৃষ্ণের রূপ দেখে রাধা তন্ময় হয়ে উঠেছে। জ্ঞানদাস লিখেছেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।"

কিংবা,

"দেইখ্যা আইলাম তারে সই দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।।"

'পূর্বরাগ' পর্যায়ের পদে জ্ঞানদাসের বর্ণনা রোমান্টিক সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।"

'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের পদে জ্ঞানদাসের পদগুলি আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জ্ঞানদাস যখন লেখেন—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল,
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।"

রূপের আতিশয্য বর্ণনায় তিনি যে উৎকর্ষতা দেখিয়েছিলেন, বেদনার গভীরতা তাঁর পদগুলিতে সেভাবে উঠে আসেনি। তবে কল্পনার বিস্তারে, গীতিময়তায়, রোমান্টিকতা সঞ্চারে তাঁর পদগুলি আবেগঘন রূপলাভ করেছে।

গোবিন্দদাস : শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর ১৫৩৭ সালে কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে তিনি পরম বৈষ্ণব রূপে খ্যাত হন। তাঁর পিতা চিরঞ্জীব সেন ও মাতা সুনন্দা দেবী। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করায় চৈতন্যদেবের কৃপালাভে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তিনি লিখেছেন—

"তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর।।"

কিংবা, অন্য ভনিতায় জানিয়েছেন—

"প্রেমধনের ধনী করল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস।।"

চৈতন্যবিষয়ক পদ রচনায় গোবিন্দদাস কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীচৈতন্যের যে রূপ তিনি নির্মাণ করেছিলেন তা এককথায় অভিনব।

"অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর।।"

গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পী। যুক্তবর্ণ, শব্দালংকারের ব্যবহারে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

তিনি ধীর, শান্তভাবে উপাস্য দেবতাকে অন্তরে আশ্রয় দিয়েছেন, আবেগে কখনোই আত্মহারা হননি। তাঁর রূপানুরাগ পর্যায়ের পদেও শিল্পীত্বের স্বাক্ষর মেলে—

"যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই।।"

অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। তাঁর রাধা গভীর কৃষ্ণসাধনায় রত। পথের ভয়, সমাজ, লোকলজ্জা সবকিছু থেকে রাধা নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁর পদে পাই—

"কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"

'অভিসার' ছাড়াও 'খণ্ডিতা' ও 'কলহান্তরিতা' পর্যায়ের পদরচনাতেও গোবিন্দদাসের কৃতিত্বের স্বাক্ষর মুদ্রিত হয়েছে। তিনি আঙ্গিক সচেতন শিল্পী। ভাবসাদৃশ্যে, শিল্পাদর্শে তাঁর পদাবলিতে বিদ্যাপতির ছাপ সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতির ভাব, ভাষা ও ব্রজবুলির শব্দমাধুর্যের নিবিড় সাদৃশ্য থাকায় গোবিন্দদাস 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে বলরাম দাস বাৎসল্য পদ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়াও রায়শেখর, রায়বসন্ত, কবিরঞ্জন, জগদানন্দ, গোপাল দাস, ঘনশ্যাম দাস প্রমুখ কবিরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। এই পর্বে বেশ কিছু মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এঁদের মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ, আলীরাজা প্রমুখের নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

শাক্ত পদাবলি

৭.৬ শাক্ত পদাবলি : প্রাথমিক পরিচয়

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজশক্তির দুর্বলতায় এবং বৈষ্ণব ধর্মের চরম অবক্ষয়ের মধ্যে মানুষ কোথাও এতটুকু আশ্রয় খুঁজে পায়নি। বৈষ্ণবধর্মের পরিবর্তে শক্তিময়ী দেবী কালিকাই হয়ে উঠেছিল মানুষের আশ্রয় তথা বরাভয়দাত্রী। দেবতা হয়ে উঠল মানুষের একান্ত আপনজন। এইসময় দৈবী চরিত্রের ঐশ্বর্যভাব ম্লান হল, পরিবর্তে দৈবী চরিত্রের মানবায়ন হয়ে উঠল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য বৈশিষ্ট্য। দেবাদিদেব মহাদেব, মাতা মেনকা, কন্যা উমাকে নিয়ে সাধারণ গৃহীজীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা হল শাক্তপদাবলির নতুন ধারা, লেখা হল বাৎসল্যরসের অপূর্বপদাবলি। কন্যা অদর্শনে ব্যাকুল মাতা মেনকা মর্ত্যজীবনের দৈনন্দিন লোকাচার

যেমন মানলেন, তেমনি বাঙালি মাতা-কন্যার সঙ্গে একাকার হয়ে গেলেন। পদগুলি হয়ে উঠল বাঙালি গার্হস্থ্যজীবনের অমূল্য সম্পদ।

শাক্তপদাবলির যে অংশটি 'উমাসঙ্গীত' বা 'আগমনী-বিজয়া'-র গান বলে পরিচিত, সেখানে একটি ঘরোয়া কাহিনি এবং কয়েকটি চরিত্র বর্তমান। 'আগমনী' গানগুলিতে পিতৃগৃহে কন্যার আগমন উপলক্ষ্যে মায়ের দুশ্চিন্তা ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। গিরিরাজের কাছে মাতা মেনকার অনুযোগ, আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা ও আনন্দময়তা এই পর্যায়ের মুখ্য বিষয়। 'বিজয়া' পর্যায়ের গানগুলিতে কন্যার পতিগৃহে যাত্রা উপলক্ষ্যে মায়ের বেদনা ও আশঙ্কা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক হলেও সমসাময়িক যুগ ও জীবনের একটি বিশ্বাসযোগ্য আলেখ্যের পরিচয় এতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, শাক্তপদাবলির 'শ্যামাসঙ্গীত' অংশের দুটি বিভাগ 'জগজ্জননীর রূপ' এবং 'ভক্তের আকুতি'। 'জগজ্জননীর রূপ' একান্তভাবেই বস্তুনিষ্ঠ, সেখানে মাতৃশক্তির রূপ চিত্রিত হয়েছে। 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে ভক্তবৃন্দের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মাতৃসাধনার প্রেক্ষাপটে ভক্তহৃদয়ের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

৭.৭ শাক্ত পদাবলি: কবি-পরিচিতি

৭.৭.১ রামপ্রসাদ সেন : শাক্ত পদকর্তা হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন কবি রামপ্রসাদ সেন। আনুমানিক ১৭২০-২১ সালে হালিশহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম রামরাম সেন। পিতার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই কবি বিষয়কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কলকাতার এক ধনাঢ্য জমিদারের সেরেস্তায় কবি মুহুরির কাজ করতেন। অল্প বয়সেই তিনি শাক্তধর্মে দীক্ষিত হন। শাক্ত সংগীত ছিল কবির অতি প্রিয়। কাজ করার সময় মুহুরির খাতায় আপনমনে ভক্তিভাবে ভাবুক কবি লিখেছিলেন, "আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নেমকহারাম নই মা শঙ্করী।" রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও কবিকে জমিজমা ও বৃত্তি দিয়ে কাব্যচর্চা ও সাধনচর্চায় মগ্ন থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কবির কাব্যচর্চায় প্রীত হয়ে তিনি তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন তন্ত্রসাধক, শ্যামামায়ের ভক্ত। পঞ্চ 'ম'-কার সাধনাতেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দর', 'কৃষ্ণকীর্তন' প্রভৃতি কাব্য তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ভক্তিরসাত্মক শ্যামাসংগীতগুলি। প্রায় তিন শতাধিক শ্যামাসংগীত তিনি রচনা করেছিলেন। গানগুলিতে আগমনী, বিজয়া, শ্যামাজননীর বিরাটত্বের স্বরূপ, নীতিকথা ও তন্ত্রসাধনার নানা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

'আগমনী ও বিজয়া' পর্যায়ের গানে রাজাধিরাজ ছিলেন ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন। তাঁর এই পর্যায়ের গানে দেখি—

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।"

আবেগদীপ্ত ভাবে, সহজ-সরল ভাষায় ও প্রাণঢালা সুরে রচিত তাঁর গানগুলি 'প্রসাদি সংগীত' রূপে পরিচিত।

রামপ্রসাদের গান তত্ত্বপ্রধান। কিন্তু দুর্বোধ্য তত্ত্বের মধ্যে কাব্যকে তিনি আচ্ছন্ন করেননি। উপমা ও রূপকের প্রয়োগের বিশিস্টতার মধ্যে দিয়ে রচিত তাঁর গানগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। মায়ের কাছে তাই আকুতি করে বলেছেন—

"মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।।
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত।।"

এভাবেই সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সহজ গীতিরসের সুরে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দিয়েছেন রামপ্রসাদ সেন।

৭.৭.২ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সাধক কবি কমলাকান্ত। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের কবি কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশত শাক্তগান পাওয়া গেছে। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর। মাতার নাম মহামায়া। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পর তিনি মামার বাড়িতে চলে আসেন। সেখানেই সাধক কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে কবি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমানরাজ তেজশচন্দ্র তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন। কমলাকান্ত একাধারে ছিলেন শাক্তসাধক-কবি ও শিল্পী। শ্যামামায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, আত্মনিবেদনের সুর তাঁর শাক্তগানগুলিতে শোনা যায়। আগমনী ও বিজয়া পর্বের গানগুলিতে মাতৃহৃদয়ের বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলাচলতা ফুটে উঠেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে।

কমলাকান্তের 'আগমনী' পর্যায়ের গানে মায়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘদিন মেয়ে উমাকে তিনি দেখেননি। মেয়ে সম্পর্কে মায়ের মনে নানা ভাবনাচিন্তা, আকাঙ্ক্ষা ও সংশয়ের দোলাচলতা ফুটে উঠেছে। এর ওপর স্বপ্নে মেয়েকে দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়েন মাতা মেনকা—

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে
গিরিরাজ অচেতনে কত না ঘুমাও হে।"

সংশয় যত বাড়ে স্বামীকে ততই অনুযোগ করতে থাকে মাতা মেনকা—

"কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।।"

'বিজয়া'-পর্যায়ের পদে মায়ের যন্ত্রণা-বেদনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। নবমী নিশি পেরলেই পতিগৃহে কন্যাকে চলে যেতে হবে। কোল শূন্য হয়ে গেলে ব্যথা-বেদনায়-হাহাকারে ভেঙে পড়েছেন মাতা মেনকা। নবমী নিশির কাছে তাঁর আর্জি—

"ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।।"

আখ্যানধর্মিতা ও নাটকীয়তায় কমলাকান্তের পদগুলিতে অসামান্য উৎকর্ষতা ফুটে উঠেছে। শাক্ত পদকর্তারূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও কমলাকান্ত ছিলেন সাধক, তান্ত্রিক ভাবের কবি। তাঁর সাধনা দেহতত্ত্বের সাধনা। ষড়রিপুর বাধা অতিক্রম করে তিনি সাধনমার্গে নিয়োজিত থেকেছেন। তাই তিনি লিখেছেন—

"মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে।।"

৭.৭.৩ অন্যান্য শাক্ত পদকর্তা : শাক্ত পদকর্তা হিসেবে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের কবিখ্যাতি অন্যান্যদের না থাকলেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে শাক্তগান রচনায় অনেকেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে গোবিন্দ চৌধুরী, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নন্দকুমার, রঘুনাথ রায়, রাম বসু প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭.৮ শাক্ত পদাবলির সমাজচিত্র

ধর্মজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত শাক্তপদাবলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনের চিত্র অত্যন্ত বাস্তব রূপে ধরা পড়েছে। 'আগমনী-বিজয়া'-র গানে মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহস্থ ঘরের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কাহিনির মূল চরিত্র মেনকা কন্যাবিচ্ছেদ কাতরা, হতভাগিনী, স্নেহময়ী এক বঙ্গজননী, যিনি সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুর বিধি বিধানের শিকার। তাই গিরিরানি হয়েও তাঁকে গৌরীদান প্রথা মানতে হয় এবং এই সূত্রে তিনি নিজের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা উমাকে চালচুলোহীন, অশীতিপর এক নেশাখোর বৃদ্ধের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। বিবাহের পর কন্যার ওপর মায়ের কোনো অধিকার বা দাবি থাকে না। বিবাহের পর সাধারণত বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া কন্যারা পিতৃগৃহে আসার সুযোগ পেত না। কন্যা-জামাতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কন্যাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতেন কন্যার পিতা। স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রী-র পক্ষে পিতৃগৃহে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই গিরিরাজ কৈলাসে গিয়ে উমাকে নিয়ে আসতে চাইলে উমা স্বামীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন—

"গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর, কর অনুমতি হর,
যাইতে জনক-ভবনে।"

সেইসময় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই মানসিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও অনেকেই নিজের কন্যাকে সতীনের ঘরেই তুলে দিতেন। যদিও উমা বলেছে—

"শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা
তোমার অধিক ভালোবাসে সুরধনী।"

কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ ইত্যাদি নানা সামাজিক প্রথা ও সংস্কারে সমাজ জর্জরিত ছিল। নারীদের জীবনে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাই মাতা মেনকাকে বলতে হয়—

"কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।"

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নগ্ন চেহারা শাক্ত পদগুলিতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। দুঃখ-দুর্দশা আর অস্থিরতার মধ্যে নারীজীবনের বিষময় চেহারা রামপ্রসাদের পদে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

> "আমি কি দুঃখেরে ডরাই
> দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও দেখি ভাই।"

'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের শাক্ত পদগুলিতে সমসাময়িক সমাজের অবক্ষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলার নবাবের মসনদ নিয়ে আমীর-ওমরাহ্রা পরস্পর শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির গূঢ় অভিসন্ধি মেটাতে তৎপর হয়ে উঠেছিল ইংরেজ বণিকের দল। অন্যদিকে বর্গী হামলায় বাংলার কৃষিজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গো সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তবু মা-কে উদ্দেশ্য করে সন্তানের প্রতি বাৎসল্যের ছবি 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ে ধরা পড়েছে। তৎকালীন জনজীবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেছেন—

> "অষ্টাদশ শতকের বাংলা দেশের এই বিপর্যস্ত সমাজজীবনের শ্মশানেই শাক্ততান্ত্রিক সাধক তাঁর পঞ্চমুণ্ডীর সাধনপীঠ রচনা করেছিলেন। শাক্তপদাবলীর উপমার জগৎ শ্মশান বাংলার ছবিটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে।"

৭.৯ শাক্ত পদাবলির কাব্যমূল্য

অষ্টাদশ শতকের চূড়ান্ত উৎকেন্দ্রিকতা, অস্থিরতার মধ্যে রচিত হলেও শাক্ত পদগুলির কাব্যিক উৎকর্ষতাও কম ছিল না। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত শাক্তসাধক হলেও তাঁদের ভাষা প্রয়োগ ঘরোয়া জীবন থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বর্গীয় কাহিনিকে তারা একান্ত মানবিক রূপদান করেছেন। মাতা মেনকা যখন বলেন, "কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে" কিংবা "এবার মায়েঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না" তখন মাতা মেনকা সাধারণ লোকমাতা রূপে সাধারণ পল্লীজীবনের সঙ্গো মিশে যান। ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে 'পাকা ধানে মই', 'কলুর চোখ ঢাকা বলদ', 'ভূতের বেগার' ইত্যাদি প্রবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাষাকে জীবন্ত রূপ দেওয়ার জন্য উপমা, রূপক ইত্যাদি অলংকার প্রয়োগ করা হয়েছে। বিজয়া পর্যায়ের পদে নবমী নিশির বিদায় দৃশ্যটিতে মাতা মেনকার করুণ আর্তি অপরূপ নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদগুলি গীতিকাব্যের সুরে আবেগময় হয়ে উঠেছে। যেমন, রামপ্রসাদ সেন যখন লেখেন—

> "মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
> ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল।"

মায়ের প্রবঞ্চনা ও সন্তানের অভিমান এখানে অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

বাউল গান

৭.১০ বাউল গান: প্রাথমিক পরিচিতি

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদল রহস্যবাদী সাধক সম্প্রদায় উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শ ও সাধনার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। এই সম্প্রদায় 'বাউল সম্প্রদায়' নামে পরিচিত এবং এদের রচিত গানগুলি 'বাউলগান' নামে পরিচিত। যদিও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ষোড়শ শতকের শেষ পাদে বাউল গানের উৎপত্তি বলে মনে করে থাকেন। বাউল শব্দের উৎস নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন, এর উৎস 'বাতুল' বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকে। ঈশ্বরপ্রেমে যারা পাগল তারাই বাউল। আবার কারও মতে আরবি শব্দ (আউর) 'আউল' থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। এই 'আউল' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের একান্ত সাধক। আবার অনেকের মতে, 'বাউল' একটি হিন্দি শব্দ। অর্থাৎ যিনি 'বায়ুরোগগ্রস্ত' তা থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। এককথায় বলা যায়, বাউল সম্প্রদায় ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা একদল ভক্ত সাধক সম্প্রদায়। এরা জাতি-সম্প্রদায়-শাস্ত্রাচারের গণ্ডীমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কাঙাল হরিনাথ হলেন বাউল গানের আদিগুরু। তবে লালন ফকিরের গানের মাধ্যমে বাউল গান জনপ্রিয় হয়। তবে বাউল গানের প্রসারে রবীন্দ্রনাথের অবদানও কম নয়। বাউল সাধকেরা মনে করেন দেহের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে দেহভাণ্ডে'। তাই দেহের মধ্যেই তাঁরা অনন্ত অসীমকে বা দেহাতীতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মানবদেহের মধ্যেই তারা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ কল্পনা করেছেন।

৭.১১ বাউল গান: কবিকথা

❍ **লালন ফকির :** প্রাচীন বাউল সাধকের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যের বড়ো অভাব। বাউল সংগীতকারদের মধ্যে লালন ফকির, পাঞ্জু শাহ্, সিরাজ সাঁই প্রমুখের নাম বিখ্যাত। এরা প্রত্যেকেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এদের মধ্যে লালন ফকিরের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। নদীয়ার কুষ্ঠিয়ার কুমারখালি গ্রামের কাছে ভাঁড়রা গ্রামে আনুমানিক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪-৭৫) এক হিন্দু কায়স্থের ঘরে লালন ফকিরের জন্ম হয়। এই লালন ফকির বিবাহের পর পুরীভ্রমণের পথে নিদারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গীসাথী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এইসময় ফকির সিরাজ সাঁই এবং তার স্ত্রী মুমূর্ষু লালনকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। মুসলমানের কাছে আশ্রয় ও খাদ্যগ্রহণের অপরাধে গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করে। বাধ্য হয়েই তিনি ফকির সিরাজ সাঁইয়ের কাছে ফিরে যান এবং বাউল ধর্মে দীক্ষা নেন। এইসময় তিনি লালন ফকির বলে পরিচিত হন। এইকারণেই তিনি প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। মানবধর্মই ছিল তার ধর্ম, তার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির দীক্ষা। তাঁর গানে পাই—

"সব লোকে কয়, লালন কি জাত, সংসারে?
লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।"

লালনের গান সারা পূর্ববঙ্গো বিখ্যাত ছিল। হিন্দু-মুসলমান বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তিনি সম্ভবত দীর্ঘজীবী ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লালন ফকির দেহত্যাগ করেন। লালনের গানগুলির অকৃত্রিম আবেদন কবিগুরুকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি তাঁর গানগুলি সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রায় সাড়ে চারশোর বেশি গান মুদ্রিত হয়।

গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মনের মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে।"

এছাড়াও দেহতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলিকে তিনি গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। যেগুলি কেবল গান বা তত্ত্বকথাই নয়, বিশুদ্ধ কাব্যরসের উপাদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন—

"খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কমনে আইসে যায়,
(আমি) ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়,
চিরকালটা পুষলেম পাখি
বুঝলেম না তার ফাঁকিজুঁকি
দুধ কলা দিই খায়রে পাখি তবু ভোলে না তায়।"

লালনের গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের কথা শুনিয়েছেন। তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাকে 'Prophet of Humanity' বলে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে লালন ফকিরের মতোই বহু বাউল সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। এরা প্রত্যেকেই উচ্চমার্গের সাধক ছিলেন। এঁদের মধ্যে গগন হরকরা, হাসন রাজা চৌধুরী, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, চণ্ডীদাস গোঁসাই, মদন বাউল প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭.১২ বাউল গান : কাব্যমূল্য

বাউল গানগুলি মূলত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষদের রচনা। ভাবের বিন্যাস, ভাষার পরিমার্জনা বা সচেতন অলঙ্করণের চেষ্টা সেখানে নেই। বাউল সাধকদের ভাবানুভূতি, নিরলঙ্করণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাউল গানের সৌন্দর্য। পরমাত্মার খোঁজে বাউলদের নিরন্তর যে ভাবনা গানগুলিতে তার শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশিনগর,
সেথায় এক পড়শি বসত করে।"

গ্রাম্যজীবনের দৈনন্দিন বিষয়গুলোর মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। এইরকম বেশ কিছু রূপক জাতীয় শব্দ ‘পড়শি’, ‘চাবি’, ‘অচিন পাখি’, ‘পাঁচ ভূত’ ইত্যাদি। এছাড়াও বেশ কিছু দেশজ শব্দ ‘জেলে’, ‘দড়া’, ‘মিছরি’, ‘গুগলি’, ‘ঘোঙা’ ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষণীয়। হিন্দু পুরাণ থেকে গৃহীত বেশ কিছু শব্দ ‘রাম’, ‘হনুমান’, ‘গঙ্গা’, ‘হরি’, ‘বেদ-বেদান্ত’, ‘শ্মশান’, ‘বামুন’, ‘পইতা’ ইত্যাদি; মুসলমান ঐতিহ্য থেকে বেছে নেওয়া শব্দ ‘সাঁই’, ‘আসমান’, ‘ব্যঞ্জনা’, ‘সুন্নত’, ‘তসবি’, ‘মোকাম’ ইত্যাদি শব্দ বাউল গানে ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি ‘আইন-আদালত’, ‘রেলগাড়ি’, ‘হাসপাতাল’ প্রভৃতি আধুনিক শব্দও তিনি গ্রহণ করেছেন। সহজ-সরল অন্ত্যমিলপ্রধান মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে বাউল গানগুলি অসাধারণ কাব্যিক উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

গীতিকা সাহিত্য

৭.১৩ গীতিকা সাহিত্য: প্রাথমিক পরিচিতি

অষ্টাদশ শতকে প্রবল রাস্ট্রিক বিপর্যয়ের মধ্যে দেববাদের প্রভাব যেমন অপসৃত হল তেমনি শুভ মানবিক বোধবুদ্ধির উদয় হল। এই পর্যায়ে লোকজীবনের ব্যক্তিগত কাহিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হল। গীতিকা বলতে বোঝায় কাহিনিবন্ধ বা আখ্যানধর্মী লোকসংগীত। মানুষের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা ছবি গীতিকা সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হল। পাশাপাশি সমসাময়িক পরিবর্তিত জীবনরসের নানা উপাদান, নারীদের কথা গীতিকাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। গীতিধর্মিতা, নাটকীয়তা, আখ্যান, কাব্যরস গীতিকাগুলির প্রধান অঙ্গ। এইসময় বাংলা গীতিকার তিনটি ধারা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়— (১) নাথ-গীতিকা, (২) মৈমনসিংহ গীতিকা ও (৩) পূর্ববঙ্গ গীতিকা। অষ্টাদশ শতকের লোকসাহিত্য চর্চায় গীতিকাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.১৩.১ নাথ-গীতিকা : উত্তরবঙ্গের নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় তত্ত্বভিত্তিক রচনা নাথ-গীতিকা। এই নাথ-গীতিকার দুটি প্রধান ভাগ আছে। একটি নাথগুরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি আর একটি তরুণ রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনি। প্রথম ভাগটিকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত যে সকল গীতিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা ‘গোরক্ষবিজয়’, বা ‘মীনচেতন’ নামে পরিচিত। এই অংশে সিদ্ধগুরু মীননাথ রমণীর মোহে আবদ্ধ হয়ে সাধন ভজন জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। গোরক্ষনাথ তাঁর গুরু মীননাথকে ইন্দ্রিয়াসক্তির হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

আর দ্বিতীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত গীতিকাগুলি ‘মানিকচন্দ্র রাজার গান’, ‘গোবিন্দচন্দ্রের গীত’, ‘ময়নামতীর গান’, ‘গোপীচাঁদের সন্ন্যাস’, ‘গোপীচাঁদের পাঁচালী’ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত। রাজা মানিক ও রানি ময়নামতীর সন্তান গোপীচন্দ্র। ডাকসিদ্ধা রানি ময়নামতী ছেলে গোপীচন্দ্রকে বিয়ে দেবার পর বুঝলেন যে, ছেলেকে কিছুদিন সন্ন্যাসব্রত না পালন করালে ছেলেকে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি ছেলেকে

হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলেন। এতে গোপীচন্দ্র প্রতিবাদ করে ওঠে। নববিবাহিতা দুই স্ত্রী অদুনা ও পদুনাকে ছেড়ে সে কিছুতেই হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত মায়ের নির্দেশ গোপীচন্দ্রকে মানতে হল। যদিও সে বারবার ভোগবাসনায় মোহিত হয়েছে এবং রমণী সঙ্গসুধা পেতে চেয়েছিল। হাড়িপা চরিত্রটি বীভৎস। গোরক্ষনাথের মধ্যে ব্রহ্মচর্য রক্ষার নিষ্ঠা থাকলেও হাড়িপা-র মধ্যে তা ছিল না।

'ময়নামতীর গান'-গুলি রূপকথার নানা উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সন্ন্যাসজীবনের কথা প্রচারিত হলেও গৃহীজীবনের নানা উপাদানে গানগুলি পূর্ণ ছিল। নাথ-গীতিকাগুলি প্রধানত উত্তরবঙ্গেই প্রসার লাভ করেছিল, সেখানে এটি 'যুগীযাত্রা' নামে পরিচিত। লোকজীবনের উপাদান থাকায় অনেকে এগুলিকে 'Ballad' নামে চিহ্নিত করেছেন।

'গোরক্ষবিজয়' ও 'ময়নামতীর গান'-এর প্রথম যে পুথিগুলি উদ্ধার করা হয় সেগুলি অষ্টাদশ শতকে রচিত। 'গোরক্ষবিজয়'-এর প্রাচীন পুথি ১৭৭৮ সালে রচিত সহদেব চক্রবর্তী ও দ্বিজ লক্ষ্মণের 'অনিল পুরাণ' গ্রন্থ। 'ময়নামতীর গান'-এর যে প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, তার রচনাকাল ১৭৯৯ সাল। রচনাকার কবি দুর্লভ মল্লিক, অন্যান্য কবিদের মধ্যে ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ-এর নাম উল্লেখ্য।

৭.১৩.২ মৈমনসিংহ গীতিকা : মৈমনসিংহ গীতিকাগুলি মৈমনসিংহ জেলার কৃষক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে গবেষক চন্দ্রকুমার দে এই গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। এর কাহিনি নাথ-গীতিকার মতো যেমন কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিক নয়, তেমনি আবার একটি মাত্র কাহিনিকেন্দ্রিকও নয়। এখানে মোট দশটি গীতিকা প্রাধান্য পেয়েছে। এগুলির মধ্যে— মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারাম পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা, এবং দেওয়ান মদিনার নাম উল্লেখযোগ্য।

'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় রচয়িতারা মূলত ছিলেন কৃষক। কৃষিভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র গানগুলিতে ফুটে উঠেছে। কৃষক জীবনের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জাতিগত সম্প্রীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, লোকাচার, বিশ্বাস-সংস্কার গীতিকাগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। বেদে সমাজের জাতিভেদ প্রথা, তাদের আচার-সংস্কার, অলৌকিক বিশ্বাস ইত্যাদি দিক উঠে এসেছে গীতিকায়। 'কঙ্ক ও লীলা' পালায় জাতিভেদ প্রথার দিকটি দেখতে পাই—

> "জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন খায় যেই জন।
> যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ।।"

পাশাপাশি নারী-চরিত্রের প্রেম, তাদের আত্মত্যাগের দিক ফুটে উঠেছে। নারী চরিত্রকে সমাজ নানাভবে বিচার করেছে তাদের চরিত্রের স্খলন, সামাজিক কলঙ্ক, অপরাধের দিক তুলে ধরেছে। মনে রাখতে হবে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও কাব্যধর্মিতা, আঙ্গিকসৌন্দর্য এই গানগুলির উল্লেখযোগ্য দিক। 'মহুয়া' পালায় দেখি—

"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।।"

৭.১৩.৩ পূর্ববঙ্গগীতিকা : এই গানগুলি ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'-র গানগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় "Eastern Bengali Ballads—Mymensingh" নামে প্রকাশিত হয়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা'-য় তিন খণ্ডে সংকলিত মোট গীতিকার সংখ্যা ৫৪টি। গানগুলি কোনো একক ব্যক্তির সংগৃহীত নয়। আশুতোষ চৌধুরী, জসীমুদ্দিন, বিহারীলাল রায়, নগেন্দ্রচন্দ্র দে প্রমুখ গবেষকরা সংগ্রহ করেছিলেন।

৭.১৪ গীতিকার বৈশিষ্ট্য

গীতিকাগুলি একটিমাত্র ঘটনা বা সংকটপূর্ণ কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয়। এর পরিবেশনায় থাকে নাটকীয়তা ও সংলাপধর্মিতা। অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা বাদ দিয়ে কেবল মূল ঘটনাপ্রবাহই পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। তাই উপকাহিনির প্রাধান্য এখানে নেই। গীতিকাগুলির প্রধান বিষয় নরনারীর প্রেম। মৈমনসিংহ-গীতিকার দশটি পালার মধ্যে নয়টিই প্রেমমূলক। নায়ক-নায়িকারা বর্ণ-বিত্ত-কূল-ধর্মের দিক থেকে কেউ সমস্তরের, কেউ বা অসমস্তরের। নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সামন্তপ্রভু, বা অন্যান্য ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের প্রণয়বাসনা, কামপ্রবৃত্তি ইত্যাদির কথা আছে। গীতিকা রচয়িতার মধ্যে থাকে এক ধরনের নিরাসক্ত চেতনা। দেশি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গতানুগতিক সুরে গীতিকাগুলি গীত হয়। কিন্তু কাহিনি মূল লক্ষ্য হওয়ায় সুরের একঘেয়েমি শ্রোতার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় না। আর এখানেই লোকসংগীতের সঙ্গো গীতিকার পার্থক্য। লোকসংগীতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ। গীতিকায় কথা মুখ্য, সুর গৌণ। মনে রাখতে হবে, আদিম সমাজে গীতিকার উদ্ভব হয়নি, একটি সংহত লোকসমাজে এর উদ্ভব। গীতিকা মৌখিক সাহিত্য, তাই গীতিকা মনে রাখার জন্য কতগুলি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেমন—কোনো কোনো অংশের পুনরাবৃত্তি বা 'ধুয়া'র প্রচলন গীতিকার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

৭.১৫ সারসংক্ষেপ

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলি সাহিত্য শাখাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বৈষ্ণবপদাবলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ব্রজলীলা। রাধাকৃষ্ণের লীলারস এই পদগুলিতে বিশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপলাভ করেছিল। এর প্রধান রস তাই শৃঙ্গার রস। চৈতন্যদেবের জন্মের পর বৈষ্ণব পদগুলিতে প্রেম ভক্তির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কারণ কবিদের প্রত্যেকেই ছিলেন বৈষ্ণব ভক্ত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—বৈষ্ণব পদগুলিতে এই পাঁচ ধরনের রস দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর উৎকেন্দ্রিক পর্বে বাৎসল্য রসকে কেন্দ্র করে শাক্ত পদগুলি রচিত হয়েছিল। মাতা-কন্যার সম্পর্কের বিন্যাস এইসমস্ত পদে আন্তরিকভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে বাউল সাধনার মধ্যে বৈরাগ্যের সুর মিশে আছে। দেহের মধ্যেই তাঁরা দেহাতীতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন। পরমাত্মার খোঁজে বাউলদের নিরন্তর যে ভাবনা গানগুলিতে তার শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গীতিকাগুলির প্রধান বিষয় নরনারীর প্রেম ও প্রতিবন্ধকতা। কবিরা নিরাসক্ত চিত্তে এইসমস্ত কাহিনি তুলে ধরেছেন।

আমরা এই এককে বৈষ্ণব পদাবলি থেকে শাক্ত পদাবলি, গীতিকা, বাউল গানের স্বরূপ, কবি পরিচিতি, সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি।

৭.১৬ অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বিদ্যাপতি কোনসময়ের কবি? তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

২. বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার কারণগুলি উল্লেখ করো।

৩. প্রাক্-চৈতন্যপর্বের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করো।

৪. জ্ঞানদাস কে ছিলেন? তাঁর রচনাশৈলীর উৎকর্ষতার দিকগুলি আলোচনা করো।

৫. গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হয় কেন

৬. শাক্ত পদাবলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজজীবনের যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

৭. বাৎসল্য রসের চিত্রাঙ্কনে রামপ্রসাদ সেনের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৮. আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের গানে কমলাকান্ত সেনের কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করো।

৯. বাউল গীতিকার হিসাবে লালন ফকিরের কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করো।

১০. অষ্টাদশ শতাব্দীর গীতিকাসাহিত্যের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. 'পূর্বরাগ' বলতে কী বোঝ?

২. বৈষ্ণব সাহিত্যে রস কয় প্রকার ও কী কী?

৩. অভিসারের সংজ্ঞা দাও।

৪. 'অভিনব জয়দেব' কাকে, কেন বলা হয়?

৫. 'আগমনী' বলতে কী বোঝায়?

৬. 'বিজয়া' পর্যায়ের পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ?

৭. বৈষ্ণব পদাবলিতে 'মাথুর' বলতে কী বোঝায়?

৮. বৈষ্ণব পদাবলিতে 'গৌরচন্দ্রিকা' বলতে বোঝ ?

৯. লালন ফকিরের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল ?

১০. শাক্তসাধক রামপ্রসাদের গানে প্রধান কোন্ কোন্ দিক প্রতিফলিত হয়েছে?

❑ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বিদ্যাপতি কোন সময়ের কবি?

২. চণ্ডীদাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

৩. 'মাথুর' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

৪. 'অভিসার' পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তার নাম লেখো।

৫. 'কবিরঞ্জন' উপাধিতে কে ভূষিত হয়েছিলেন?

৬. উনিশ শতাব্দীর একজন শাক্ত পদকর্তার নাম লেখো।

৭. "ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান"—পদটির রচয়িতা কে ছিলেন?

৮. 'মৈমনসিংহ গীতিকা'গুলি কে সংগ্রহ করেন?

৯. নাথ গীতিকাগুলি কোথায় প্রচলিত ছিল?

১০. লালন ফকিরের গুরুর নাম লেখো।

৭.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, '*শাক্ত পদাবলী (চয়ন)*', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭।

২. আবদুল ওয়াহাব, '*বাংলার বাউল সুফিসাধনা ও সংগীত*', রত্নাবলী, ১৯৯৯।

৩. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, '*শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা*', ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৬০।

৪. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত '*মৈমনসিংহ-গীতিকা*', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৫. নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত '*বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী*', বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৫।

৬. বিমানবিহারী মজুমদার, '*পাঁচশত বছরের পদাবলী*', জিজ্ঞাসা, ১৯৬০।

৭. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, '*চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*', বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০।

৮. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, '*মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০।

৯. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, '*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য*', সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৭।

১০. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, '*বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*', সাহিত্য সংসদ, ১৩৫৩।

১১. হিমাংশু চন্দ্র চৌধুরী, '*বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা*', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫১।

একক-৮ ❑ জীবনী সাহিত্য ও ইসলামি বাংলা সাহিত্য

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ জীবনী সাহিত্য : প্রাথমিক পরিচয়

৮.৪ জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব

৮.৫ জীবনী সাহিত্য: কবি-পরিচিতি

৮.৫.১ বৃন্দাবন দাস

৮.৫.২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ

৮.৫.৩ জয়ানন্দ

৮.৫.৪ লোচনদাস

৮.৫.৫ অপ্রধান কবি

৮.৬ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : প্রাথমিক পরিচিতি

৮.৭ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : কবি-পরিচিতি

৮.৭.১ দৌলত কাজি

৮.৭.২ সৈয়দ আলাওল

৮.৭.৩ অন্যান্য অপ্রধান কবি

৮.৮ ইসলামি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব

৮.৯ সারসংক্ষেপ

৮.১০ অনুশীলনী

৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

জীবনীসাহিত্য পাঠের মধ্যে দিয়ে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব, অদ্বৈতচার্য ও সীতাদেবীসহ বিভিন্ন বৈষ্ণব মোহন্তদের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক অবদান সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারি। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সমাজ ও সাহিত্যের পরিবর্তিত রূপের পরিচয়দান এই অধ্যায়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে ইসলামি বাংলা সাহিত্য এক

ভিন্নতর প্রকৃতির আভাস নিয়ে এসেছিল। দেবতার কাহিনি ব্যতীত মানব-মানবীর রোমান্টিক জীবনলীলার সেই বিশিষ্ট দিকটি একই সঙ্গো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাবনার একটি নবতর পরিসর গড়ে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

৮.২ প্রস্তাবনা

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। মধ্যযুগের সাহিত্যের দৈবী পরিমণ্ডলে বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ঘোরতর পালাবদলের সূচনা ঘটে। সেইসময় এর অভিঘাত ঋদ্ধ করেছিল আপামর বাঙালি সমাজকে। শ্রীচৈতন্যদেবকে বরণ করে কবি লিখলেন— “বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া, নিমাই ধরেছে কায়া”। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে বাংলায় গড়ে উঠল এক নতুন সাহিত্য রীতি, যা জীবনীসাহিত্য নামে পরিচিত। ভক্তবৃন্দের কাছে জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তী। নরহরি সরকার, লোচনদাস শ্রীখণ্ডে চৈতন্য পূজার সূচনা করেন। এর ফলে বাংলাদেশে আপামর বাঙালির অন্তরে ভক্তি আন্দোলন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হল। অথচ এই পর্বেই ইসলামি সাহিত্যে দৈবী প্রাধান্যের পরিবর্তে নর-নারীর পার্থিব জীবনকাহিনি অবলম্বনে একধরনের রোমান্টিক কাব্যধারার সূচনা হল। রোমান্স, রূপকথা হয়ে উঠল এই ধরনের কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে দেববাদপুষ্ট অলৌকিক সাহিত্যধারার পাশাপাশি একই সঙ্গো রচিত হল মানবীয় প্রেম প্রীতিনির্ভর সাহিত্য। ফলে একই সঙ্গো সাহিত্যে ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদ নির্ভর আখ্যানকাব্য লেখা হতে লাগল। বর্তমান পরিসরে এই দুই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

৮.৩ জীবনী সাহিত্য : প্রাথমিক পরিচয়

কোনো ব্যক্তির পার্থিবজীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে সেটি জীবনীসাহিত্য নামে পরিচিত। ব্যক্তিগত তথ্যের দ্বারা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয় না। তাই সাহিত্যরস ফুটিয়ে তোলার জন্য কখনো কখনো ব্যক্তির লৌকিক লীলারসের ওপর চিত্র-বিচিত্র নানা কাহিনি নির্মিত হয়। এগুলিই জীবনীসাহিত্য বা ইংরেজিতে Biography নামে পরিচিত। লেখকের বস্তুনিষ্ঠাই এইধরনের সাহিত্যের মূল উপাদান। আবার মহাপুরুষদের পূত বা পবিত্র জীবনীকে কেন্দ্র করে নানা অলৌকিক বা অসম্ভব বিষয় আরোপিত হয়। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি একজন নিষ্ঠাবান ভক্তের। ভগবানরূপে তিনি বন্দনা করেন তাঁর আরাধ্য মানবকে। এই ধরনের জীবনীকে Biography বলা যায় না, ইংরেজিতে তা Hagiography–বাংলা ‘সন্তজীবনী’ নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সংস্কৃত-প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষায় এইরকম অনেক জীবনী রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ কিংবা শঙ্করাচার্যের জীবনী অবলম্বনে ‘শঙ্কর দিগ্বিজয়’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে বাংলায় এই ধরনের একাধিক জীবনী কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

৮.৪ জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব

ব্যক্তিজীবন চর্যায় জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির নানামুখী পরিমাপ করা হয়। বিশেষত আধুনিক জীবনীসাহিত্য বা Biography বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা। মোহমুক্ত দৃষ্টিতে লেখক এখানে ব্যক্তিজীবনকে বিচার করে থাকেন। ব্যক্তির পার্থিব জীবনের বিভিন্ন তথ্য নিষ্ঠাসহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্রের পরিমাপ করা হয়। সময় বা কালগত বিচার, তুলনামূলক আলোচনা ব্যক্তিচরিত্রের যথাযথ পরিমাপের প্রধান হাতিয়ার। বাংলায় কার্যকারণ শৃঙ্খলা, ঘটনার পূর্বাপর সঙ্গতির দিকে নজর রাখেন নিষ্ঠাবান পাঠক। সংলাপ, ভাষা, শব্দচয়ন ব্যক্তিচরিত্রকে বিশ্বস্ত রূপ দেয়। অলৌকিকতা, অপ্রত্যাশিত ঘটনা, কালানৌচিত্য দোষ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হয়।

কিন্তু Hagiography রচনার ক্ষেত্রে বিষয়ের ওপর অলৌকিকতা বা অপার্থিব দিক আরোপিত হয়। কারণ এক্ষেত্রে রচয়িতার দৃষ্টি একজন নিষ্ঠাবান ভক্তের। বিশেষত, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে। সংস্কার ও বিশ্বাসের বেড়াজালে সেসময় মানুষের চিন্তাভাবনার জগৎ ছিল সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের কাছে অবতাররূপে পূজিত হয়েছিলেন। ফলে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সেসময় ব্যক্তির জীবনচিত্র উঠে আসেনি। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবের নিজে এমন কিছুই লিপিবদ্ধ করেননি যার থেকে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের পরিমাপ করা যায়। এমনকি পদাবলি রচনাতেও তাঁর কোনো ভূমিকাই চোখে পড়ে না। এইসময় যারা চৈতন্যজীবনী চর্চায় এগিয়ে এলেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের কাছে ভগবান, তিনি ভক্তবাঞ্ছা, কল্পতরু। অবতাররূপে তিনি পূজিত হচ্ছেন বাঙালির হৃদয়ে। তাই পার্থিব-অপার্থিব লীলামাধুরী মিশিয়ে ষোড়শ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু জীবনী গ্রন্থ। যেখানে তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত প্রাপ্ত উপাদানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের বড়ো অভাব ঘটেছিল। বিশেষত শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে পদকর্তারা নানা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। প্রকৃত সত্য এড়িয়ে গেছেন অথবা তা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। তবু সমাজজীবনের নানা উপাদান এগুলির ভেতর থেকেই উঠে আসে। যেকারণে বলা যায়, চৈতন্যজীবনী সাহিত্যগুলি মধ্যযুগীয় সমাজজীবনের দলিল গ্রন্থ।

৮.৫ জীবনী সাহিত্য: কবি পরিচিতি

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে ষোড়শ শতক থেকেই সংস্কৃত ও বাংলায় বেশ কিছু জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রথম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচিত হয় সংস্কৃত ভাষায়। এটি হল মুরারি গুপ্ত বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম' গ্রন্থ। কবি মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। কাব্যটি 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামেও পরিচিত। উল্লেখ্য, 'কড়চা' শব্দের অর্থ 'দিনলিপি'। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যান্য জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুর বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃতম', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা', প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম' এবং 'স্বরূপ দামোদরের কড়চা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা

ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’, লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গাল’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গাল’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৮.৫.১ বৃন্দাবন দাস : যোড়শ শতকের প্রথমার্ধে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ রচনায় যিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি বৃন্দাবন দাস। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্যের আদিতম রচয়িতা। গ্রন্থ মধ্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কোনো শ্লোক না থাকায় কবির সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায়নি। এমনকি কবির পিতৃনামও জানা সম্ভব হয়নি। কবি ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা নারায়ণী দেবীর পুত্র। তাঁর জন্মকথা অনেকটা রহস্যাচ্ছন্ন। তাঁর জন্মকথাকে ঘিরে নানা গালগল্প সমাজে প্রচলিত আছে। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন ১৫৩৫ সালে কবির জন্ম। যদিও বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫১৫ সালে নবদ্বীপে কবির জন্ম হয়। কবি শেষজীবন কাটিয়েছিলেন দেনুড় গ্রামে। কবি ছিলেন চিরকুমার। খেতুরির উৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নিত্যানন্দের নির্দেশেই তিনি কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থ। কাব্যটির নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, এটি আদিতে শ্রীচৈতন্যমঙ্গাল ছিল, কিন্তু কৃষ্ণলীলার ধারা অনুসৃত হওয়ায় বৃন্দাবনের মহান্ত প্রভুরা এটিকে ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ আখ্যা দেন। আবার কারো কারো মতানুসারে লোচনদাসের একই নামে কাব্য থাকায় পৃথক পরিচিতি দানের উদ্দেশ্যে কাব্যটির নাম পরিবর্তিত হয়। কাব্য রচনাকালে মহাপ্রভুর পারিষদগণের অনেকেই জীবিত ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিজীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে কবি এই কাব্যটির পরিকল্পনা করেছিলেন।

‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যটি মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত—আদি-মধ্য-অন্ত্য। তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত আলোচ্য কাব্যে মোট একান্নটি অধ্যায় ছিল। আদি খণ্ডের পনেরোটি অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাল্যজীবন, বিবাহ, বিদ্যা-শিক্ষা, পিতৃ পিণ্ডদানের জন্য গয়াগমন, ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষালাভ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। বাল্য ও কৈশোরে শ্রীচৈতন্যের চপলতার নানাদিক এই খণ্ডে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডের ছাব্বিশটি অধ্যায়ে হরিনাম সংকীর্তনে নবদ্বীপবাসীর বিভোরতার চিত্র পরিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি আছে সন্ন্যাসগ্রহণের বর্ণনা। কাজির বিরোধিতা, কাজিদমন ও উদ্ধারের ঘটনাও এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডে রয়েছে মোট দশটি অধ্যায়। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলবাসের কাহিনি এই অংশের মুখ্য বিষয়। এ অংশের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ এবং অসংবদ্ধ।

বৃন্দাবনদাসের আলোচ্য গ্রন্থ যোড়শ শতকের ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠ এক আকর গ্রন্থ। বাংলার সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতির নানা দিক এ কাব্যে উঠে এসেছে। মনে রাখতে হবে, নবদ্বীপ ছিল সেসময়ে সমৃদ্ধ জনপদ, বিদ্যাচর্চার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আর্য বা ব্রাহ্মণ সমাজের মানুষ শিক্ষাদীক্ষা, পূজা-অর্চনায় ব্রতী থাকলেও অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষ নিমজ্জিত ছিল ‘ব্যবহার রসে’। এই প্রসঙ্গো তিনি লিখেছেন—

“ধর্ম কর্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গালচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পুজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।”

মুসলমান কাজির ভয়ে মানুষ সন্ত্রস্ত ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজপতির দল গুপ্তচরের মতো সমাজে নানা তথ্য পৌঁছে দিত কাজির কানে। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল। নিম্নশ্রেণির মানুষ দেব-দেবতা, পালপার্বণসহ নানা লোকাচারে মগ্ন থাকত। পাঠান শাসনে সমাজজুড়ে নেমে এসেছিল অবক্ষয়। এভাবেই সমকালীন ইতিহাসের নানা উপাদান এই কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় তিনি কাব্যটি রচনা করেছিলেন। ভাগবত অনুসারী রূপে গড়ে তোলার জন্য এই গ্রন্থ পাঠকমহলে আদৃত হয়েছিল। তিনি সমসাময়িক সমাজে 'ব্যাসদেব' রূপে পূজিত হয়েছিলেন—'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস''।

৮.৫.২ লোচনদাস : বর্ধমান জেলার কোগ্রামে যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। কবি ছিলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। তিনি ছিলেন 'গৌরনাগর' ভাবের প্রবক্তা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী গৌরাঙ্গ নাগর, নদিয়াবাসীরা নাগরী। পাঁচালির সুর, তাল সমন্বয়ে মঙ্গলকাব্যের রীতিতে এই কাব্যটির পরিকল্পনা করেছিলেন কবি লোচনদাস।

মঙ্গলকাব্যের আদর্শ, সূত্র, আদি, মধ্য ও শেষ—এই চারটি খণ্ডে কাব্যটি পরিকল্পিত হয়েছে। কাব্যের মধ্যে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কাঠামো অনুযায়ী বিষয়বিভাগ করেছেন কবি। আদিরসাত্মক ভক্তিরস কাব্যের মূল বিষয়। কাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম বা বিরহ লোচনদাসের হাতে উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। চৈতন্য তিরোধান সম্পর্কে জগন্নাথ শরীরে লীন হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন লোচনদাস। তিনি লিখেছেন—

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে।।
... ...
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।"

গোঁড়া ভক্তের কাছে বিষয়টি গৃহীত হলেও এর মধ্যে বিশ্বস্ততার অভাব দেখা যায়। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের রীতিতে এই কাব্যের বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে। সূত্রখণ্ডে গণেশ, শিব, পার্বতী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্যদেবকে প্রেমিক কৃষ্ণরূপে দাঁড় করিয়ে কবি আদি রসাত্মক ভক্তিরসের বর্ণনা দিয়েছেন। গৌরাঙ্গের বিবাহের সময় নদিয়া নাগরীদের কামমোহিত রূপে নির্মাণ করেছেন।

বৈষ্ণবভক্ত হলেও তাঁর কাব্য বৈষ্ণবসমাজে সমাদৃত হয়নি বলেই মনে করা হয়। কারণ, গৌরাঙ্গের প্রচলিত লীলাবিন্যাস রীতি এখানে অনুসৃত হয়নি। 'গৌরনাগর' ভাবের প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে কামনা কলুষিত দেহরাগকে তুলে ধরেছেন কবি, যা বৈষ্ণব ভক্তের কাছে অপ্রীতিকর। লোচনদাসের কাব্য ইতিহাসের তথ্যনির্ভর উপাদান হয়ে ওঠেনি। তবে কবিত্বের গুণে পাঠকমহলে তাঁর কাব্য জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

৮.৫.৩ জয়ানন্দ : বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি জয়ানন্দ। তাঁর পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র ছিলেন চৈতন্যদেবের উত্তম ভক্ত। তাঁর মায়ের নাম রোদনী দেবী। বাংলা দেশ থেকে ফেরার পথে

চৈতন্য সুবুদ্ধি মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জয়ানন্দ নামটিও চৈতন্যদেব প্রদত্ত বলেই জানা যায়। তিনি নিজেও গদাধর গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁর কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। মোট নয়টি খণ্ডে তিনি চৈতন্যদেবের এক সামগ্রিক জীবনচিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। তথ্যের প্রামাণিকতা, পারম্পর্য ও ঘটনাগত সংহতি এ কাব্যে রক্ষিত হয়নি। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করে পালাগানের আদর্শে কাব্যটি পরিকল্পিত হয়েছে।

বৈষ্ণব ভক্ত হয়েও তিনি এ কাব্যে বৈষ্ণবীয় আদর্শ পুরোপুরি রক্ষা করেননি। কাব্যের মধ্যে আছে আদ্যাশক্তি কালীমূর্তির বর্ণনা। লৌকিক-পৌরাণিক নানা বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন কবি। কৃত্তিবাসের বন্দনার পাশাপাশি তিনি মায়াবাদেরও সমর্থন করেছেন। তাঁর কাব্যে নানা তথ্যের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ করেছেন সমালোচকরা। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

"আষাঢ় পঞ্চমী রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে।।
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে।।
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।"

বৈষ্ণবভক্ত হয়েও ভক্তের দৃষ্টিতে চৈতন্যজীবনী সাহিত্য তিনি রচনা করেননি। চৈতন্যদেবকে তিনি অবতারকল্পরূপে দাঁড় করাননি। বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে কবি বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কাব্যের মধ্যে ব্যাসদেব, গুণরাজ খাঁ, বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের তিনি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। নানা অবাস্তব, অবৈষ্ণবীয় উপাদানের কারণে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে গ্রন্থটি তেমন গুরুত্ব পায়নি।

৮.৫.৪ কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীচৈতন্যজীবনী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ। বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে সচ্ছল ও ধর্মানুরাগী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কবি। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে কবি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন গমন করেন এবং বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত অবস্থায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন। 'চৈতন্যভাগবত'-এর মতো 'চৈতন্যচরিতামৃত'-ও তিন খণ্ডে বিভক্ত। এখানে 'খণ্ড' শব্দের পরিবর্তে 'লীলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আদিলীলায় সতেরটি, মধ্যলীলায় পঁচিশটি এবং অন্ত্যলীলায় বিশটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। 'আদিলীলা'-য় চৈতন্যের যৌবন পর্যন্ত, 'মধ্যলীলা'-য় সন্ন্যাস গ্রহণের পরের ছ' বছরের কাহিনি এবং 'অন্ত্যলীলা'-য় পরবর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির কোনো অংশই গানের উদ্দেশ্যে লিখিত নয়। চৈতন্যচরিতামৃত বাংলা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় অর্থাৎ অগেয় গ্রন্থ।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব দিব্যভাবে বিভোর অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। বৃন্দাবনদাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে এই দিব্যভাবের চিত্রাঙ্কনে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এ ব্যাপারে কৃষ্ণদাস কবিরাজের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। চৈতন্যদর্শনের তিনিই প্রথম রূপকার। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যঅর্জনের পর সহজ সরল ভাষায় তিনি বিশাল আয়তন এই কাব্যের রূপদান করেছেন।

চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বকথা সুনিপুণভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সখিসাধনা, সাধ্যসাধনতত্ত্ব, প্রেমবিলাসবিবর্ত, পঞ্চরস, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় সাধনার দার্শনিক দিক তাঁর রচনায় প্রাঞ্জল ও সহজরূপ ধারণ করেছে। কাম ও প্রেমের মধ্যে তিনি সূক্ষ্ম পরিমাপ করেছেন—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"

পয়ার ছন্দের মাধ্যমে তত্ত্বদর্শনের দিকটি যেভাবে তিনি কাব্যরূপ দিয়েছেন তাতে তাঁর অসীম কবিত্বশক্তির পরিচয়টিও অনায়াসেই রূপলাভ করেছে।

৮.৫.৫ অপ্রধান কবি : চৈতন্যদেবের মহৎ জীবনী অবলম্বনে যেসমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে একটি সমালোচিত গ্রন্থ হল, 'গোবিন্দদাসের কড়চা'। এটি প্রকাশ করেন জয়গোপাল গোস্বামী। এটি মূলত চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত বিষয়ক ভ্রমণ কাহিনি। তবে বহু আলোচিত এই গ্রন্থটির ভাষা পরিচয় দেখে অনেকেই এটি আধুনিককালের রচনা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ১৯৫৭ খ্রি. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কবি ছিলেন অন্যতম বৈষ্ণব পদকর্তা। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে এই কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। কাব্যটি আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কাব্যটি খণ্ডিত। তবে এই কাব্যে মহাপ্রভুর বাল্যজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে চূড়ামণি দাসের উচ্চতর কবিখ্যাতির পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায় না। বর্ণনার আকারে চৈতন্যদেবের ব্যক্তি পরিচয় তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

৮.৬ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : প্রাথমিক পরিচিতি

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু কবিদের হাতে বিশুদ্ধ দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য রচিত হচ্ছিল। এর পর্বে মুসলমান কবিদের রচিত সাহিত্যে ধর্ম সাধনার সঙ্গে কোনো সংযোগ ঘটেনি। দেব-দেবী নিরপেক্ষ মানব-মানবীর প্রণয়গাথা নিয়ে বিশুদ্ধ রোমান্টিক সাহিত্য রচনায় তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। এইসব কাহিনির অধিকাংশই রূপকথাসুলভ আখ্যান কাব্য এবং তার বিষয়বস্তুও দেশ-কাল পরিধির বাইরে। এই প্রসঙ্গে সুকুমার সেন লিখেছেন, "ইসলামি' নামটি হয়ত সঙ্গত নয়, কেননা রচনা-রচয়িতা-ভাব-ভাষা কোনোদিক দিয়েই এই সাহিত্যকে সর্বদা ইসলামি বলা যায় না। আর ইসলাম শাস্ত্র ও তত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ ছাড়া অপর রচনার পাঠক ও শ্রোতা মুসলমান-সমাজের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। রোমান্টিক কাহিনি-কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসি সাহিত্যের অনুগত ছিল না।" পাঠান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার সীমান্তবর্তী প্রদেশ কাছাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে মানব-মানবীর প্রণয় কাহিনি নিয়ে বেশ কিছু গাথা কাব্যের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের রোসাঙ রাজসভায় রচিত কাব্যগুলিই এই পর্বের আলোচনার বিষয়বস্তু।

৮.৭ ইসলামি বাংলা সাহিত্য : কবি-পরিচিতি

সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় যে দুজন শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে দৌলত কাজি ও সৈয়দ আলাওলের নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মদেশের কাছাকাছি আরাকান রাজসভায় তাঁরা সভাকবি হিসেবে কাব্যরচনা করেছিলেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সেইসময় আরাকান ছিল মিশ্র সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন জাতিতে মগ। আরবি সাহিত্যের চর্চার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন এককথায় তার গুরুত্ব অপরিসীম।

৮.৭.১ দৌলত কাজি : আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি দৌলত কাজি। কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। কবি সুফী মতাবলম্বী ছিলেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত সুলতানপুরে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আরাকান রাজের সমরসচিব আশরাফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নির্দেশে তিনি ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে লোর চন্দ্রানী বা 'সতী ময়না' নামক রোমান্টিক কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি কবির মৌলিক আখ্যান নয়; মিয়া সাধন নামক প্রসিদ্ধ হিন্দি কবির 'মৈনা কো সৎ' নামক হিন্দি কাব্য থেকে এর কাহিনিভাগ গৃহীত হয়েছে।

চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে দৌলত কাজির জন্ম। অল্পবয়সেই তিনি নানা বিদ্যার অধিকারী হন। আরাকানরাজ থিরি-থু-ধম্মা অর্থাৎ শ্রীধর্মার তিনি রাজসভাকবি ছিলেন। দৌলত কাজি তাঁর কাব্যটি সম্পূর্ণ রচনা করতে পারেননি, দুই-তৃতীয়াংশ রচনার পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৬৫৯ খ্রি. আরাকানরাজ সান্দ-থু-ধম্মা অর্থাৎ চন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি আলাওল কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

গোহারী দেশের রাজা মোহরার অপূর্ব সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাণীর সঙ্গে ভাগ্যদোষে এক নপুংসক বামনের বিয়ে হয়। বিবাহিত রাজা লোরক জঙ্গলে মৃগয়ায় গিয়ে এক যোগীর কাছে চন্দ্রাণীর প্রতিকৃতি দেখে বিমুগ্ধ হয়। এবং গোহারিতে গিয়ে লোর-চন্দ্রাণী দেবী মন্দিরে সাক্ষাৎ করে এবং উভয়ে মিলিত হয়। এসব ঘটনা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বামন একসময় শুনতে পেলে লোরকের বিনাশ ঘটাতে সে বনপথ রোধ করে ধরে। এসময় বামন ও রাজা লোরকের মধ্যে যুদ্ধ হয়, বামনের পরাজয় ঘটে ও সে মারা যায়। এরই মধ্যে চন্দ্রাণীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটলে যোগীবর তাকে বাঁচিয়ে দেয়। রাজা লোরক তখন চন্দ্রাণীকে বিয়ে করে গোহারী দেশের রাজা হয়ে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করে এবং প্রথমা স্ত্রী ময়নার কথা একেবারেই ভুলে যায়। এই পর্যন্ত রচনা করেন দৌলত কাজি। পরের অংশ সৈয়দ আলাওলের রচনা। বিরহদশায় সখির মুখে গল্প শুনে তার বিরহশোক দ্বিগুণিত হয়। ময়না এক ব্রাহ্মণকে দূত করে রাজা লোরকের কাছে পাঠায়। এবং লোরক চন্দ্রাণী সহ সতী ময়নার কাছে ফিরে আসে।

চন্দ্রাণীর প্রেমে কামনা বাসনাই বড়ো হয়ে উঠেছে। অপরাংশে ময়নামতীর সতীত্ব অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দৌলত কাজি এক শক্তিশালী কবি। পাঁচালির ছন্দে তিনি এই কাব্যের কাহিনি বর্ণনা করেছেন এবং প্রকৃত অর্থেই এক প্রেমের উপাখ্যান নির্মাণ করেছেন। অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

"'লোরচন্দ্রানী' মানবিক প্রেমদ্বন্দ্বের কাহিনি। অনেকটা একালের উপন্যাসের মতো। নেহাৎ পদ্যে লেখা, নইলে এটিকে মধ্যযুগের ভালো প্রেমমূলক উপন্যাস বলে চালিয়ে নেওয়াই যেত।"

৮.৭.২ সৈয়দ আলাওল : সপ্তদশ শতাব্দীর রোসাঙ রাজসভার আর এক গুরুত্বপূর্ণ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তার কাব্যকাহিনি বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিল। তিনি ষোড়শ শতকের শেষভাগে চট্টগ্রামে (মতান্তরে ফরিদপুরে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৭৩ খ্রি. পরলোক গমন করেন। পিতৃহীন কবি প্রথম জীবনে মগরাজের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কবিত্বশক্তি ও সঙ্গীত পারদর্শিতার জন্য তিনি আরাকানের অভিজাত মুসলমান সমাজে পরিচিত হন এবং তাঁদেরই উৎসাহে ও আনুকূল্যে আরবি, ফারসি ও হিন্দি কাব্য ও গ্রন্থ অনুবাদে মনোযোগী হন। তাঁর উৎসাহদাতাদের মধ্যে ছিলেন আরাকান রাজ চন্দ্র সুধর্মা, প্রধানমন্ত্রী মগনঠাকুর, অর্থমন্ত্রী সুলেমান, প্রথিতযশা পন্ডিত সৈয়দ মুসা প্রমুখ।

আলাওল সর্বাধিক সংখ্যক কাব্য রচনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য, একটি অর্ধাংশ কাব্য, একটি সঙ্গীত বিষয়ক খণ্ডকাব্য এবং ১৫টি পদ বা গীতিকবিতা সম্পর্কে জানা গেছে। তিনি 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'-র অসম্পূর্ণ অংশ ছাড়াও 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল', 'তোহফা', 'সেকেন্দারনামা', 'সপ্তপয়কর' প্রভৃতি আরবি-ফারসি কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে জনপ্রিয় 'পদ্মাবতী' কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৮-৬০) আরবি রোমান্টিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যের নায়ক সয়ফুলমূলক ও নায়িকা বদিউজ্জমালের প্রেমকাহিনি এর বিষয়বস্তু। কাব্যটি রচনার কালেই কবি কারারুদ্ধ হন। এই কাব্যটি মুসলিম সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য স্বপ্নময় অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি। 'সপ্তপয়কর'-এ (১৬৬৫) আরবের রাজকুমার বাহরামের যুদ্ধজয় ও সপ্তপরীর গল্প বর্ণিত হয়েছে। 'তোহফা' (১৬৬৩-৬৪) ফারসি নীতিকাব্য 'তুহফাতুন্নেসা' গ্রন্থের অনুবাদমূলক রচনা। নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বলেই এটি অত্যন্ত নীরস। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'সেকেন্দারনামা' গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ নেজামি সমরকন্দের ফারসি কাব্য 'ইসকান্দারনামা'-এর সরস অনুবাদ। গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমরাভিযান ও রূপকথাধর্মী অনেক অদ্ভুত ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে 'পদ্মাবতী' ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য। পার্থিব নর-নারীর প্রেমের আখ্যান এই কাহিনির মূল বিষয়। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর আক্রমণ এই কাহিনির ঐতিহাসিক অংশ। আলাওল জায়সীকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, স্বকৃত কিছু ঘটনাকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন; শেষাংশে পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। প্রেমের মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে আলাওল লিখেছেন—

"প্রেমবিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেমহন্তে বশ।।
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর।।
প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেমতুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর।।"

পদ্মাবতী কাব্যে ধর্ম-সংস্কার মুক্ত মর্ত্য মানব-মানবীর প্রেম ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার এক অলৌকিক রূপমাধুরী সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্বর্গীয় প্রেমের নায়িকা পদ্মিনী। কেবল অমর্ত্যলীলাই নয়, বাংলার সমাজ ও পরিবেশের প্রভাবও তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। 'পদ্মাবতী'-র কাহিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালির হৃদয় আলোড়িত করেছিল। সেজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আলাওল জীবনরসিক কবি। তিনি বহুভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত কবি ছিলেন।

৮.৭.৩ অন্যান্য অপ্রধান কবি : ইসলামি ধর্মমত বা সুফীভাবনাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগে আরও কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল এদের মধ্যে শাহমুহম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান, সৈয়দ সুলতান, ফকির গরীবউল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক নর-নারীর কথা, সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র, সন্দেহ, অবিশ্বাস ইত্যাদি নানাদিক সেখানে ফুটে উঠেছে। এদের মধ্যে 'ইউসুফ জোলেখা'-র জন্য বিখ্যাত ছিলেন শাহমুহম্মদ সগীর। নায়ক ইউসুফ ও নায়িকা জুলেখার রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনি এই কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য। অন্যদিকে দৌলত উজির বাহরাম খান রচনা করেন লায়লী-মজনু নামক প্রণয় উপাখ্যান। সৈয়দ সুলতান বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি 'নবী বংশ', 'রসুল বিজয়', 'সব-ই-মিরাজ', 'ইবলিস্‌নমা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। ফকির গরীবউল্লাহ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। 'হোসেন মঙ্গল', 'আমীর হামজা' প্রভৃতি কতিপয় কাব্য রচনা করেছিলেন।

৮.৮ ইসলামি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব

মধ্যযুগে রচিত ইসলামি বাংলা সাহিত্যগুলি হয়ে উঠেছে এক নতুন জীবনের দিক নির্দেশক, সাহিত্যের গতি পরিবর্তনের সূচক। এইসময় বেশিরভাগ সাহিত্য যেখানে দেবমাহাত্ম্যমূলক, সেখানে ইসলামি কাব্যগুলি নর-নারীর প্রেম-প্রণয় ঘটিত রোমান্টিক গাথা নির্ভর হয়ে উঠেছে। ভক্তিবাদ নয়, মানবতাই এর মূল কথা। ফলত বাংলা সাহিত্যধারায় এই শাখা চিরাচরিত প্রথা বা যুগের গতানুগতিকতাকে ভঙ্গ করল। বাংলা সাহিত্য এতকাল ছিল গোষ্ঠীনির্ভর ধর্মীয় সাহিত্য। সেখানে মানব-মানবীর কামনা-বাসনা, যুদ্ধবিগ্রহ, শোকগাথা এসব দিক আশা করাই ছিল অসম্ভব। সেই সনাতন প্রথা ভাঙার সাহস দেখালেন মুসলমান কবিরা। মানবিক সুর ফুটে ওঠার ফলে এইসমস্ত ইসলামি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক মহাসঙ্গীত রচিত হল।

৮.৯ সারসংক্ষেপ

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব বাংলা দেশে ভক্তিধারার প্লাবন সৃষ্টি করলেন। পাঠান রাজত্বকালে তিনি বৈষ্ণব সমাজে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন যার জন্য ভক্তরা আবিষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর এই কারণেই তাঁর পূত জীবনীকে কেন্দ্র করে তারা জীবনীসাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তুললেন। এদের কেউ কেউ ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ। যার ফলে তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে কড়চা বা দিনলিপির আকারে চৈতন্যদেবের

ব্যক্তিজীবনের নানা তথ্য উঠে এসেছিল। তবে অধিকাংশই ছিলেন তাঁর ভক্ত। ফলে চৈতন্যদেবের গৃহীজীবন কিংবা অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে এক ধরনের অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব হয়ে উঠেছিলেন শিশু কৃষ্ণের দোসর। এর ঠিক পাশে প্রধান ধারা সাহিত্যরীতি থেকে সরে এসে ইসলামি বাংলা সাহিত্যগুলির প্রসার ঘটেছিল। নর-নারীর বিশুদ্ধ প্রেম, প্রণয় কাহিনিই হয়ে উঠেছিল এইজাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি। হিন্দু দেবমূলক প্রশস্তি থেকে সরে এসে কতিপয় মুসলমান কবি সুদূর চট্টগ্রামে এই ভিন্ন রীতির উপাখ্যান সৃষ্টি করেছিলেন। তবে তাঁদের রচনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌলিক ছিল না। তারা মূলত আরবি-ফারসি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাংলা দেবমূলক সাহিত্যের ভক্তিমার্গ থেকে সরে এসে এইধরনের সাহিত্যগুলি মানবীয় রীতির সাহিত্যসৃষ্টিতে ইন্ধন জুগিয়েছিল বলা যেতে পারে।

৮.১০ অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. জীবনী সাহিত্য বলতে কী বোঝ? যথার্থ জীবনী সাহিত্যের লক্ষণগুলি উল্লেখ করো।

২. বিষয়বস্তু উল্লেখ করে বৃন্দাবন দাসের ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩. কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের দার্শনিকতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. বৃন্দাবন দাসের ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থ দুটি একে অপরের পরিপূরক—আলোচনা করো।

৫. চৈতন্যজীবনী সাহিত্য রচনায় জয়ানন্দ ও লোচনদাসের কাব্যের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৬. মধ্যযুগে রচিত ইসলামি বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৭. সৈয়দ আলাওলের কবিত্বশক্তির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৮. সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান রাজসভায় মানব-মানবীর প্রণয়কাহিনি নিয়ে যে ভিন্ন রীতির সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার বিস্তৃত পরিচয় দাও।

৯. ‘লোর চন্দ্রানী’ বা ‘সতী ময়না’ কাব্যটির বিষয়বস্তু আলোচনা করো। বাংলা সাহিত্যে কাব্যটি কী কারণে উল্লেখযোগ্য?

১০. দৌলত কাজির কবিকৃতিত্ব আলোচনা করো।

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. জীবনী সাহিত্যের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

২. বৃন্দাবন দাসের ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের মুখ্য বৈশিষ্ট্য লেখো।

৩. ‘শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস’ রূপে কাকে, কেন সম্মান জানানো হয়েছে?

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মুখ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৫. 'পয়ারের শোষণশক্তি' বলতে কী বোঝায়?

৬. জয়ানন্দ রচিত জীবনী কাব্যটি বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে গৃহীত না হওয়ার কারণ কী?

৭. দৌলত কাজির কাব্যের গুরুত্ব লেখো।

৮. সৈয়দ আলাওল রচিত গ্রন্থগুলির নাম লেখো।

৯. জীবনী সাহিত্যের দু'জন অপ্রধান কবির নাম লেখো।

১০. ইসলামি বাংলা সাহিত্যের প্রধান গুরুত্ব লেখো।

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. জীবনী সাহিত্য বলতে কী বোঝ?

২. প্রথম চৈতন্য জীবনীকারের নাম কী?

৩. বৃন্দাবন দাসের লেখা গ্রন্থটির নাম লেখো।

৪. 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

৫. 'লোর চন্দ্রানী' কাব্যটি কার লেখা?

৬. 'সয়ফুলমূলক বদিউজ্জমাল' গ্রন্থের রচয়িতার নাম লেখো।

৭. দৌলত কাজির রচিত কাব্যের নাম লেখো।

৮. সৈয়দ আলাওল কার উৎসাহে কাব্যরচনা করেছিলেন?

৯. দৌলত কাজি কার নির্দেশে কাব্যরচনা করেছিলেন ?

১০. 'গৌরাঙ্গবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতার নাম লেখো।

৮.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুকুমার সেন, '*ইসলামি বাংলা সাহিত্য*', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

২. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত '*লোর চন্দ্রানী ও সতী ময়না*', শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১০।

৩. রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত '*বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত*', সাধনা প্রকাশনী, ২০১২।

৪. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত '*শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান*', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯।

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*', দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

৬. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সম্পাদিত, '*লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গাল*', জুলাই ২০০০।

৭. বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত '*জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গাল*', দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১।

৮. রাধাগোবিন্দনাথ সম্পাদিত '*কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত*', সাধনা প্রকাশনী, ১৯৬৩।

৯. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম খণ্ড, ২০১১।

১০. ড. মহুয়া ষন্নিগ্রহী সম্পাদিত '*আলোচনার আলোয় লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না*', প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০২০।

মডিউল-৩

উনিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-৯ ❑ উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য ও সাময়িকপত্র

গঠন

৯.১. উদ্দেশ্য

৯.২. প্রস্তাবনা

৯.৩. বাংলা গদ্যের সূচনা পর্ব

৯.৩.১. শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা মুদ্রণ

৯.৩.২. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্যচর্চার গোড়াপত্তন

৯.৪. বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের অবদান

৯.৫. বাংলা গদ্যচর্চায় সংবাদপত্রের অবদান

৯.৬. গদ্যসাহিত্যের বিকাশপর্ব

৯.৬.১. অক্ষয়কুমার দত্ত

৯.৬.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৯.৬.৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯.৭. বাংলা কথ্যগদ্যরীতির দুই স্থপতি: প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

৯.৮. উনিশ শতকের শেষপর্ব ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি

৯.৮.১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা

৯.৮.২. বঙ্কিম সমকালীন অপ্রধান গদ্যসাহিত্যিক

৯.৯. সারসংক্ষেপ

৯.১০. অনুশীলনী

৯.১১. গ্রন্থপঞ্জি

৯.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- প্রথমত গদ্যসাহিত্য কী এবং উনিশ শতকে এর উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা ও পটভূমি সম্পর্কে তাঁরা সম্যকভাবে অবহিত হতে পারবেন।

- উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে সম্যকভাবে ধারণালাভ করতে পারবেন।
- গদ্যসাহিত্যের গোড়াপত্তনে মিশনারিদের অবদান কী ছিল সেবিষয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে তারা জ্ঞানলাভ করতে পারবে।
- বস্তুতপক্ষে সমসাময়িক ধর্ম-রাজনীতি-সমাজ গদ্যসাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশকে কতখানি ত্বরান্বিত করেছিল এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে।

৯.২. প্রস্তাবনা

উনিশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, দেশি সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র ইত্যাদি নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যেমন ঘটেছে, ঠিক তেমনি ব্যক্তিগত উদ্যোগও বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়াও অনেক শিক্ষিত বাঙালি গদ্যভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। গদ্যভাষায় সমাজের নানা অবিচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দেশি পণ্ডিতরা সোচ্চার হয়েছেন। ফলে গদ্যে এসেছে মননশীলতা, যুক্তি, সংযম ও শৃঙ্খলা। এই অধ্যায়ে গৃহীত পাঠ পরিকল্পনায় সমসাময়িক ধর্ম-রাজনীতি-সমাজের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যা থেকে নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানলাভে উপকৃত হবে।

৯.৩. বাংলা গদ্যের সূচনা পর্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালির জীবনভাবনায় যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীচেতনা এবং স্বাদেশিকতার পাশাপাশি রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে নিজস্ব একটি বোধ জন্মায়। শিক্ষিত বাঙালি নিজেদের মানসমুক্তির প্রয়োজনে গদ্যরচনার প্রয়োজন অনুভব করে। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি আদান-প্রদান, মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ইত্যাদি নানাকারণে বাংলা গদ্যরচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার চলনা থাকায় প্রথমদিকে বাংলা গদ্য ছিল আরবি ও ফারসি প্রভাবিত অথবা কৃত্রিম ও অপ্রচলিত সাধু শব্দের আড়ম্বরে কণ্টকিত। ইতিমধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনা বাংলা গদ্যরচনা প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী প্রভাব এনে দেয়। প্রায় একই সময়ে সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনে লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। উইলিয়াম কেরির দায়িত্ব গ্রহণের পর এই কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। যার ফলে শুরু হয় বাংলা গদ্যচর্চার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৯.৩.১. শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা মুদ্রণ

ধর্মপ্রচার ও মুদ্রণকার্যের উদ্দেশ্যে উইলিয়ম কেরি ও তাঁর কয়েকজন সহযোগী, জন টমাস, যশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারিরা প্রধানভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ১৮০০ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারী হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে একটি ব্যাপটিস্ট মিশন গড়ে তুলেছিলেন। এটিই শ্রীরামপুর মিশন নামে পরিচিত ছিল। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। মুদ্রণকার্য ছাড়া ধর্মগ্রন্থের প্রচার সম্ভব নয়, তাই এই মিশনে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনুবাদ, প্রচারপুস্তিকা মুদ্রণে তাঁরা সবিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। ১৮০৩ সালের মার্চ মাসেই শুরু হয়েছিল প্রেসের কাজ। অবিলম্বে ধর্মপ্রচার ছাড়াও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলা ধর্মপুস্তক, সংবাদপত্র, পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁদের অবদান ছিল অপরিসীম।

১৮০০-১৮৩৭ পর্বে শ্রীরামপুর মিশন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল বাইবেল অনুবাদ ও প্রচার পুস্তিকা যেমন, 'নিউ টেস্টামেন্ট', 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' (Gospel of st Matthews), সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ ('ধর্মপুস্তক') প্রভৃতি প্রায় আশিখানি গদ্য প্রচারপুস্তিকা। এছাড়াও বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম পাঠ্যপুস্তক, কেরির সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ, মূল সংস্কৃতে সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য, কেরি ও মার্শম্যান সম্পাদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ' (চার খণ্ড), কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থও মুদ্রিত হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্যমূলক গ্রন্থগুলির মধ্যে ইংরাজি ও বাংলা দু'ভাষাতে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দু খণ্ড), 'পুরাতত্ত্বের সংক্ষেপ বিবরণ সংকলন', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', ম্যাকের 'কিমিয়াবিদ্যা সার' নামক রসায়নগ্রন্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখান থেকেই জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'দিগদর্শন', ও 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ পেয়েছিল।

মিশনারিরা মূলত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। আক্ষরিক অনুবাদকার্যেই তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন। তবে সেসব গ্রন্থের ভাষা মোটেও সুখপাঠ্য ছিল না। তৎসম শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগের কারণে ভাষা জটিল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল। পদের অন্বয়জনিত ত্রুটি, ছেদচিহ্ন স্থাপনে দুর্বলতা সত্ত্বেও বাংলা গদ্যরচনার মুখবন্ধ হিসাবে ভাষা, শব্দ বা বাক্যঘটিত প্রয়োগরীতি গদ্যকারদের কাছে আকর্ষণ বা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই ছাপাখানার মাধ্যমে গ্রন্থমুদ্রণের দিকটি মানুষকে সেইসময় বিশেষভাবে আশান্বিত করেছিল। উইলিয়ম কেরির অকৃত্রিম নিষ্ঠা মানুষের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এই হল শ্রীরামপুর মিশন ও বাংলা মুদ্রণের বাংলা গদ্যচর্চার প্রাথমিক প্রয়াস।

৯.৩.২. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্যচর্চার গোড়াপত্তন

উনিশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যের প্রসারের কাজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান ছিল অপরিসীম। ১৮০০ সালে ১৮ আগস্ট এই কলেজের সূত্রপাত ঘটে। প্রাথমিক পর্বে এখানে হিন্দুস্থানি, ফারসি, আরবি, গ্রিক, লাতিন, ইংরেজি ভাষার শিক্ষা দেওয়া হতো। এইসময় কলেজে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন উইলিয়ম কেরি। ১৮০১ এর মে মাসে কলেজে তিনি যোগদান করেন এবং তিনিই

ছিলেন এই কলেজের প্রধান পণ্ডিত। মূলত ইংরেজ সিভিলিয়নদের এদেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন ঘটে। বাংলা ভাষায় গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে কোনো গদ্যগ্রন্থ না থাকায় কলেজের পণ্ডিতরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে গদ্যগ্রন্থ রচনা করতে শুরু করেন। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত এই কলেজের অস্তিত্ব থাকলেও ১৮১৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল কলেজের বাংলা বিভাগ। ১৮০১-১৮১৫ কালপর্বকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্যচর্চার সময়কালরূপে চিহ্নিত করা যায়।

১৮০১ এর মে মাসে কলেজে উপস্থিত হন উইলিয়ম কেরি। কলেজের প্রধান দায়িত্ব ছিল তাঁর হাতে। কলেজের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশি, হরপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। মূলত আটজন পণ্ডিতের তেরোখানি বাংলা গদ্যপুস্তক এই কলেজে চালু ছিল। শিক্ষার জন্য ইতিহাস-সাহিত্য-আখ্যানধর্মী রচনা-ভাষাশিক্ষা প্রভৃতি সবধরনের গ্রন্থ এখানে পাঠ্য হয়েছিল। গ্রন্থকারদের মধ্যে রামরাম বসু, উইলিয়ম কেরি, গোলকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সি, হরপ্রসাদ রায় ছিলেন প্রধান। রামরাম বসু লিখেছিলেন, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২) নামক দু'খানি গ্রন্থ। ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক জন টমাস ১৭৮৭ সালের ৮ মার্চ তাকে বাংলা ভাষার মুন্সি হিসেবে নিয়োগপত্র দেন। তারই সুপারিশে উইলিয়ম কেরি তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ভাষার মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি বাংলা অক্ষরে ও বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ ও জীবনচরিত। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক, অনুবাদক, সমাজ সংস্কারক হিসেবে উইলিয়ম কেরির প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি শিশু ও নারীদের মধ্যেও শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮০২) নামক দু'খানি গদ্যগ্রন্থ। 'কথোপকথন' গ্রন্থের ভাষারীতি অত্যন্ত সরল। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সংলাপ এতে উঠে এসেছে। গ্রন্থটি সেযুগে বাংলা গদ্যভাষার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন এই কলেজের প্রধান পণ্ডিত। তিনি যেসমস্ত গ্রন্থগুলি এই কলেজের জন্য রচনা করেছিলেন সেগুলি হল, 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলী' (১৮০৮), ও 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭)। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩) গ্রন্থ। প্রমথনাথ বিশীর 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে তাঁর কথা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা কঠিন হলেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এই গ্রন্থে তাঁর গল্পগুলি সহজপাঠ্য ও রসবোধ্য। তারিণীচরণ মিত্র রচনা করেন 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩)। হরপ্রসাদ রায়ের রচিত গ্রন্থ 'পুরুষপরীক্ষা। (১৮১৫)। গোলকনাথ শর্মা রচনা করেছিলেন 'হিতোপদেশ' (১৮০২) নামক গ্রন্থ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রচনারীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিষয়বৈচিত্র্য। চরিত্র, ইতিহাসধর্মী, রচনার পাশাপাশি 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র মতো দার্শনিক গ্রন্থ, 'লিপিমালা'-র মতো পত্ররচনার আদর্শ প্রভৃতি নানা ধরনের রচনারীতির মধ্যে দিয়ে গদ্যরীতির বিভিন্ন আঙ্গিক এখানে তুলে ধরা হয়েছিল। অনুবাদ ছিল

এই পর্বের হাতিয়ার। বিভিন্ন হিন্দি, ইংরাজি অনুবাদমূলক রচনায় বাংলা গ্রন্থকে তাঁরা দ্রুত সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, এই পর্বে উইলিয়ম কেরি তাঁর 'কথোপকথন'-রচনার মধ্যে দিয়ে জনতার মুখের ভাষাকে গদ্যে স্থান দিয়েছিলেন। আবার সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরের দিকেও তিনি নজর দিয়েছিলেন। লঘু- গুরু ইত্যাদি নানামাপের বাংলা শব্দের গ্রহণ-বর্জনের প্রতি কোনো বাছবিচার উইলিয়ম কেরির ছিল না। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ পণ্ডিতদের রচনা সংস্কৃতপ্রধান ছিল।

৯.৪. বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের অবদান

ধর্ম-সাহিত্য-সমাজ-প্রভৃতি নানাদিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পাদে যুগের পুরোধারূপে এগিয়ে এসেছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। নিজেকে যথাযথরূপে প্রকাশ করার জন্য সংস্কৃত, ফারসি, আরবি, ইংরেজি ভাষা তিনি উত্তমরূপে শিখেছিলেন। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ সম্পর্কে তার ভূয়সী পাণ্ডিত্য এই পর্বের বাংলা গদ্যসাহিত্যকে এক বিশিষ্ট পরিমণ্ডল দান করেছিল। উনিশ শতকের বহু দেববাদে আচ্ছন্ন সমাজে তিনি বস্তুবাদী একেশ্বরভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন।

রামমোহন রায় সেইসময় বেশ কিছু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। এগুলি হল, 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫), 'বেদান্তসার' (১৮১৫), 'কেনোপনিষৎ' (১৮১৬), ঈশোপনিষৎ' (১৮১৬), 'মুণ্ডকোপনিষৎ' (১৮১৯) এর অনুবাদ, 'কচ ও মাণ্ডুক্য' (১৮১৭), 'গায়ত্রীর অর্থ' (১৮১৮)। তাঁর মৌলিক রচনাগুলি ইংরেজিতে লেখা 'Bengali Grammar in The English Language' (১৮২৬) এবং তার অনুবাদ, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩), 'ব্রহ্মসংগীত' (১৮২৮)। তাঁর একেশ্বরবাদী ধর্মচর্চা সমসাময়িককালে বিভিন্ন পণ্ডিতের মনে সন্দেহের অবকাশ তৈরি করেছিল। ফলে ধর্মসংক্রান্ত নানা বিতর্কমূলক রচনায় তিনি সামিল হয়েছিলেন। এগুলি হল, 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬-১৭), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২), 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩)। মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলি হল: 'The Precepts of Jesus' (১৮২০) 'Brahmunical Magazine', 'The Missionary and the Brahman' বা 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এবং 'ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সম্বাদ' (১৮২১)।

চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজকে সংশোধনের কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তাই সহমরণ প্রথা বিলোপসাধনের জন্য তিনি বিশেষভাবে তৎপর হয়েছিলেন এবং এই সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ধরনের রচনাগুলি হল, 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও বির্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'পথ্যপ্রদান' (১৮২৩), 'সহমরণ বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮২৯), 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬)।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ সম্পর্কিত তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য প্রথম পর্বের বাংলা গদ্যচর্চার বিকাশে একটি বৃহত্তর পরিমণ্ডল দান করেছিল। তাঁর ভাষা ছিল প্রচারধর্মী, নিজের বক্তব্য প্রতিস্থাপনের জন্য তিনি

গদ্যচর্চাকে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন। রামমোহনের গদ্যরীতি ছিল প্রবন্ধের মতো গাঢ় যুক্তিবদ্ধ, ক্লাসিক বা স্থাপত্যধর্মী। বক্তব্যের মধ্যে সাহিত্যসুলভ আবেগ বা সরসতা ছিল না। তথ্য ও তর্কে সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাভাবনা ছিল তাঁর লেখার মধ্যে উজ্জ্বল। ঈশ্বরগুপ্তের মতে, 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজভাষায় লিখিতেন,... কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না'। তাঁর বক্তব্যে মৌলিক চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল। বিতর্কমূলক রচনায় তাঁর ধর্মসংক্রান্ত ব্যক্তিগত মতামতই ছিল মুখ্য। ভাষাগত স্বচ্ছতা তাঁর গদ্যরীতির প্রধান গুণ। বক্তব্যকে সহজ সরল, সংহতভাবে প্রকাশ করেছিলেন। বিপক্ষের ওপর কটুযুক্তি আরোপ করেননি, বরং মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় স্মিত হাস্যরস ফুটে উঠত। 'পাদরী ও শিষ্যসংবাদ', 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি রচনাগুলি এর অন্যতম নিদর্শন। নিজের বক্তব্যকে জনমানসে প্রচার করার জন্য তিনি 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'সম্বাদ কৌমুদী' ইত্যাদি একাধিক সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেন। ধর্মীয় একেশ্বরবাদ, সহমরণ বিরোধী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ইত্যাদি নানা আধুনিক ভাবনা এই সমস্ত পত্রিকায় স্থান পেত।

যুক্তি-বুদ্ধির সমন্বয়ে লেখা তাঁর রচনাবৈচিত্র্য বাংলা গদ্যের প্রথম পর্বে নিঃসন্দেহে পথনির্মাণ করেছিল। তবে রামমোহনের রচনা ত্রুটিমুক্ত নয়। প্রথমত, দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদচিহ্নের অভাবে লেখাপাঠে বাধার সৃষ্টি হতো। দ্বিতীয়ত, 'হইবাক' জাতীয় ক্রিয়াপদের প্রয়োগরীতি থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। তৃতীয়ত, সুদীর্ঘ জটিল বাক্যের সমন্বয় তাঁর লেখাকে দুরূহ করে তুলেছিল। লেখার সময় সংস্কৃত ঐতিহ্য ও আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল প্রাবন্ধিকের সংযম। সাহিত্যিকের সরসতা সে ভাষায় প্রকাশ পায়নি। পাঠকের বিচারবুদ্ধিকে তিনি জাগ্রত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, নিছক শিল্পসৃজন তাঁর লেখার উদ্দেশ্য ছিল না।

৯.৫. বাংলা গদ্যচর্চায় সংবাদপত্রের অবদান

গদ্যসাহিত্য বিকাশের ধারায় সংবাদপত্রের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও এগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য সরবরাহ করত। সামাজিক চেতনা সম্প্রসারণের কাজেও সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রচিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' (১৮১৮) বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। কিন্তু এটি ছিল স্বল্পায়ু পত্রিকা। তাই একই সময়ে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক 'দিগদর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮) এবং সাপ্তাহিক 'সমাচারদর্পণ'-কেই (মে, ১৮১৮) প্রথম সাময়িকপত্র রূপে গণ্য করা হয়। ১৮১৮-১৮৩১ পর্ব সাময়িক ও সংবাদপত্র রচনার সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত।

রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং সংবাদপত্রকেই আত্মপ্রকাশের অন্যতম হাতিয়ার করে তোলেন। ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে তিনি 'ব্রাহ্মণসেবধি' পত্রিকা বাংলায় এবং 'Brahmanical Magazine' ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। 'ব্রাহ্মণসেবধি' দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিল। তাঁর দ্বিতীয় সাময়িকপত্র 'সম্বাদ কৌমুদী' ১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহনের সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সময়ে প্রকাশ

করেন ‘সমাচারচন্দ্রিকা’ (১৮২২) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল মানুষ। ফলে সনাতন রীতি বা আদর্শ তাঁর পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেত। প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকরের’ নাম উল্লেখযোগ্য। এটি ১৮৩১ সালে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং আট বছর পর ১৮৩৯ সালে দৈনিকে পরিণত হয়। মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের দৈনন্দিন নানাসমস্যা ছাড়াও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ, কৃষকদের সমস্যা, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি সমাজজীবনের নানাদিক এই পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লেখকের এই পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে ‘তত্ত্ববোধিনী’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘বঙ্গদর্শন’, ‘ভারতী’ প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র সমাজ- ধর্ম- রাজনীতির নানাদিক উন্মোচন, ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ ও সাহিত্যিক রস পরিবেশনের কাজে উনিশ শতকে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল। এইসময় ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম মুখপত্র। ১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রচলন ঘটে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। বেদান্ততত্ত্ব, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য হলেও জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয় এই পত্রিকার মাধ্যমে উঠে এসেছিল। ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর ‘সোমপ্রকাশ’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এটি ছিল বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল পত্রিকা। সমকালীন বাল্যবিবাহ এবং কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা, নারীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের সমর্থন ইত্যাদি নানা প্রগতিশীল মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পত্রিকা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিদ্যাসাগর ছিল এই পত্রিকার অন্যতম প্রেরণাদাতা। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করলে এই পত্রিকা প্রতিবাদের সামিল হয়ে ওঠে। ভাষার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকা বিশেষ সংস্কারবাহী হয়ে উঠেছিল।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি সেইসময় শহর কলকাতায় প্রচলিত রক্ষণশীল, প্রগতিশীল, খ্রিস্টান মিশনারি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবধারার বাহক হয়ে উঠেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত হওয়ায় জনমানসে কোনো আকর্ষণই সৃষ্টি করতে পারেনি। রামমোহন রায়ের গদ্যগ্রন্থগুলির বিষয় ছিল তত্ত্বনির্ভর ও শাস্ত্রালোচনায় নীরস। সেদিক থেকে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের বস্তুগ্রাহ্য সহজ, প্রচলিত ভাষা শিক্ষানুরাগী, প্রগতিশীল বাঙালি দ্রুত আয়ত্ত করতে লাগলেন। এছাড়াও প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করার প্রয়াসে গদ্যভাষায় শ্লেষ জর্জরিত রূপটিও ফুটে উঠল। ডিরোজিওর প্রভাবে বাংলায় যে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর জন্ম হল বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিশেষত সংবাদপত্রে তাদেরও অবদান কিছু কম ছিল না। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। ‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’, ‘মাসিকপত্র’ প্রভৃতি পত্রিকাগুলির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলি যেমন সামাজিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন নীতি- আদর্শ ও নানা ভাবধারার বাহক হয়ে উঠেছিল তেমনি সহজ, যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

৯.৬. গদ্যসাহিত্যের বিকাশপর্ব

বাংলা গদ্যসাহিত্য বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের লেখালিখির মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক দেশ-কালের একটা প্রত্যক্ষ চিত্র খুঁজে পাওয়া গেল তাঁদের মধ্যে তিন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত। এরা ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম পথ প্রদর্শক। শুধু লেখালিখির মধ্যেই নয়, সমসাময়িক শিক্ষা, সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কারেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক এবং 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র (১৮৪৩) প্রতিষ্ঠাতা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা নিয়মিত লেখালেখির মাধ্যমে সেইসময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করেন।

৯.৬.১. অক্ষয়কুমার দত্ত

বর্ধমান জেলায় চুপি গ্রামে ১৮২০ সালের ১৫ জুলাই জন্মেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি (১৮২০-১৮৮৬) ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক, বিজ্ঞান ও জড়বাদী ভাবধারার অগ্রদূত। ভাববাদের প্রচলিত পন্থা থেকে সরে এসে লেখালেখিতেও তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রবর্তন করলেন। যেমন, তিনি মনে করতেন, প্রার্থনা নয়, পরিশ্রমেই মুক্তি। কৃষকরা পরিশ্রম করে শস্য পায়, প্রার্থনা করে নয়। তাই, তিনি গাণিতিক নিয়মের সাহায্য নিয়ে লিখলেন—

পরিশ্রম = ফসল
পরিশ্রম + প্রার্থনা = ফসল
অতএব, প্রার্থনা = শূন্য (০)।

তিনি যুক্তি, শৃঙ্খলা ও সংযমের মধ্যে দিয়ে নিজের লেখাকে ক্লাসিক মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো: 'ভূগোল', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ও ২য় ভাগ), 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ', 'চারুপাঠ', 'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (২য় ভাগ) প্রভৃতি। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' বইটি ছিল রেলওয়ে সম্পর্কে বাঙালি লেখক কর্তৃক রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তিনি বহু ভাষা রপ্ত করেছিলেন। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাব মোচনের জন্য তিনি 'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। সহজ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বহু ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করেছেন।

৯.৬.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সেযুগের অন্যতম শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের গদ্যরচনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তিনি শিল্পরসের

সঞ্চার করেছিলেন। ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় অক্ষয়কুমারের ভাষা ছিল দুরূহ, সন্ধি-সমাসের আড়ম্বরে দুর্বোধ্য। বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রাবন্ধিকের যুক্তি-তর্ক এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সম্পাদকের আবেগসমৃদ্ধ রচনারীতিকে পরিত্যাগ করে বাংলা গদ্যভাষাকে যথার্থ সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর লেখাতেই প্রথম শিল্পরসসমৃদ্ধ বাংলা গদ্যের নমুনাটি প্রত্যক্ষ করা গেল। তাঁর রচনাগুলি ছিল নানারীতির। তিনি যেমন অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমনি সমালোচনাধর্মী ও বিতর্কমূলক রচনা, ব্যঙ্গাধর্মী রচনা, আত্মজীবনীমূলক রচনাও লিখেছেন। তাঁর অনুবাদগ্রন্থগুলি হল: ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭), ‘বাংলার ইতিহাস’ (১৮৪৮), ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯) ‘বোধোদয়’ (১৮৫১), ‘শকুন্তলা’ (১৮৫৪), ‘বর্ণপরিচয়’-দুইভাগ (১৮৫৪, ১৮৫৫), ‘কথামালা’ (১৮৫৬), ‘চরিতাবলী’ (১৮৫৬), ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬০), ‘আখ্যানমঞ্জরী’ (১৮৬৩), ‘ভ্রান্তিবিলাস’ (১৮৬৯)।

তাঁর রচিত সমালোচনাধর্মী ও বিতর্কমূলক রচনাগুলি হল, ‘সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩) ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ —দুখণ্ড (১৮৭১-১৮৭৩), ‘বাংলাভাষ্য ও বাঙ্গালী সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩), ‘বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার’ দু’খণ্ড (১৮৭১, ১৮৭৩)। কস্যচিৎ ভাইপোস্য ইত্যাদি একাধিক ছদ্মনামে তিনি বেশকিছু ব্যঙ্গাধর্মী রচনা লিখেছিলেন। এগুলি হল: ‘অতি অল্প হইল’ (১৮৭৩), ‘আবার অতি অল্প হইল’ (১৮৭৩), ‘ব্রজবিলাস (১৮৮৫), ‘বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা’ (১৮৮৫), ‘রত্নপরীক্ষা’ (১৮৮৬)। তাঁর মৌলিক রচনার মধ্যে আত্মজীবনীমূলক রচনা ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ (১৮৯১), ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ (১৮৯১) এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলা গদ্যকে তিনিই প্রথম যতি-ছেদ সমন্বিত করে পরিবেশন করলেন। সুললিত শব্দচয়নের ফলে তাঁর হাতে বাংলা গদ্যের ভাষা সাহিত্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন, ‘বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।’ গদ্যচর্চার মাধ্যমে বস্তুতপক্ষে তিনিই যথার্থভাবে বাংলা ভাষাকে কৈশোর থেকে যৌবনে উন্নীত করলেন। ‘বিদ্যাসাগরচরিত’, ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ ইত্যাদি রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি গদ্যসাহিত্যকে ব্যক্তিগত শোক ও বেদনার বাণীবহ করে তুললেন। শুধু নীরস প্রবন্ধের ভাষাই যে গদ্যের একমাত্র ভাষা নয়, উপন্যাস বা অন্যান্য সরসরচনাও এর দ্বারা সম্ভব সেই বোধটুকুও ‘বিদ্যাসাগরী ভাষা’-র মাধ্যমে পাঠক উপলব্ধি করলেন এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

৯.৬.৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগরের হাতে সাধু বাংলা গদ্য যেরূপ লাভ করেছিল তার ওপর নিজের আত্মভাবনাশ্রয়ী রচনাকে দাঁড় করালেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। তিনি ভাষাকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেননি, ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ ছিল প্রধান দুই সহযোগী। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি, ‘ব্রাহ্মধর্ম’ (১৮৪৯), ‘আত্মতত্ত্ববিদ্যা’ (১৮৫১), ‘ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস’ (১৮৬০), ‘কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা’ (১৮৬২), ‘ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান’ (১৮৬০, ১৮৬৬),

'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯৩), 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮)। বাংলা গদ্যভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদকার্যে সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কয়েকটি বাক্য পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত হয়েছে। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ'—এই বাক্যটি বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়' গ্রন্থে (১৮৫১) স্থান দেন। 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়'—এই বাক্যটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক পত্রে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। ভাবমগ্নতা বা আত্মকথনভঙ্গি দেবেন্দ্রনাথের রচনার প্রধান গুণ। এই বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি তাঁর সহজ-সরল ধর্মব্যাকুল ব্যক্তিত্বের নিরাভরণ রূপটিকেই প্রকাশ করে। তাঁর রচনারীতি সহজ, সাবলীল ও কাব্যগুণসমৃদ্ধ। ধ্যানমগ্ন মহর্ষির হাস্যোজ্জ্বল পরিহাসরসিক চিত্তের পরিচয় তাঁর আত্মজীবনীতে ফুটে উঠেছে। কোমল ধর্মবিশ্বাস ও সহজ যুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি আপন ঈশ্বরব্যাকুল হৃদয়কেই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

৯.৭. বাংলা কথ্য গদ্যরীতির দুই স্থপতি: প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা গদ্যরীতিতে এক ভিন্নধর্মী পথের সন্ধান দিলেন দুই উল্লেখযোগ্য গদ্যলেখক প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮৩৪-১৮৮৩) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)। বঙ্কিমপূর্ব বাংলা সাহিত্যে কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন কথ্য ভাষারীতিকে তাঁরা সরাসরি নিজ কাহিনীর চরিত্রের মুখে ব্যবহার করলেন। তৎসম শব্দের আড়ষ্টতা ও ক্লাসিক গাম্ভীর্য থেকে তাঁদের হাতে বাংলা গদ্যভাষা মুক্তি পেল। বস্তুতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরি যেভাষায় 'কথোপকথন' (Dialogues) লিখেছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতি যেন তারই খানিকটা উত্তরসূরী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যার সূচনা, প্যারীচাঁদ মিত্রের হাতে তার বিকাশ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল। বাংলা ভাষা সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পেল।

প্যারীচাঁদ মিত্র সেইসময় টেকচাঁদ ঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাংলা নবজাগরণের সেই আদি পর্বে তিনি তিনি মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করেছিলেন। এইকাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন রাধানাথ শিকদার। 'আলালের ঘরে দুলাল' রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে তিনি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর ভাষারীতি 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাসম্ভার: 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬১), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) প্রভৃতি।

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ, দেশি-বিদেশি-তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহার, সমাস-সন্ধিযুক্ত জটিল বাক্য বর্জন এবং কথ্যরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। যদিও সেই ভাষার মধ্যে অবিমিশ্রণ বা গুরুচণ্ডালি দোষ ছিল। 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ চলতি ভাষার যে ভিত তৈরি হয়েছিল, সেই চলিত রীতির আদর্শ সর্বদা প্যারীচাঁদ রক্ষা করতে পারেননি। বিশেষত ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সাধুরীতি থেকে বাক্যকে পুরোপুরি তিনি মুক্তি দিতে পারেননি। এদিক থেকে ভাষাকে মুখের ভাষার অবিকৃত রূপ দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অবয়ব তাঁর ভাষায় জীবন্তরূপে ফুটে উঠেছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনাগুলির মধ্যে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (দুই খণ্ডে, ১৮৬৫), 'বাবু', 'বিক্রমোর্বশী', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'মালতীমাধব' প্রভৃতি নাটক, 'বঙ্গেশবিজয়' (অসমাপ্ত) নামক উপন্যাস এবং 'কালীসিংহীর মহাভারত', গীতার অনুবাদ প্রভৃতি। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচিত হয়েছিল শহর কলকাতার কথ্য বা ককি্ন ভাষায়। এই কথ্যচালে ভাষার লঘুতা যেমন বজায় ছিল, ক্রিয়াপদের অন্ত্যমহাপ্রাণতাও বর্জিত হয়েছিল এবং কথ্যভাষার শ্বাসাঘাত ধরা পড়েছিল।

হুতোমী ভাষার নমুনা : "শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে করে ওঁচা পচা মাছ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের 'ও গামছা কাঁদে, ভাল মাছ নিবি 'ও খেংড়া গুঁপো মিন্সে চার আনা দিবি বলে আদর কচ্চে"। ('হুতোম প্যাঁচার নকা')। বস্তুতপক্ষে সমকালীন বাবুসমাজকে তিনি এই ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। সেকালের অন্যতম লেখক ও সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখলেন, "বাজারে হুতোম প্যাঁচা বেরুলো, বদমায়েশের তাকলেগে গ্যালো, ছেলেরা চমকে উঠলো, আমরা জেগে উঠলুম"। মনে রাখতে হবে, প্যারীচাঁদের রচনায় ছিল গাম্ভীর্যের ছায়াপাত, হুতোম গাম্ভীর্যের ভিতরে যে আদিখ্যেতা আছে তাকে তুলে আনলেন। প্যারীচাঁদ খল চরিত্রের খলতার জন্য শাস্তি দিয়ে তাদের ধর্মের পথে নিয়ে এসেছেন, হুতোম এসব খলতা নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। প্যারীচাঁদ উপন্যাসের প্রাথমিক রূপ দিয়েছেন আর হুতোম নকশা লিখেছেন।

৯.৮. উনিশ শতকের শেষার্ধ: বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরিণত রূপ

উনিশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ঘটে। এই পর্বে জাতীয় ভাবধারায় শিক্ষিত বাঙালি উদ্দীপিত হয়েছিল। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতীয় ভাবোদ্দীপনামূলক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল। উপরন্তু খ্রিস্টান মিশনারিদের আক্রমণের হাত থেকে শাশ্বত হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে রামমোহন প্রমুখ বাঙালিরা যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন এই পর্বে এসে সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কারকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ অব্যর্থ হয়ে উঠেছিল। গদ্যসাহিত্য হয়ে উঠেছিল এই পর্বের ভাব সংঘর্ষের বাহন।

৯.৮.১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকা

এই পর্বে প্রাবন্ধিক হিসেবে আবির্ভূত হন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশেষত 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকার মধ্যে দিয়ে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমকালীন সময় ও জাতীয় ভাবধারার বাহক করে তুলেছিলেন। মনে রাখতে হবে, 'বঙ্গাদর্শন' কেবল পত্রিকা মাত্র ছিল না, এটি ছিল 'একটি যুগ, একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি আদর্শ'। সেযুগের সমস্ত বাঙালির চিন্তাধারা সংহত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে। বঙ্কিমমানস উনিশ শতকের বাঙালি মনোজগতের সার্থক পরিচয় বহন করেছিল। কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রবন্ধসম্রাট রূপে পাই 'বঙ্গাদর্শন'-এ। এককথায়, বঙ্কিম প্রতিভার দুর্লভ সিদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল 'বঙ্গাদর্শন'

পত্রিকা। 'বঙ্গাদর্শ'ন'-এর সঙ্গো পূর্ববর্তী বাংলা সাময়িক পত্রিকাসমূহের একটি লক্ষ্যণীয় পার্থক্য ছিল এই যে, 'বঙ্গাদর্শন' পূর্ব পত্রিকাগুলিতে জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গো সংবাদ পরিবেশনও অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বঙ্গাদর্শনে সাংবাদিকতার কোনো স্থান ছিল না। এই পত্রিকায় বিশুদ্ধ মননশীল সাহিত্যের যেমন প্রকাশ পেত, তেমনি রসসাহিত্যেরও প্রকাশ ঘটত। সমসাময়িক বহু লেখকের জ্ঞানগর্ভমূলক নানারচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ পেত। বিভিন্ন রচনা প্রকাশের পাশাপাশি ভাষারও চরম উৎকর্ষ সাধন ঘটেছিল। মূলত ১২৭৯ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৮২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চার বছর বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। পরবর্তীকালে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন, ১২৯০-এর মাঘ সংখ্যার পর এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, তুলনামূলক রচনা, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশ পেত। বঙ্গাদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উনিশ শতকের বাঙালি চিন্তাজগতের একচ্ছত্র অধিনায়ক। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি নানামুখী প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি সমসাময়িক বাঙালির চিন্তাজগতকে আলোড়িত করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় : (১) সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। (২) ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ (৩) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও (৪) সরস কৌতুকপূর্ণ রচনা বা রসসন্দর্ভ জাতীয় প্রবন্ধ। সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা' প্রভৃতি। এই জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করেছিলেন।

ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করা যায়, 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ-১৮৮৮, ২য় ভাগ-১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮), 'শ্রীমদ্ভাগবত' (মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, ১৯০২)। এইসব প্রবন্ধগুলি ধর্মচিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ববিচার ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিল, কোথাও যুক্তিবাহুল্যে ক্লান্ত ছিল না। স্বাদেশিকতার প্রকাশ এই রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে। গীতার অনুশীলনতত্ত্বকে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে অবলম্বন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম বিষয়ে ছিলেন মানবতাবাদী। তবে অনেকক্ষেত্রেই তিনি আইনস্টাইনের মতো সংশয়বাদী ছিলেন। তাই কখনো দেখা যায়, তিনি রক্ষণশীল, আবার কখনো সমাজবিজ্ঞানীর মতো প্রগতিশীল। ধর্মকে সমাজের হিতার্থে ব্যবহার করতে তিনি রচনা করেছিলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। এখানে তিনি জানিয়েছেন, 'কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়েছে 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থে। 'ধূলা', 'গগনপর্যটন', 'চঞ্চল জগৎ' প্রভৃতি এইধরনের রচনা। 'লোকরহস্য' গ্রন্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধগুলি ভাবে ও ভাষায় আন্তরিক হয়ে

উঠেছে। তিনি যেমন সমসাময়িক বাবু সমাজের প্রতি আক্রমণ করেছেন, তেমনি 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা স্যাটায়ারের মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সড়কপথ নির্মাণ করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর-এর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে, 'বসন্তের কোকিল', 'মনুষ্যফল', 'বিড়াল', প্রভৃতি প্রবন্ধ। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নধর্মী প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা গদ্যভাষাকে তিনি দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৯.৮.২. বঙ্কিম সমকালীন অপ্রধান গদ্যসাহিত্যিক

বঙ্কিমপর্বে বাংলা গদ্য রচনায় বহু প্রাবন্ধিকের উদ্ভব ঘটেছিল। এরা ছিলেন বিভিন্ন মত ও আদর্শের পথিক। এদের কেউ কেউ যেমন ঠাকুর পরিবারের ব্রাহ্মধর্মের অনুগামী ছিলেন, তেমনি অনেকেই রক্ষণশীল হিন্দুধর্মকে আশ্রয় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁদের লেখালেখি প্রচারিত হয়েছিল।

এই পর্বের বিশিষ্ট গদ্য সাহিত্যিক হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)। তিনি ছিলেন সেসময় বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট বাগ্মী, শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রচারক। দেবেন্দ্র প্রভাবিত গোষ্ঠীর লেখক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। ধর্ম, শিক্ষা, স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি নানাবিষয়ে তিনি চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে, 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩), 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬), 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮২), এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) প্রধান। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আবেগের পাশাপাশি যুক্তি বা তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। সংযম ও সুরুচিবোধ তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিশেষ উজ্জ্বলতা দান করেছিল। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন কৌতুকপ্রিয় ও রসিক ব্যক্তি। তাঁর আত্মচরিতের মধ্যেও সেই সরসতার ছবি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এই পর্বে বাংলা গদ্য রচনায় বিস্তৃত পরিসর দান করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। যুক্তি পরম্পরা, রচনা প্রাঞ্জলতা, ভাষার গতিশীলতা তাঁর গদ্যচর্চার প্রধান বাহন। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় পুরুষ, জাতির অন্যতম শিক্ষাগুরু। হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন ও তার পুনরভ্যুত্থান ঘটে তাঁর অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। সেইসময় বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ, হিন্দুসমাজের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের জন্য বেশ কিছু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে, 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার', (১৮৫৮), 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থ লিখেছেন। রক্ষণশীল হিন্দু হিসেবে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) লিখেছেন। দেশানুরাগ রঞ্জিত অখণ্ড ভারতবর্ষের

কথা 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৯৫) গ্রন্থের মূল বিষয়। এছাড়াও বেশ কিছু প্রবন্ধের সংকলন 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথমভাগ: ১৮৯৫, দ্বিতীয়ভাগ: ১৯০৫) গ্রন্থ। 'সামাজিক প্রবন্ধ' তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। বাঙালি জাতি ও সমাজের প্রতি সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির পরিচয় তাঁর এই প্রবন্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়। পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থে পঞ্চাশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। হিন্দু যৌথ পারিবারিক জীবনযাত্রার ছবি সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। স্থিতধি, আচারনিষ্ঠ হিন্দু ব্রাহ্মণ ভূদেব তাঁর সামাজিক গদ্য রচনাগুলিতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সুনিপুণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় রেখেছেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেসব মুসলমান লেখক বাংলাভাষায় সাহিত্যরচনা করে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, মীর মশাররফ হোসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার পাতায়। তিনি নিজে 'আজীবন নেহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক সত্তার পাশাপাশি তিনি 'গোরাই ব্রীজ' বা গৌরী সেতু (১৮৭৩), 'সঙ্গীতলহরী' (১৮৮৭), 'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯) 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬) 'মোসলেম ভারত' (১৯০৭), 'গো-জীবন' (১৮৮৯), 'গো-রক্ষার জন্য প্রস্তাব', 'আমার জীবন' (১৯০৮) ও 'বিবি কুলসম বা আমার জীবনীর জীবনী' (১৯১০) প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যরচনা করেছিলেন। 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাস তাঁর অন্যতম সৃষ্টি। ছোটো ছোটো বাক্যবন্ধনে তাঁর ভাষার প্রত্যক্ষতা বা চিত্রগুণ তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিল।

উনিশ শতকের শেষলগ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। যদিও বিশ শতকের আগে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকার হিসাবে তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তবে এইসময় চলিত ভাষায় রচিত তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন পথনির্মাণ করেছিল। উনিশ শতাব্দীর শেষভাগের বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বেশ কিছু পত্রপত্রিকা প্রচলিত ছিল। কেবল সাহিত্যসৃষ্টির সচেতন অভিপ্রায় এগুলির উদ্দেশ্য ছিল না, এগুলিতে রাজনীতি, সমাজনীতি বা ইতিহাস সম্পর্কিত নানাবিষয় এবং লেখকদের বিশিষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশ পেত। এছাড়াও কোনো কোনো পত্রিকাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস বা সমালোচনার বিষয়ও প্রকাশ পেয়েছিল। এই ধরনের পত্রিকাগুলির মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত মাসিক 'নবজীবন' এবং 'সাধারণী' পত্রিকার কথা উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় 'ভারতী' পত্রিকা। এছাড়াও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এইসময় 'হিতবাদী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' সাধনা' পত্রিকার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাগুলিতে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ পেত। ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী', শশধর তর্কচূড়ামণির 'বেদব্যাস', কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার', 'নববিধান' 'বালকবন্ধু' ইত্যাদি বেশ কিছু পত্রিকার প্রচলন ঘটেছিল।

৯.৯. সারসংক্ষেপ

উনিশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেনি। কেবল রাজরাজড়াদের কিছু চিঠিপত্রে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। উনিশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় মিশনারিদের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম কেরি দায়িত্বগ্রহণের পর বাংলা গদ্যসাহিত্যের যথার্থ গোড়াপত্তন ঘটে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারসহ অন্যান্য পণ্ডিতেরা এই কলেজে বেশ কিছু বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। এইসময় ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং বিনামূল্যে বিতরণ করাই ছিল এই সোসাইটির কাজ। বাংলা গদ্যসাহিত্যকে পাঠ্যপুস্তকের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উদ্ধার করলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর ভাষা ছিল যুক্তি-তর্কে সমৃদ্ধ বিচারদক্ষ পণ্ডিতের ভাষা। রামমোহন ছাড়াও এই পর্বে বাংলা গদ্য রচনায় এগিয়ে আসেন কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা। এই সময় সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যচর্চার বিকাশ ঘটে। 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচারদর্পণ', 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রভৃতি পত্রিকায় সমাজ-ধর্মের নীতি-আদর্শ সম্পর্কিত নানাদিক পরিবেশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গাল গোষ্ঠীর লেখকরাও গদ্যসাহিত্য বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে বিকাশের আদি পর্বে গদ্যসাহিত্যকে সমুন্নতির শিখরে পৌঁছে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত। অনুবাদ সাহিত্য এবং বিভিন্ন মৌলিক রচনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিল্পসমন্বিত বাংলা গদ্যের যুগান্তকারী প্রকাশ ঘটান। 'তত্ত্ববোধিনী', 'সোমপ্রকাশ', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রমুখ পত্রিকা গদ্যসাহিত্য বিকাশের যে ভূমিকা রাখে পরবর্তীকালে 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যকে রীতিমতো ধ্রুপদী আকার দেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যুক্তি-বুদ্ধি-শৃঙ্খলা-সংযম ইত্যাদি দিক তার গদ্যচর্চার প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। এছাড়াও রম্য বা রস রচনার মধ্যে দিয়েও গদ্যসাহিত্যকে তিনি বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলেন। 'বঙ্গাদর্শন'কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অন্যদিকে কথ্যরীতির গদ্যচর্চায় বিশেষ অবদান রাখেন প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ পণ্ডিত। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চার একটি সমন্বিত প্রয়াস এই সমস্ত লেখকদের মাধ্যমে উঠে আসে।

৯.১০. অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান লেখো।

২. গদ্য সাহিত্যের আদি পর্বে রামমোহন রায়ের গদ্যরীতির পরিচয় দাও।

৩. বাংলা গদ্য রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

৪. গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রের অবদানগুলি লেখো।

৫. বাংলা গদ্যের প্রথম পর্বে গদ্যশিল্পী হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করো।

৬. অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যরীতির বিশেষত্ব আলোচনা করো।

৭. চলিত গদ্যের বিকাশে হুতোম ও প্যারীচাঁদের আলালি ভাষা বাংলা গদ্যসাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছিল?

৮. বঙ্কিম সমকালীন কয়েকজন অপ্রধান লেখক গোষ্ঠীর নাম লেখো এবং তাঁদের গদ্যরীতির পরিচয় দাও।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. রামমোহন রায়ের গদ্যরীতির দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

২. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কী ধরনের গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল?

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৪. বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাথমিকলগ্নে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান লেখো।

৫. বাংলা গদ্যসাহিত্যে 'সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা'-র অবদান লেখো।

৬. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৭. অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায় কী ধরনের গদ্যরীতির প্রতিফলন ঘটেছিল?

৮. গদ্য সাহিত্যের প্রথমদিকে বাংলা সংবাদপত্রের অবদান উল্লেখ করো।

৯. উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার গুরুত্ব আলোচনা করো।

১০. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. কত সালে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা ঘটে?

২. উইলিয়াম কেরি রচিত দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো।

৩. প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থের নাম কী?

৪. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল?

৫. 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক কে?

৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শকুন্তলা' গ্রন্থের প্রকাশকাল লেখো।

৭. 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থটি কার লেখা?

৮. 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের রচনাকারের নাম কী?

৯. রামমোহন রচিত দুটি গদ্যগ্রন্থের নাম লেখো?

১০. 'যুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন?

৯.১১. গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণ মুখোপাধ্যায়, '*বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস*'।

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*'।

৩. গোপাল হালদার, '*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*', দ্বিতীয় খণ্ড।

৪. গোলাম মুর্শিদ, '*কালান্তরে বাংলা গদ্য*'।

৫. ভূদেব চৌধুরী, '*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*', দ্বিতীয় খণ্ড।

৬. শিপ্রা লাহিড়ী, '*ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্য*'।

৭. সজনীকান্ত দাস, '*বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস*'।

৮. সুকুমার সেন, '*বাংলা সাহিত্যে গদ্য*'।

৯. স্বপন বসু, '*উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র*'।

একক-১০ ❑ উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্য

গঠন

১০.১. উদ্দেশ্য

১০.২. প্রস্তাবনা

১০.৩. ঈশ্বরগুপ্ত: যুগ সন্ধিক্ষণের কবি

১০.৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়: স্বদেশপ্রেমিক কবি

১০.৫. নবজাগরণের যুগপুরুষ: কবি মধুসূদন দত্ত

১০.৬. বাংলা কবিতায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঞ্চার

১০.৬.১. কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১০.৬.২. কবি নবীনচন্দ্র সেন

১০.৭. গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী: ভোরের পাখি

১০.৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি

১০.৯. উনিশ শতকের অন্যান্য গীতিকবি

১০.১০. উনিশ শতকের মহিলা কবি

১০.১১. সারসংক্ষেপ

১০.১২. অনুশীলনী

১০.১৩. গ্রন্থপঞ্জি

১০.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্যের সূচনা, পটভূমি, বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে তাঁরা সম্যকভাবে অবহিত হতে পারবেন।
- দেববাদপুষ্ট গতানুগতিক বাংলা কাব্যসাহিত্য ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন প্রভৃতি কবিদের লেখায় কতখানি জাতীয়তাবাদী ভাবচেতনার বাহক হয়ে উঠেছিল এই বিষয়টি ছাত্রছাত্রীরা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গো ধারণালাভ করতে পারবেন।
- নবজাগরণ পর্বে বাংলা কাব্যে এপিক বা মহাকাব্যধারার একটি নবরূপ মধুসূদনের হাতে কীভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, সেই Literary Epic সম্পর্কে তাঁরা বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হবে।

- বাংলা সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইত্যাদি পাশ্চাত্যশৈলী বাংলা কবিতার ভুবনকে কতখানি সমৃদ্ধ করল ইত্যাদি সাহিত্যের প্রকরণগত দিক সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের মনের মধ্যে নতুন বোধ তৈরি হবে।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস বাংলা গীতিকাব্য তথা রোমান্টিক সাহিত্যের বিকাশকে কতখানি নবরূপ দান করল ছাত্রছাত্রীরা সেবিষয়ে অবহিত হবে।
- এই পর্বে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য ইত্যাদি নানাধরনের কাব্যরীতির বিশেষত্ব এবং বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কবিগোষ্ঠীর কলমে তার বিচিত্র প্রতিফলন ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

১০.২. প্রস্তাবনা

উনিশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই বাংলা কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবিদের হাতে বাংলা কবিতায় বিষয় ও সংরূপের দিকে ঘোর পালাবদল ঘটেছে। সাংবাদিক সত্তা কবিদের কাব্যভাবনাকে প্রভাবিত করেছে, পাশ্চাত্য কবিদের রচনাশৈলী বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এর নব নব সম্ভাবনা ও বিকাশের পথ ত্বরান্বিত করেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যধারার নবরূপ গড়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি বাংলার চিরাচরিত গীতিসাহিত্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কবিদের নিজেদের অভিব্যক্তি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পয়ারের চোদ্দ মাত্রা এবং প্রচলিত মিলবিন্যাসে ঘটেছে পালাবদল। বর্তমান অধ্যায়ে গৃহীত পাঠ পরিকল্পনায় নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যা থেকে নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানলাভে উপকৃত হবে।

১০.৩. ঈশ্বরগুপ্ত : যুগ সন্ধিক্ষণের কবি

উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কবিতায় কবি ঈশ্বরগুপ্তর (১৮১২-১৮৫৯) আবির্ভাব। এর পূর্বে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র পরবর্তী কবিওয়ালাদের আদিরসাত্মক লীলারসে পরিপূর্ণ ছিল কাব্যকবিতার জগৎ। মানুষের চিন্তাভাবনায় কোনো অভিনবত্ব আসেনি। সমাজজীবন ছিল চরম বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। কোম্পানির শাসনব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা অষ্টাদশ শতকে মানুষকে কোনো নতুন আদর্শে উৎসাহিত করেনি। আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, তরজা এবং কবিগানে কবিওয়ালারা পুরানো বিষয়কে নিয়েই মুখে মুখে কবিতা বেঁধেছিলেন। বিষয় বা আঙ্গিকের মধ্যেও কোনো নূতনত্ব ছিল না। এই রীতি অনুসরণ করেই উনিশ শতকে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। খণ্ড খণ্ড বিষয় নিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) কবিতা লিখেছিলেন। প্রেম-প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম, ঈশ্বর, ন্যায়নীতি ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বস্তুরসাত্মক কবিতা লেখা হয়েছিল। 'পাঁঠা', 'আনারস', 'তপসে মাছ', 'বড়দিন' প্রভৃতি ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছিলেন। 'পাঁঠা'কে নিয়ে লেখা কবিতায় দেখি—

'এমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা
নিজে সে-ই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা।।'

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-তির্যকতা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি জীবনকে দেখেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্য, আদর্শবাদে বিশ্বাসী কবি নতুন ভাবনাচিন্তা বা যুগের সংস্কারকে মেনে নিতে পারেননি। নারীশিক্ষা কিংবা ইয়ংবেঙ্গলদের আদর্শকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন তীক্ষ্ণভাবে।

নারীশিক্ষা নিয়ে তাঁর উক্তি—

‘যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতি বোল কবেই কবে।’

ইয়ংবেঙ্গলদের উদ্দেশ্য করে লিখলেন— ‘সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা’। বিলাতি মহিলা প্রসঙ্গে—

‘বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ফুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত ‘রোজ’ ফুটে’।

বিধবাবিবাহ নিয়ে লিখলেন—

‘অগাধ সাগর বিদ্যাসাগর তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের কুলতরী অকূলেতে কূল পেল না।।’

তিনি কবিওয়ালাদের ভাঁড়ামি ও স্থূল রঙ্গরসের আতিশয্য পরিত্যাগ করতে পারেননি। সমাজকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলিতে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী ও হালকা চাল ফুটে উঠেছিল। কোনো বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হতে পারেননি। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, “যাহা আছে ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি।... ঈশ্বরগুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরগুপ্ত Satirist.” ভাষাগত দিক থেকে তাঁর কবিতায় সংস্কৃতগন্ধী শব্দাড়ম্বরের প্রতি তেমন আনুগত্য দেখা যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন— “যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন এমন খাঁটি বাংলায়, এমন বাঙালির প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই, ইংরেজিনবিশী বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই, বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না-সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করে”।

১০.৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বদেশপ্রেমিক কবি

কবি ঈশ্বরগুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকায় সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই বাংলা কাব্যজগতের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)-এর আবির্ভাব। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজেও ছিলেন এডুকেশন গেজেট পত্রিকার সম্পাদক। উনিশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে তিনি রচনা করেন ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ (১৮৫৮) কাব্য। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যানকাব্য। স্বাদেশিকতা ও ইতিহাসের সমন্বয়ে রচিত দুই আদর্শবোধের

এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলোচ্য কাব্য। তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলির মধ্যে, 'ভেক মুষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮), 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)-র নাম উল্লেখযোগ্য। নবজাগরণ পর্বে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি সেইসময় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অন্যতম বাহক হয়ে উঠেছিল। বিশেষত, ক্ষত্রিয়দের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহবাণী—

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।।

তখন পরাধীন ভারতবাসীর মনে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে এই গান সমরসঙ্গীতের উৎসাহদান করেছিল। কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে বর্ণিত আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণ এবং সতীত্বরক্ষার জন্য জহরব্রতে পদ্মিনীর আত্মাহুতির কাহিনি অনুসরণে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। পদ্মিনী এই কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাব্যটি বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে রচিত। এই কাব্যে বীররস, করুণরস ও রৌদ্ররসের সমন্বয় দেখা যায়। পয়ার-ত্রিপদী-মালঝাঁপ-একাবলী প্রভৃতি ছন্দোগুণে কাব্যটি বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। স্বদেশের গৌরবগাথা উজ্জ্বলভাবে এই কাব্যে ফুটে উঠেছিল। আলোচ্য কাব্যের পদ্মিনীর জহরব্রতে আত্মত্যাগের ঘটনা রোমান্সের স্পর্শে উজ্জ্বলরূপ লাভ করেছিল। পদ্মিনীর রূপ-মহিমা বর্ণনায়, 'কোন মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে'— শেক্সপীরীয় ভাবধারার ছায়াপাত ঘটেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত রীতি-আদর্শের অনুসরণ, ছন্দোভাবনার ছায়াপাত একদিকে যেমন এই আখ্যানকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছিল অন্যদিকে কর্ণেল টড, টমাস ম্যুর, স্কট ও শেক্সপীয়রের রচনারীতির ছায়াপাত তাঁর কাব্যের নানা অংশে প্রত্যক্ষ করা যায়। 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যটি প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণে রচিত হয়েছিল। তিনি ভেক-মুষিকের যুদ্ধ নামে হোমারের কাব্যেরও অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব', 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের তিনি বাংলা অনুবাদ করেছেন।

১০.৫. নবজাগরণের যুগপুরুষ : কবি মধুসূদন দত্ত

নবজাগরণের যুগপুরুষ রূপে বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাব। বিষয় ও রূপের দিক থেকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বাংলা কাব্যকে তিনি দিয়েছিলেন কালজয়ী অমরত্ব। মাত্র অল্পকালের জন্য আবির্ভূত হয়েও মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপের দিক থেকে নতুনত্ব সঞ্চার করেছিলেন। মধুসূদন দত্তের রচনাসম্ভার: 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)।

তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে দিয়ে এই কাব্যকে তিনি এক অভিনব রূপদান করলেন। এই ছন্দেই তিনি রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। কাব্যটি পরিকল্পনায় কবি মহাকাব্যসুলভ ভাবসমুন্নতি বজায় রাখলেন। উনিশ শতকের মধ্য পর্বে রচিত আলোচ্য কাব্যটি হয়ে উঠল বাংলার প্রথম Literary Epic। জাতীয়তাবাদের উজ্জ্বল আদর্শে রাম-লক্ষ্মণ-রাবণ-বিভীষণ প্রভৃতি চরিত্র পরিকল্পনায় এল অভিনবত্ব। 'দেবাশ্রিত দাস' রামচন্দ্র তাঁর মানসিক স্বীকৃতি পায়নি— 'I despise

Ram and his rabbles', পরিবর্তে রাবণ হয়ে উঠলেন 'Grand fellow'। রাম, রাবণের পৌরাণিক মহিমা এই কাব্যে অপসৃত হল। রাবণ ও মেঘনাদের জাতীয়তাবোধ পরাধীন ভারতবর্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ক্লাসিক আদর্শ ও বীররসের সমন্বয়ে কাব্যটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মেঘনাদবধ কাব্যে উজ্জ্বল নারীচরিত্র প্রমীলা। বাঙালি লোকমানসের চিরায়ত সংস্কারের সে এক মূর্তিমান বিদ্রোহ। উনিশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজে প্রমীলা দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছে—

'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।'

'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিল। মহাকাব্যের রীতি অনুসরণ করে কবি এই কাব্যে সর্গবিভাগ করেছেন। নয়টি সর্গে বিন্যস্ত কাব্যে বীরবাহুর নিধন সংবাদ থেকে মেঘনাদ হত্যা এবং চিতারোহণ পর্যন্ত তিনদিন ও দুইরাত্রির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। স্বর্গ-মর্ত্য জুড়ে সঞ্চারিত হয়েছে কাব্যের ভাবাবেগ। নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের ধীরোদাত্ত ভাবের পরিবর্তে বাল্মীকি বা পাশ্চাত্য আদর্শের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। মেঘনাদের বলিষ্ঠতা ও বীর্যবত্তায় ভার্জিল, হোমার, দান্তে বা ট্যাসো ইত্যাদি পাশ্চাত্য কবিদের রচনারীতি অনুসরণ করেছেন। নায়ক চরিত্রকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে মহাকাব্যিক সমুন্নতিদান করেছেন 'কর্বুরকুলের গর্ব মেঘনাদ বলী'।

রোমান কবি ওভিদের (Ovid) এর 'হিরোইডস' (Heroides) বা 'এপিস্টলস অফ হিরোইনস' (Epistles of Heroines) এর আদর্শে রচিত হয়েছিল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গানা কাবা' (১৮৬২)। কাব্যটিতে স্বামী বা প্রেমাস্পদকে উল্লেখ করে ভারতীয় পুরাণের এগারোজন নারীর বিরহভাবনা স্থান পেয়েছে। নারীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এই কাব্যের অন্যতম লক্ষণ। কবিতাগুলিতে পৌরাণিক পটভূমিতে গীতিরস ও নাট্যরসের সুর সঞ্চারিত হয়েছে। নারীদের ব্যক্তিহৃদয়ের নিভৃত সংলাপের মধ্যে dramatic monologue বা নাটকীয় একোক্তির লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

শুধু মহাকাব্য নয়, গীতিকাব্যের আদর্শে মধুসূদন দত্ত রচনা করলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬)। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অষ্টক ও ষটকের মিলবিন্যাস রীতিতে পেত্রার্ক ও মিলটন দুই কবির আদর্শকে অনুসরণ করলেন। গ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ১০২টি। গীতিরসসিক্ত কবিতাগুলিতে কবির নিভৃত হৃদয়ের অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের 'আত্মবিলাপ' (১৮৬২) ও 'বঙ্গাভূমির প্রতি' (১৮৬২) কবিতা দুটি বাংলা লিরিক কবিতার বিশিষ্ট সুরমাধুর্যে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। 'আত্মবিলাপ' কবিতায় লিখলেন—

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায় তাই ভাবি মনে'

'বঙ্গাভূমির প্রতি'- কবিতায় দেখি—

'রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ কোকনদে।'

বাংলা সনেটের আদিরূপটি এই কবিতাগ্রন্থে দেখা গেল। পেত্রার্কীয় সনেটের মিলবিন্যাসরীতি যেমন এই কাব্যে অনুসৃত হয়েছে, তেমনি শেক্সপীরীয় সনেটের মিলবিন্যাসের রীতি ও আদর্শ অনুসরণে কবিতা রচনা করে সনেট রীতির বিষয়বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলেন। এই প্রসঙ্গো বন্ধুকে চিঠিতে লিখলেন, "I Want to introduce the sonnet into our language". নস্ট্যালজিক ভাবনা ও গীতিকবিতার সুরে রচিত চতুর্দশপদী সনেটগুলি বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

১০.৬. বাংলা কবিতায় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সঞ্চার

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯) প্রভৃতি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ শাসকের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ ক্রমশ আস্থা হারাতে থাকে। প্রায় একই সময়ে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুমেলা (১৮৬৭) ভারতসভা (১৮৭৬) প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠিত হয়। শিক্ষিত বাঙালির মনে সেইসময় প্রবলভাবে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ বেশ কিছু কবির কবিতায় দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি গৌরব, স্বদেশের দুর্দশার জন্য বিলাপ শোনা যায়। দেশীয় পুরাণের অনুসরণ, বিভিন্ন কাব্য-কবিতা ও মহাকাব্য রচনাপ্রয়াসের মধ্যে দিয়েও তাঁদের স্বদেশপ্রীতি ধরা পড়ে।

১০.৬.১. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সঞ্চার করেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)। তাঁর 'ভারতসঙ্গীত' কবিতাটি 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। আখ্যান কাব্য, খণ্ড কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কবিতা তিনি রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১), 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪), 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), 'কবিতাবলী' (১৮৭০, ১৮৮০), 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮), 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫, ১৮৭৭), 'নাকে খৎ' (১৮৮৫)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদনের অনুসরণে রচিত 'বৃত্রসংহার' কাব্যটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কাব্যটি দুটি খণ্ডে রচিত। খণ্ডগুলি যথাক্রমে ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে পুরাণ অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হয়েছে। ২৫টি সর্গে বিধৃত আলোচ্য কাব্যটির মধ্যে তিনি মহাকাব্যিক বিশালতা বা দৈর্ঘ্য বজায় রেখেছেন। মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের পরে একমাত্র এই কাব্যেই মহাকাব্যের ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে। বিষয়বস্তুতে দেখা যায়, শিবভক্ত বৃত্রাসুর স্বর্গ থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হলেন। ধর্মাধর্ম বিসর্জন দিয়ে পত্নী ঐন্দ্রিলার অনুরোধে তিনি পুত্র রুদ্রপীড়কে দিয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে অপহরণ করলেন। বৃত্রাসুরের নীতিহীন ক্রিয়াকর্মে ক্ষুব্ধ হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। দেবতারা তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি দেবতাদেরকে বৃত্রাসুর বধের উপায় বলে দিলেন। দেবতারা ব্রহ্মার নির্দেশ মেনে দধীচি মুনির কাছে

উপস্থিত হয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্রে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন। যদিও এই কাব্যের চরিত্রসৃষ্টিতে মহাকাব্যের ভাবসমুন্নতি বজায় থাকেনি। কবি মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র অনুসরণে বৃত্রাসুর কাব্যের চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'আশাকানন' (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০) উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য দুটি দান্তের 'দিভিনা কোমোডিয়া'-র অনুসরণে লেখা হয়েছিল। 'বিবিধ কবিতা' বইতে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি রয়েছে। এছাড়া তাঁর লেখা পৌরাণিক কাব্য 'দশমহাবিদ্যা' ও নীতিমূলক কবিতার সংকলন 'চিত্তবিকাশ'। উনিশ শতকের বাঙালির স্বদেশচিন্তা ও সামগ্রিক মূল্যবোধের ছবি ধরা পড়েছে ছন্দকুশল হেমচন্দ্রের লেখায়। শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থই বলেছিলেন—'বাঙালি যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।'

১০.৬.২. নবীনচন্দ্র সেন

হেমচন্দ্র সমকালীন আর এক উল্লেখযোগ্য খ্যাতিমান কবি হলেন নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮) প্রকাশিত হয় দুটি খণ্ডে। ১৮৭৫ সালে তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য প্রকাশিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়েন। তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১, ১৮৭৮), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), 'রঙ্গামতী' (১৮৮০), 'খ্রীষ্ট' (১৮৯১), 'অমিতাভ' (১৮৯৫), 'অমৃতাভ' (১৯০৯)। ত্রয়ী কাব্য তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট কাব্য। তাঁর ত্রয়ী মহাকাব্য হিসেবে 'রৈবতক' (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়।

বাংলা কথাসাহিত্যে নবীনচন্দ্র সেনের প্রতিভা ও খ্যাতির স্বীকৃতি ঘটেছিল 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে। কাব্যটি মতিলাল ঘোষের প্রভাবে তিনি রচনা করেছিলেন। কাব্যটি মূলত স্বদেশি ভাবধারায় রচিত আখ্যানকাব্য। কাব্যটি পাঁচটি সর্গে বিন্যস্ত। নবাবি মসনদ থেকে সিরাজকে অপসারণের জন্যে জগৎশেঠ, মীরজাফর ষড়যন্ত্র করে। যার সুযোগ নিয়েছিল রবার্ট ক্লাইভ, শেষে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর মাঠে সিরাজের পরাজয়, পলায়ন এবং ধরা পড়ে নিহত হওয়ার ঘটনা এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু। মনে রাখতে হবে, রঙ্গালাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিরা পৌরাণিক বিষয় কিংবা রাজস্থানের কাহিনি অনুসরণে স্বদেশপ্রেমের কথা বলেছেন। নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শক্তিকে কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। পরাধীনতার মর্মজ্বালার মুহূর্তে কবি অগ্নিস্রাবী ভাষা ব্যবহার করেছেন। ছন্দ ও ধ্বনি ঝংকারে তা বীররসে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাপাঁইয়া রণস্থল
কাপাঁইয়া গঙ্গাজল,
কাপাঁইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি'।

যদিও অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের কারণে এটি প্রথম শ্রেণির কাব্যের মর্যাদালাভ করতে পারেনি।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্যধর্মী কাব্যকল্পনার স্বাক্ষর তাঁর ত্রয়ী কাব্য। 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬)—নামক কাব্য তিনটিতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথাই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণজীবনকে অবলম্বন করে কবি কাব্যত্রয়ের পরিকল্পনা করেছেন। কাব্য তিনটিতে সমকালের প্রেক্ষাপটে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। প্রথম খণ্ড ('রৈবতক')-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা। দ্বিতীয় খণ্ডে ('কুরুক্ষেত্র')-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যলীলা। তৃতীয় খণ্ডে ('প্রভাস')-ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের কৃষ্ণকথা অবলম্বনে কাব্যটির পরিকল্পনা করেছেন কবি। কাব্যের মধ্যে কবির মৌলিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। যুগধর্মের প্রভাবে তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র শ্রেষ্ঠ মানব বা মহামানবরূপে কল্পিত হয়েছে। কাব্যটি পুরাণ ও আখ্যান কাব্যের সমন্বিত রূপ। এটিকে উনিশ শতাব্দীর মহাভারত রূপে আখ্যাত করা হয়। যদিও চরিত্র পরিকল্পনায়, বিষয়বিন্যাসে মহাকাব্যোচিত সংহতি বজায় থাকেনি। রসসৃষ্টিতে, ক্লাসিক গাম্ভীর্যে, ছন্দোনির্মাণে কাব্যের মধ্যে সর্বত্র কবি সমতা রক্ষা করতে পারেননি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসারী মহাকবি হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও নবীনচন্দ্র সেন বেশ কিছু গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ পরিবেশ বর্ণনায়, বিষয় ও চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন দত্তের প্রতিভার যে বিরাট সমুন্নতি ধরা পড়েছিল সেই ভাবগভীরতা পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের ছিল না। হেমচন্দ্র ছিলেন কাব্যানুরাগী সামাজিক ব্যক্তি, নবীনচন্দ্রও তাই। বৃত্রসংহার কাব্যে হেমচন্দ্র সজীবতা বা উত্তাপ সঞ্চার করতে পারেননি। তাঁর কাব্য মেঘনাদবধ কাব্যের ছায়ানুসরণে রচিত, চরিত্র পরিকল্পনায়ও একই আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ওজোগুণ বা আবেগমুক্তির গুরুত্ব না অনুভব করে তিনি শুধু মিলহীন পয়ার ছন্দোনির্মাণ করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্যেও কাহিনিগত সাম্য বা সমতা বজায় থাকেনি। তাঁর কাব্যে অতিরিক্ত আবেগ-উচ্ছ্বাস মহাকাব্যের ক্লাসিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল। এইসময় গীতিরসের স্নিগ্ধ মাধুর্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী লিখলেন 'সারদামঙ্গল কাব্য'। কবির ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস ধরা পড়ল সমসাময়িক কাব্যে। যে ধারার পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তরসূরির অভাবে মহাকাব্যধারার অবলুপ্তি ঘটল আর উত্তরসূরির প্রভাবে গীতিকাব্যের রূপ-রস-ঐশ্বর্য নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠল।

১০.৭. গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী : ভোরের পাখি

কবির আত্মমগ্ন ভাবকল্পনা সংগীত ও সুরের মধ্যে দিয়ে যে কবিতায় প্রকাশিত হয়, সৌন্দর্য ও অসীমের ব্যঞ্জনাসঞ্চার করে সেই কবিতাকে বলা হয় গীতিকবিতা। মন্ময়তা (Subjectivity) গীতিকবিতার প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের প্রকাশ'। সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দবিধান গীতিকবিতার একমাত্র উদ্দেশ্য। আধুনিক গীতিরসের স্রষ্টা বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) প্রকৃতিমূলক কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতোই ব্যক্তিগত অনুভূতির রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি যথার্থই 'ভোরের পাখি'। তাঁর প্রথম যথার্থ কাব্য 'সংগীতশতক' (১৮৬২)। তাঁর আলোচ্য কাব্যে সৌন্দর্যমগ্ন কবি কল্পনার প্রকাশ ঘটেছিল। যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'সারদামঙ্গল' কাব্য। কাব্যটি পাঁচটি সর্গে বিন্যস্ত। শেলির 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতায় যে সৌন্দর্যচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়, আলোচ্য কাব্যে সেই অসীম সৌন্দর্যমূর্তি কল্পনা করেছেন কবি বিহারীলাল—

"প্রত্যক্ষে বিরাজমান
সর্বভূতে অধিষ্ঠান
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের মনের কথা বলিলেন। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গারূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল"। রোমান্টিক গীতিকবিতার সুরে তিনি লিখলেন, 'সংগীতশতক' (১৮৬২), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), 'সারদামঙ্গাল' (১৮৭৯) সাধের আসন' (১৮৮৯) প্রভৃতি কাব্য।

'সারদামঙ্গাল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠকাব্য। গীতিরস সিক্ত হয়ে উঠেছে এই কাব্যের কবিতাগুলি। কবি লিখলেন, 'মৈত্রীবিরহ প্রীতিবিরহ ও সরস্বতীবিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গাল সংগীত রচনা করি'। 'বঙ্গাসুন্দরী' কাব্যে নারীবন্দনার রোমান্টিক রীতি অনুসৃত হয়েছে। আবেগাতুর কবিমনের ভাবপ্রশস্তি এই কবিতাগুলিতে লক্ষ করা যায়। 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যে জড়প্রকৃতির প্রাণময় সত্তা ফুটে উঠেছে। নারী, নিসর্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুকে ঘিরে কল্পনাস্নিগ্ধ কবিমনের সৌন্দর্যচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সারদাধ্যানে কবি লিখেছেন—

'তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি
তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই।'

অপার্থির সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর সাথে কবির বিরহ-মিলন কল্পনা অপরূপ রূপলাভ করেছে। বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গাল' কাব্যে সরস্বতী বন্দনা করতে গিয়ে ভাবাবেশে আকুল হয়েছিলেন। দেবী সরস্বতী বা সারদা বিশ্বসৌন্দর্যের সারভূত প্রকাশ। ভাব-কল্পনার সমুন্নত আদর্শে কবি বিহারীলাল কাব্যরচনা করলেও ভাব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তাঁর ছিল না। রসগভীর ভাবকল্পনার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত নীরস শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যা কবিতার রসগ্রহণে বাধাসঞ্চার করেছে। 'দারুণ আগুন শুধু ধূ-ধু-ধূ-ধূ ধায়' কিংবা 'পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায়'ইত্যাদি তাঁর পংক্তি, উপমাপ্রয়োগ কবিতার ভাবধারাকে দুর্বল করে দিয়েছে। ভাব ও ভাষার মধ্যে কবি সমতা রক্ষা করতে পারেননি।

বিহারীলালকে 'ভোরের পাখী' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিভৃত সংগীতধর্মিতাই ভোরের পাখির গানের প্রধান বাণী। বৃক্ষশাখায় বসে আপনমনে পাখি সংগীতে-মাধুর্যে একটি নতুন প্রভাতের আবির্ভাবলগ্ন ঘোষণা করে। প্রভাতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ তার গানে অসীমত্বের দ্যোতনা জাগিয়ে তোলে। রূপের মধ্যে অরূপের ব্যঞ্জনা পাখির গানের প্রধান ধর্ম।

১০.৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। 'ভারতী' পত্রিকা (১৮৭৭) প্রকাশকালে পারিবারিক আবহাওয়ায় তিনি কাব্য রচনা করলেন। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত 'কবিকাহিনী' তাঁর প্রথম মুদ্রিত

পুস্তক। একই সময়ে রচিত 'বনফুল' একটি আখ্যানমূলক কাব্য। প্রথমদিকে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কাল পর্যন্ত কবিমনে যে বিষাদ বিধুরতা ছিল পরে 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে সেই বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হয়ে কবি রচনা করেন 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্য। এই কাব্যে কবি লিখলেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন তার কবিচিত্তকে আকুল করে তুলেছিল এই পর্বে। তাঁর উন্মেষপর্বে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান'(১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) উল্লেখযোগ্য। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে জগত ও জীবন তাঁর কাছে আশ্চর্য সুন্দররূপে প্রতিভাত হল। তিনি লিখলেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।।

এরপর রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্যপর্বের কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। এই পর্বে রচিত কাব্যগুলি হল, 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), চৈতালি' (১৮৯৬)। ঐশ্বর্যপর্বের কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল পূর্ববঙ্গো নদী ও নিসর্গের নিবিড় সান্নিধ্যে। দেশ-কাল ও প্রাত্যহিক জনজীবনের ছোটোখাটো চিত্র, নিসর্গ প্রকৃতি, নদীচুম্বিত জীবনের রূপ এইসব কবিতাগুলিতে অসীমের রূপকে ভাষা পেয়েছে। চিত্রের সাথে সংগীতের, সীমার সাথে অসীমের, অন্তরের সাথে বাইরের, ভাবের সাথে ভাষার মেলবন্ধনের রূপটি এইসব কবিতার অন্যতম প্রধান সম্পদ। 'সোনার তরী', 'চিত্রা' কাব্যে জীবনদেবতার অদৃশ্য উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেল। তিনিই কবির ইঙ্গিত দেবতা, কবির কাব্যলক্ষ্মী। তিনি কখনো নারী, কখনো পুরুষ। 'চিত্রা'-কাব্যের প্রথম কবিতায় দেখি—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।।'

রূপ বা প্রকরণের দিক থেকেও এই চারটি কাব্যে রবীন্দ্র কবিচেতনার বিশিষ্ট ভাবনাটি ফুটে উঠেছে। সুর ও ছন্দ বিশেষত মিত্রাক্ষর যোজনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধরা পড়েছে 'সোনার তরী', 'চিত্রা' পর্বের কবিতাগুলিতে। 'চৈতালী'-তে সনেটের ভাবসংহতির মধ্যে কবি যাত্রা করেছেন অতীত ভারতবর্ষে। কল্পনা ও সৌন্দর্যের এক অপরূপ সমন্বয় কবিতাগুলোর অন্যতম দিক।

১০.৯. উনিশ শতকের অন্যান্য গীতিকবি

উনিশ শতকের শেষপর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাবে আত্মভাবপ্রধান বাংলা গীতিকাব্যের ধারা বিশেষভাবে উঠে এল। কবিদের অন্তর্লীন অনুভূতি, আত্মমগ্নতা, অধ্যাত্মভাবনা তাঁদের কাব্যচেতনাকে

বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। প্রেম-প্রকৃতিকে কেবল সাধারণ বস্তুরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না, প্রেমের একটি অতিলৌকিক ব্যঞ্জনা বা ধ্যানতন্ময় রূপ হয়ে উঠল তাঁদের কাব্যের প্রধান সম্পদ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) প্রমুখ বহু কবি সেই ধারায় প্রভাবিত হলেন।

উনিশ শতকের গীতিকবিতার ধারায় বাংলা সাহিত্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের আবির্ভাব। বিহারীলালের কাব্যেরসের ধারায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর কাব্য পরিকল্পনায় রোমান্টিক ভাবাবেগের পাশাপাশি ক্লাসিক দিকও উঠে এসেছে। তাই আবেগ-উচ্ছ্বাসের তারল্য বা আতিশয্য তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। নারীপ্রেমকে অবলম্বন করে তিনি লিখেছেন 'মহিলা কাব্য'। তিনি নারীর গৃহচারিণী মূর্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পর্বেই বিহারীলালের অনুসরণে কাব্যরচনায় প্রভাবিত হয়েছেন অক্ষয়কুমার বড়াল। প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্য তাঁর কাব্যের মুখ্য বিষয়। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' তার অন্যতম কাব্য। শেলি ও কিট এর মতো তিনি রোমান্টিক স্বপ্নজগতে বিহার করেছেন। পরের দিকে স্ত্রী-বিয়োগকে কেন্দ্র করে রচিত তার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'এষা', যা তাঁর পরিণত মনের শোককাব্য হয়ে উঠেছে। এই পর্বে গীতিকাব্যের ধারায় অপর এক কবি রবীন্দ্র সমসাময়িক দেবেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর কবিতার মধ্যে জগৎ ও জীবনের প্রতি তাঁর প্রসন্নচিত্তের প্রতিফলন ঘটেছে। গীতিকবিতা রচনার পাশাপাশি তিনি সনেটও রচনা করেছেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে আবেগের আতিশয্য বা প্রেমের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নয়, আধুনিক গীতিকাব্যের পরিশীলিত রূপ তাঁর কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর একটি বিশিষ্ট গীতিকাব্য 'উর্মিলা'। 'অশোকগুচ্ছ', 'অপূর্ব নৈবেদ্য' ইত্যাদি তাঁর আধুনিক গীতিকাব্য, যেগুলি বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে রচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবেগ-উচ্ছ্বাসের তারল্যের পরিবর্তে তাঁর প্রসন্ন মনের ছায়াপাত ঘটেছে।

১০.১০. উনিশ শতকের মহিলা কবি

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্ব থেকেই নারী শিক্ষার ক্রমশ প্রসার ঘটতে শুরু হল। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানাপ্রথায় জর্জরিত নারী এখন আত্মপ্রকাশের নতুন পথ খুঁজে পেল। এইসময় 'বঙ্গমহিলা', 'বামাবোধিনী', 'ভারতমহিলা' প্রভৃতি বেশ কিছু পত্রিকায় মেয়েরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। তবে বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের সূচনা হলেও মেয়েদের কবিতায় মূলত গীতিরসাত্মক দিকটাই মুখ্য হয়ে উঠল। প্রেম-প্রকৃতি, গার্হস্থ্যজীবন প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীর মর্মবেদনা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি দিক ধ্বনিত হয়ে উঠল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য মহিলা কবিদের মধ্যে ছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় এবং মানকুমারী বসু প্রমুখ।

প্রথমেই উঠে আসে স্বামী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) নাম। পতি হারানোর বিরহবেদনা তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'ভারত কুসুম' (১৮৮২) 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাষ' (১৮৯০), 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' (১৯০২), 'স্বদেশিনী' (১৯০৬), 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭) প্রভৃতি। গ্রাম্যজীবনের প্রশান্ত স্নিগ্ধ ছবি তিনি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর ‘ভারত কুসুম’ কাব্যের ‘পতিভক্তি’ কবিতাটি পত্নীর আত্মনিবেদনের চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করে লেখা। তাঁর ‘অশ্রুকণা’ কাব্যের অনেক কবিতায় মৃত স্বামীর বেদনাময় স্মৃতিতে পূর্ণ। কবি ‘কোথায়’ কবিতায় তাঁর মর্মবেদনা ব্যক্ত করেন এইভাবে—

“কোথায় গিয়েছে, কোথায় রয়েছে
পাব কি আবার হায়!
দেহান্তে কি আছে কে মোরে বলিবে!
দেহান্তে পাব কি তায়!”

পতি হারানোর বেদনাময় স্মৃতি মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)-র কবিতাতেও ফুটে উঠেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সে বৈধব্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি রচনা করেন ‘প্রিয় প্রসঙ্গ’ বা ‘হারানো প্রণয়’ (১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থটি। মানকুমারী রচিত অন্যান্য কাব্যগুলি হল ‘কাব্যকুসুমাঞ্জলি’ (১৮৯৩), ‘কনকাঞ্জলি’ (১৮৯৬), ‘বীরকুমারবধ কাব্য’ (১৯০৪) প্রভৃতি। প্রেমের আদর্শময় রূপ তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়। মানকুমারী বসুর কাব্যে পতিপ্রেম, গার্হস্থ্যজীবনের কথা যেমন আছে তেমনি ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ধ্যানতন্ময় চিত্তের প্রশান্ত নিবেদনের ছবিও উঠে এসেছে। তাঁর কবিতা সহজ-সরল, নিরাভরণ ভাবের অন্যতম বাহন। যদিও ‘বীরকুমার বধ’ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিমনা, শিক্ষিতা। এবং তার কবিতায় আত্মমগ্ন ভাবের পরিচয়টুকু ফুটে উঠেছেন। প্রণয়মুগ্ধতা বা নারী প্রেমের দিকটি তিনি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। বিচ্ছেদকাতরতার দিকটিও যে উঠে আসেনি তা নয়। কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থ হল-‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯), ‘নির্মাল্য’ (১৮৯১), ‘মাল্য ও নির্মাল্য’ (১৯১৩), ‘অশোক-সঙ্গীত’ (১৯১৪), ‘দীপ ও ধূপ’ (১৯২৯), ‘জীবনপথে’ (১৯৩০) ইত্যাদি। ভাবের সঙ্গে ভাষার পরিমিতিবোধ, ভাষাগত সংযম ও শালীনতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস ও নাট্যচর্চার পাশাপাশি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন। ‘গাথা’ কাব্যগ্রন্থটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন ছোটোভাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, কাব্যগ্রন্থের উপহার পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—

‘ছোট ভাইটি আমার,
যতনে গাথা হার কাহারে পরাব আর
স্নেহের রবিটি, তোরে আয়রে পরাই,
যেন রে খেলার ভুলে ছিঁড়িয়ে ফেলোনা খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই-তাইতে ডরাই।’

স্বর্ণকুমারী দেবী গীতিকাব্যের সুরে দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন। সমর সঙ্গীত, রণসঙ্গীত সার্থক দেশাত্মবোধক কবিতা। স্বর্ণকুমারী দেবী চারটি প্রণয় কাহিনিমূলক গাথাকাব্য রচনা করেন ‘সাধের-ভাসান’, ‘সাশ্রু সম্প্রদান’, ‘খড়া-পরিণয়’ ও ‘অভাগিনী’। ‘অভাগিনী’ একটি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য। মূলত তাঁর কবিতায় গীতিকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলাল এর প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে সামাজিক ও পারিবারিক নানা

বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে মেয়েরা যে লেখালেখির চেষ্টা করেছেন সেদিকটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁরা পারেননি। প্রেম, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা, গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য, বৈধব্য জীবনযন্ত্রণা, একাকিত্ব ইত্যাদি বিষয় তাঁদের কবিতার মর্মবস্তু হয়ে উঠেছে।

১০.১১. সারসংক্ষেপ

নবজাগরণের প্রভাবে ধর্ম-শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এলো পরিবর্তন। ইংরেজি শিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম, ইয়ংবেঙ্গাল গোষ্ঠীর প্রেরণা ও প্রভাব মানুষকে নতুনতর বোধে সঞ্জীবিত করল। এই পরিমণ্ডলে 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক রূপে আবির্ভূত হলেন ঈশ্বরগুপ্ত। খণ্ড খণ্ড বিষয় নিয়ে এই পর্বে কবিতা লিখলেন তিনি। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় দেববাদের কথা না থাকলেও সমসাময়িক জাতীয়তাবাদের কথাও তিনি কবিতায় প্রকাশ করেননি। বরং নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি উনিশ শতকের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন তিনি প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। সেদিক থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যেই প্রথম স্বদেশচেতনার সুর শোনা গেল। 'স্বাধীনতা' শব্দের একটা অনুরণন কবিতাপ্রিয় বাঙালি পাঠক অনুভব করতে পারল। নবজাগরণের পর্বে বাংলা কবিতার সফল শিল্পী হলেন মধুসূদন দত্ত। পাশ্চাত্য আদর্শ মেনে তিনি কাব্যের মধ্যে ক্লাসিক গাম্ভীর্য সৃষ্টি করলেন বিষয়ের মধ্যে যেমন নিয়ে এলেন অভিনবত্ব, ঠিক তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে কবিতার রীতিতে আনলেন পালাবদল। মধুসূদন দত্তকে অনুসরণ করে কাব্য প্রণয়নে ব্রতী হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবিবৃন্দ। হেমচন্দ্র যেমন 'বৃত্রসংহার কাব্য' লিখলেন, নবীনচন্দ্র সেন ত্রয়ী কাব্যে কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করলেন। অন্যদিকে একই সময়ে 'ভোরের পাখি'-র কাকলিধ্বনিতে বিহারীলাল চক্রবর্তী ঘোষণা করলেন আর এক নতুন প্রভাতের আগমন বার্তা। ফলে একই সময়ে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য এবং গীতিকাব্যের ধারা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে চলল। ঠিক এইসময় বাংলা গীতিকাব্যকে এক নতুন পরিসরে মেলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা কাব্যভুবনে তিনি এক নতুন দিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন।

১০.১২. অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. ঈশ্বরগুপ্তকে যুগ সন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় কেন?

২. ঈশ্বরগুপ্তের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৩. মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যকে কী কারণে মহাকাব্যিক মর্যাদায় ভূষিত করা হয়?

৪. বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-র গুরুত্ব আলোচনা করো।

৫. বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬. গীতিকবি হিসেবে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন করো।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্যপর্বে রচিত কাব্যগুলির পরিচয় দাও এবং এই পর্বের কাব্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৮. মহাকাব্য বলতে কী বোঝায়? উনিশ শতাব্দীতে মহাকাব্যধারার অবলুপ্তির কারণ কী ?

৯. উনিশ শতকে বাংলার কয়েকজন অপ্রধান গীতিকবি ও তাঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

১০. উনিশ শতকে বাংলার কয়েকজন মহিলা কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গগুলি লেখো।

২. ঈশ্বরগুপ্তের কবিপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

৩. মধুসূদন দত্ত রচিত কাব্যগুলির নাম লেখো।

৪. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাব্যগুলির নাম লেখো।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্যপর্বের কাব্যগুলির নাম লেখো।

৬. বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের অসম্পূর্ণতার দিকগুলি উল্লেখ করো।

৭. ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যটি কী কারণে বিখ্যাত ?

৮. বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যে ‘ত্রিবিধ বিরহ’ বলতে কী বোঝ ?

৯. নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ীকাব্যের বিষয়বস্তু উল্লেখ করো।

১০. বিহারীলাল চক্রবর্তীকে ‘ভোরের পাখি’ কেন বলা হয়?

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. মধুসূদন দত্তের লেখা পত্রকাব্যের নাম লেখো।

২. মধুসূদন দত্তের সনেট কী নামে পরিচিত ছিল ?

৩. সনেট জাতীয় কবিতা কয়টি অংশে বিভক্ত ও কী কী ?

৪. সারদামঙ্গল কাব্যটি কার লেখা ?

৫. বিহারীলাল চক্রবর্তীর কোনকাব্যে নারী সৌন্দর্যের প্রশস্তি আছে ?

৬. নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যের নাম লেখো।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দুই পাখি’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ?

৮. উনিশ শতাব্দীর দু’জন মহিলা কবির নাম লেখো।

৯. ‘পলাশীর যুদ্ধ’ কাব্যের কবির নাম কী ?

১০. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল লেখো।

১০.১৩. গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*উনিশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*'।

২. ড. ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত '*মধুসূদন রচনাবলী*'।

৩. গোপা দে, '*উনিশ শতকের তিন নারী কবি*'।

৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়— '*আধুনিক বাংলা কাব্য*'।

৫. শ্রী ত্রিপুরাশঙ্কর সেন— '*উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য*'।

৬. ময়ূখ চৌধুরী, '*উনিশ শতকের নবচেতনা ও বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি*'।

৭. যোগীন্দ্রনাথ বসু — '*মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*'।

৮. ড. শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রী হরিবন্ধু মুখটি সম্পাদিত '*রঙ্গলাল রচনাবলী*'।

৯. শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত '*হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী*'।

১০. শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত '*নবীনচন্দ্র রচনাবলী*'।

১১. ড. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*' (তৃতীয় খণ্ড)।

একক-১১ ❑ উনিশ শতকের বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা

গঠন

১১.১. উদ্দেশ্য

১১.২. প্রস্তাবনা

১১.৩. 'যাত্রা'-রীতির চর্চা ও পাশ্চাত্য থিয়েটার

১১.৩.১. 'যাত্রা'-রীতি: বাংলার সনাতন ঐতিহ্য

১১.৩.২. কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি থিয়েটার ও গেরাসিম লেবেদফ

১১.৪. সখের থিয়েটার ও বাংলা নাটক রচনার আদিপর্ব

১১.৪.১. আদিপর্বের অপ্রধান নাট্যকারগণ

১১.৪.২. নাটুকে রামনারায়ণ

১১.৫. পঞ্চাঙ্ক রীতির নাট্যধারার সূচনা

১১.৫.১. মধুসূদন দত্ত

১১.৫.২. দীনবন্ধু মিত্র

১১.৬. পৌরাণিক ও অপেরাধর্মী নাট্যধারা: মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়

১১.৭. পেশাদারি থিয়েটারের যুগ

১১.৭.১. জাতীয়তাবাদী নাট্যচর্চার বিকাশ

১১.৭.২. নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

১১.৮. নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১.৯. রসরাজ অমৃতলাল বসু

১১.১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা নাটক

১১.১১. সারসংক্ষেপ

১১.১২. অনুশীলনী

১১.১৩. গ্রন্থপঞ্জি

১১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ করতে পারবেন—

- বাংলা নাটকের আদিরূপ কীভাবে বাংলার যাত্রা, কথকতা, পাঁচালির মধ্যে চিত্রিত রয়েছে তা বুঝতে পারবেন।
- একসময়ের জনপ্রিয় যাত্রাপালা, পূরাণিক ঐতিহ্য থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে বাংলা নাটকের জন্ম হয়েছে তা জানতে পারবেন।
- প্রথম পর্বের বাংলা নাটক অভিনয় ও মঞ্চ সফলতার ক্ষেত্রে বাংলার জমিদারগোষ্ঠী ও ইংরেজ দর্শকদের ভূমিকা ও তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা এই একক থেকে জানা যাবে।
- ছাত্রছাত্রীরা রঙ্গামঞ্চের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- আধুনিক পঞ্চাঙ্ক রীতির বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ধারায় মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের অবদান এবং উদ্দেশ্যধর্মী নাটক রচনায় তাঁদের কৃতিত্ব বাংলা নাট্যধারাকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তাও এই একক থেকে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকারদের কৃতিত্ব বাংলা নাট্যধারাকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তাও এই একক থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন।
- ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, প্রহসন ইত্যাদি নানাধারার বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ ছাছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।
- উনিশ শতকের বাংলা নাটকের বিকাশে ন্যাশানাল থিয়েটারের ভূমিকা বাংলা নাটকের জাতীয়তাবোধের কতখানি বিকাশ ঘটিয়েছিল সেই সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবেন। এই পর্বেই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কীভাবে বাংলা নাটকের অগ্রগতিকে ব্যহত করেছে সেই বিষয়েও ছাত্রছাত্রীদের চেতনা সুবিস্তৃত হবে।

১১.২. প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা নাটক পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠলেও তার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। বাংলা তথা ভারতীয় নাটকের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে। বাংলাদেশে মধ্যযুগে রচিত চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থেও তার উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব থেকে বাংলা নাটক ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংরেজ আগমনের পর বঙ্গারঙ্গাশালার আবার উজ্জীবন ঘটে। ধনী জমিদারদের প্রচেষ্টায় নাট্যশালার দীপ আবারও জ্বলে ওঠে, কুশীলবদের পদসঞ্চারে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মঞ্চ, রচিত হয় বিভিন্ন নাটক। অবশ্য প্রথম পর্যায়ের প্রায় সব নাটকই ছিল ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, কারণ তখনও বাঙালি নাট্যকাররা মৌলিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ধীরে ধীরে বাংলায় মৌলিক নাটক লেখা হল। ইতিহাস, পুরাণের নানা

কাহিনি নিয়ে পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটক লেখা হল। বাংলা নাট্যসাহিত্য নতুন দিশা পেল। একটি উদ্দেশ্যধর্মী সাহিত্যিক চেহারা নিয়ে নাটক লেখা হতে লাগল। বর্তমান এককের গৃহীত পাঠ পরিকল্পনায় উনিশ শতকীয় নাট্যসাহিত্যের সূচনা, উদ্ভব ও নানামুখী বিকাশ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা একটি স্বচ্ছ ধারণালাভে সক্ষম হবে।

১১.৩. 'যাত্রা'-রীতির চর্চা ও পাশ্চাত্য থিয়েটার

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য নানা বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও কলাকৌশলে সমৃদ্ধ। কিন্তু এইধরনের নাট্যরীতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনোকালেই গভীর যোগ ছিল না। বিশেষ করে সংস্কৃত নাটক রাজা ও আমাত্যদের গৃহপ্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকত, তা ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বাঙালি জনসাধারণ যে বিশিষ্ট অভিনয়ে সেকালে তৃপ্ত হতো, তাকে যাত্রা নামে অভিহিত করা হয়।

১১.৩.১. 'যাত্রা'-রীতি : বাংলার সনাতন ঐতিহ্য

বাংলাদেশে যাত্রারীতিই এদেশের প্রাচীনতম দৃশ্যাভিনয়। মধ্যযুগে যাত্রায় ঝুমুর, কবিগান ও পাঁচালির মধ্য দিয়ে সংলাপধর্মী অভিনয়ের ব্যাপারটি সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণের কাহিনি অবলম্বনে কৃষ্ণযাত্রা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়েছে। লোকশিক্ষার বাহন ছিল যাত্রাগান। যাত্রাপালা পল্লীর মানুষের কাছে উচ্চনীতি ও আদর্শ তুলে ধরত। কলকাতার নাগরিক সমাজেও ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে যাত্রার অভিনয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে নিজের বাড়িতে নলদময়ন্তী পালাগান শোনার সুযোগ পান।

যাত্রাগানের সর্বময় কর্তাকে অধিকারী বলা হত। পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম সুদাম অধিকারী ও বদন অধিকারীর নাম এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই পুরাণাশ্রিত হিন্দুসংস্কৃতির কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করেন। গান ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিবেশিত হতো। কোনো প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চ ছিল না। চারদিক ফাঁকা আসরের মধ্যে খুব সাধারণ সাজসজ্জায় পাত্রপাত্রী আসরে অবতীর্ণ হতো। অভিনয় কলা সম্পর্কে এরা সচেতন ছিলেন না। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে কিছু নতুনত্ব ও আধুনিক আঙ্গিক আমদানি করেন। ইনি যাত্রাগানে চলতি বুলির পদ্যসংলাপ সংযুক্ত করেন। এরপরে নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও মতিলাল রায় যাত্রাগানে নাটকের কলাকৌশল গদ্যসংলাপ যোগ করে নতুন রূপ দেন। এর ফলে পুরাতন যাত্রাগানের ধর্মীয় আদর্শ অচিরে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। কামলালসা উচ্ছ্বল আদিরসের বন্যায় ডুবে গেল যাত্রাগান। অবশ্য কলকাতার কোনো কোনো সৌখিন ও অভিজাত বনেদি ব্যক্তি যাত্রাকে বিকৃত রুচির কবল থেকে উদ্ধার করতে প্রয়াসী হন। ইংরেজি' অপেরার আদর্শে মার্জিত রুচির নলদময়ন্তীর পালা বাঁধা হয়। গানে নতুন রাগরাগিণী যোগ করা হয়। কবিওয়ালা রাম বসু গান রচনা করেন। এই নলদময়ন্তী পালাগানের আসরে প্রচুর জনসমাগম ঘটে। তারপর কলকাতায় ইংরেজরা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয়। ড. সুশীলকুমার দে-র মতে, যাত্রার পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ লাভের সম্ভাবনা মধ্যপথে নষ্ট হয়ে যায়; তার কারণ

ইংরেজি শিক্ষিত নবীন বাঙালিদের রস-দৃষ্টি ইংরেজি নাট্যাঙ্গিকের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। কাহিনির বিষয় অনুসারে যাত্রাসাহিত্যে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সর্বাপেক্ষা জনপ্রীতি লাভ করেছিল।

১১.৩.২. কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি থিয়েটার ও গেরাসিম লেবেদফ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় আধিপত্য বিস্তার করে কলকাতাকে আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেস্ট হয়। ইংরেজি নাটক ও প্রহসন অভিনয়ের জন্য পলাশি যুদ্ধের পূর্বে তারা প্রথম প্লে হাউস স্থাপন করেন লালবাজার স্ট্রীটে। এই নাট্যশালাটি ইংরেজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এদেশে প্রথম রঙ্গামঞ্চ। বাংলায় ইংরেজ শাসন শুরু হবার পূর্বেই এই থিয়েটার প্রবর্তিত হয়। এরপর বিদেশি রঙ্গালয় হিসেবে ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এটি নিউ প্লে হাউস নামেও পরিচিত ছিল। এখানে লঘু কমেডি ও প্রহসন জাতীয় হাস্যরসাত্মক নাটকের অভিনয় করত স্থানীয় ইংরেজরা। পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত হার্মনিকান ট্যাভার্ন, লন্ডন ট্যাভার্ন, খিদিরপুর থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, চন্দননগর থিয়েটার ও চৌরঙ্গী থিয়েটার স্থাপিত হয়। এইসময় বিদেশি রুশ পর্যটক সংগীতপ্রেমিক ও ভারততত্ত্ববিদ্ গেরাসিম লেবেডেফ ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এমজড্রেল নামে এক ইংরেজ নাট্যকারের ‘The Disguise’ এবং মলিয়ের ফরাসি নাটক ‘Love is the Best Doctor’এই দুটি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। অনুবাদে সাহায্য করেন গোলকনাথ বসু। ‘The Disguise’-এর অনুবাদের বাংলা নাম করেন ‘কাল্পনিক সংবদল’। নাটকে লেবেডেফ ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দুস্থানি ভাষা ব্যবহার করেন। এতে তিনি ইংরেজ বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ফলে ‘Love is the Best Doctor’-এর ভাগ্যে অভিনয় সাফল্য জোটেনি। নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাকুক না কেন, বাংলা রঙ্গামঞ্চ ও নাটকের ইতিহাসে লেবেদফ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রঙ্গামঞ্চে বাংলা নাম যোগ করে এবং বাঙালি নটনটীদের দ্বারা অভিনয় করিয়ে তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠার ও বাংলা নাটক রচনার পথিকৃৎ হিসেবে চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজি থিয়েটারের গুরুত্ব অনেকখানি। ইংরেজি নাট্যাভিনয়ে শহরের জমিদার, ইংরাজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন। তখনকার দিনে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গো ইংরেজ সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইংরেজি রঙ্গালয়ে বিলিতি নাটকের চর্চা ও অভিনয় দেখে শিক্ষিত বনেদী মানুষ মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকৃস্ট হন ও থিয়েটার গড়ার প্রেরণা পান।

১১.৪. সখের থিয়েটার ও বাংলা নাটক রচনার আদিপর্ব

প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ‘হিন্দু থিয়েটার’ স্থাপন করেন। এটিই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গামঞ্চ। পেশাদারি নাট্যশালা নয় বলে একে সাধারণভাবে সখের নাট্যশালা রূপে গণ্য করা হয়। এই থিয়েটারের পরিচালনায় ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গানারায়ণ সেন, মাধব মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ ধনী অভিজাত বাঙালিরা। এখানে

কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি। শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজারের কিছুটা অংশ এবং ভবভূতির ‘উত্তর রামচরিত’-এর অনূদিত কিছুটা ইংরেজি অনুবাদ যথাক্রমে অভিনীত হয়। অভিনয়ে দেশীয়-বিদেশীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এইসময় থেকে শুরু করে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) আগে পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাংলা সৌখিন থিয়েটার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতা শহর তো বটেই, তার আশেপাশের বিভিন্ন মফস্বল এলাকা বা গ্রামাঞ্চলে ধনী জমিদার বাড়িতেও নাট্যচর্চার চল শুরু হয়েছিল। অবশেষে ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকের অভিনয় হয়। বাঙালি পরিচালিত থিয়েটারে বাংলা নাটকের এই প্রথম অভিনয়।

উনিশ শতকের তিনের দশক থেকে ১৮৫২ সালের আগে পর্যন্ত ‘হিন্দু থিয়েটার’ বা নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দরের মতো লঘুরুচির নাটক, শেক্সপীয়রের নাটক ও বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক অনুবাদের মাধ্যমে অভিনয় হতো। এইসময় হিন্দু কলেজের ছাত্ররাও বেশ কয়েকটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সখের থিয়েটারগুলি কতকটা নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। এইসব রঙ্গালয়ের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ’ (১৮৫৭), রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ‘বেলগাছিয়া নাট্যশালা’ (১৮৫৮), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ‘পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়’ (১৮৬৫), ‘জোড়াসাঁকো থিয়েটার’, ‘বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়’ (১৮৬৮) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। এদের মধ্যে কোনো কোনো রঙ্গালয় তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকাল টিকে ছিল। এমনকি কোনো কোনো নাটক পাঁচ-সাতবার (এমন কি আরও বেশি বার) অভিনীত হয়েছে। এইসব রঙ্গালয়ের উৎসাহ এবং প্রেরণাই ছিল তৎকালীন বহু নাট্যকারের নাট্য-রচনার অন্যতম কারণ।

সৌখিন নাট্যশালার সঙ্গে সেসময়ের বিখ্যাত গুণী মানুষদের সংযোগ ছিল। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এরা শুধু নাটক দেখেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নাট্য অভিনয়ের সঙ্গেও তাঁরা সংযুক্ত ছিলেন। ১৮৭২ সালে চুঁচুড়ায় দীনবন্ধু মিত্রের ‘লীলাবতী’ নাটক অভিনয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা কম ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেশবচন্দ্র সেন তো নিজেরা অভিনয় করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী শোভাবাজার রাজবাড়ির নাট্যমঞ্চে ‘বেণীসংহার’ অভিনয়ে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর এছাড়াও ‘বিক্রমোর্বশী’ অভিনয়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটার নির্মাণের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন ছিলেন তার প্রধান কার্যনির্বাহী সদস্য।

১১.৪.১. আদিপর্বের অপ্রধান নাট্যকারগণ

সখের নাটক বা বাংলা নাট্য রচনার আদি পর্বে বিভিন্ন ধারার নাটক রচিত হয়। এগুলির মধ্যে মৌলিক নাটক, অনুবাদমূলক নাটকের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অপ্রধান নাট্যকার এই পর্বের গোড়ার দিকে নাট্যচর্চায় এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই পর্বে ১৮৫২ সালে প্রথম দুটি মৌলিক নাটক প্রকাশিত হল। তারাচরণ শিকদার লিখলেন 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'। 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি মহাভারতের অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ-ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়। ভূমিকায় নাট্যকার ইওরোপীয় আঙ্গিক অনুসরণের কথা স্বীকার করেছেন। নাট্যরচনা হিসেবে 'ভদ্রার্জুনে'র মূল্য সামান্য। নাট্যপ্লট গঠনে, চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা সংলাপ-রচনায় কিছুমাত্র দক্ষতা ছিল না। সুকুমার সেন এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন- "ইহাই ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাঙ্গালা নাটক"। 'ভদ্রার্জুন' রোমান্টিক কমেডি ধরনের রচনা, কিন্তু 'কীর্তিবিলাস' ট্রাজেডি রচনার চেস্টা। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। সংস্কৃত নাটকের প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত প্রথম বিষাদান্ত নাটক রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এখানেই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই পর্বে বাংলা নাট্যরীতির সঙ্গে অনুবাদমূলক নাট্যচর্চা বিশেষভাবে জড়িত। ১৮৫২ সালের পূর্ব পর্যন্ত কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'হাস্যার্ণব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'রত্নাবলী'-র নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটকের উদ্ভবপর্বে হরচন্দ্র ঘোষ অনুবাদমূলক নাটক রচনার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। শেক্সপীয়রের প্রথম বাংলা নাট্যানুবাদ করে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ সালে শেক্সপিয়রের 'Merchant of Venice' অবলম্বনে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক রচনা করেন। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখচিত্তহরা' নাটক রচনা করেন। এই পর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), ভবভূতির 'মালতীমাধব' (১৮৫৯) এবং মহাভারতের বনপর্বে 'সাবিত্রী সত্যবান' কাহিনির অনুসরণ করে 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক রচনা করেন।

১১.৪.২. নাটুকে রামনারায়ণ

বাংলা নাটকের প্রস্তুতিপর্বের একজন প্রতিভাশালী খ্যাতিমান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬)। মধুসূদনের পূর্বে তিনি কলকাতার নাগরিক সমাজে অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করে সবাইকে মাতিয়ে তোলেন। বহু বিচিত্র বিষয়ের নাটক রচনা করে তিনি যশস্বী হন। রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। তাঁর নাটক সংস্কৃতানুসারী হলেও বাস্তবতা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতার জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' এই আখ্যা পান।

রামনারায়ণ মূলত সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করলেও পৌরাণিক ও প্রহসন রচনায় তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তাঁর নাটকের প্রধান সম্পদ হল হাস্যরসের উপস্থাপনা। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। কৌলীন্যপ্রথার বর্বরতা ও অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এই নাটকে দেখানো হয়েছে। এই নাটকের প্রেরণা ছিল রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর ঘোষণায় উৎসাহিত হয়ে তিনি এই নাটক রচনা করেন এবং পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পান। কৌলিন্য

প্রথার দোষ ছাড়াও সমকালীন সমাজের ব্রাহ্মণদের লোভ লালসা নীচতার কদর্য পরিচয়ও নাটকে আছে। সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণ নাটকে অনেক ক্ষেত্রে ধ্রুপদী নাট্যরীতি ব্যবহার করেছেন। সংলাপেও সংস্কৃতের প্রভাব আছে। তবু বক্তব্যের দৃঢ়তায়, ভাবনার তীব্রতায় ও মানবিক আবেগে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ এক অনন্য নাটক। এটি ছাড়াও তিনি ‘বেণীসংহার’ (১৮৫৬), ‘রত্নাবলী’ (১৮৫৮) ও অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ (১৮৬০), ‘মালতীমাধব’ (১৮৬৭) নাটকের অনুবাদ করেন। তাঁর পুরাণাশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে ‘রুক্মিণীহরণ’ (১৮৭১), ও ‘কংসবধ’ (১৮৭৫) খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখা দুটি প্রহসন হল ‘চক্ষুদান’ (১৮৬৯), উভয়সঙ্কট’ (১৮৬৯)। ‘নবনাটক’ (১৮৬৬) হল তাঁর লেখা গম্ভীর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ সমাজসচেতন নাট্যকার ছিলেন। তিনি প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে জন্মগ্রহণ করলেও মানসিকতায় ছিলেন প্রগতিবাদী। কৌলীন্য প্রথা, বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি সম্পর্কে রামনারায়ণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমকালীন নবজাগ্রত জীবনচেতনার অনুসারী।

রামনারায়ণের সামাজিক সমস্যামূলক নাট্যকৃতির সফলতা দেখে এই ধরনের নানা বিষয়ে নাটক রচনার উৎসাহ সেকালে প্রবল হয়েছিল। এইসব অনুকৃত নাটকের মধ্যে আছে- তারকচন্দ্র চূড়ামণির ‘সপত্নী নাটক’ (১৮৫৮), শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের ‘বাল্যবিবাহ নাটক’ (১৮৫৯) শ্যামাচরণ শ্রীমানীর ‘বাল্যোদ্বাহ’ নাটক (১৮৬০) এবং নফরচন্দ্র পালের ‘কন্যাবিক্রয় নাটক’। আলোচ্য যুগের নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নতুন সমাজবিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন উমেশচন্দ্র মিত্র ‘বিধবাবিবাহ’ নাটক লিখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুরাগী ছিলেন উমেশচন্দ্র; বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সমর্থন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ হয়; আর ঐ বছরেই বিধবা বিবাহকে জনসাধারণের চোখে বরণীয় করে তোলার চেষ্টায় উমেশচন্দ্র ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক লিখেছিলেন।

১১.৫. পঞ্চাঙ্ক রীতির নাট্যধারার সূচনা

বাংলা আধুনিক পঞ্চাঙ্ক নাট্যরীতির জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪)। মধুসূদনের পূর্বে বাংলা মৌলিক নাটক প্রায় ছিল না বললেই চলে। নাট্যকারগণ সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয়বিধ নাট্যাদর্শ মেনে সেই আঙ্গিকে বাংলা নাটক লিখছিলেন। বাংলা নাটকের এমন এক সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব নাট্যকার মধুসূদনের। তিনি বাংলা নাটকের আধুনিকতার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। তৎকালীন সখের নাট্যশালাগুলির সঙ্গে মধুসূদনের যোগ ছিল খুবই নিবিড়। সেই সূত্রে তিনি বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুরোধে রামনারায়ণের ‘রত্নাবলী’ নাটকের ইংরেজি’ অনুবাদ কাজে তিনি বুঝতে পারেন বাংলা নাটকের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা মোচনে তিনি বাংলা নাট্য রচনার কাজে এগিয়ে আসেন। মধুসূদনের অনুসরণে এই পর্বে পঞ্চাঙ্ক রীতির নাটক ও প্রহসন রচনায় এগিয়ে এল্লেন দীনবন্ধু মিত্র।

১১.৫.২. মধুসূদন দত্ত

মধুসূদন মোট চারটি মৌলিক নাটক ও তিনটি প্রহসন রচনা করেন এগুলি হল, ‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯), ‘পদ্মাবতী’ (১৮৬০), ‘কৃষ্ণকুমারী’ (১৮৬১), ‘মায়াকানন’ (১৮৭৪)। প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’

(১৮৬০), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। এই রচনাগুলির মধ্যে 'মায়াকানন' সম্পূর্ণ করার অবকাশ পাননি। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটির কাহিনি মহাভারতের আদি পর্ব থেকে গৃহীত। শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির গল্পই নাটকের বিষয়বস্তু। পৌরাণিক কাহিনিকে রোমান্টিক রসে জারিত করে এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে। কাহিনি ও রচনার কোনো কোনো অংশে কালিদাসের 'শকুন্তলার প্রভাব লক্ষ করা যায়। কাহিনি নির্বাচন ও কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃত অনুসরণ থাকলেও রচনাক্রম এবং গ্রন্থনপদ্ধতি পাশ্চাত্যপন্থী। 'পদ্মাবতী' হল তাঁর দ্বিতীয় নাটক। গ্রিক পুরাণের 'Apple of discord' উপকাহিনি অবলম্বনে রচিত। গ্রিক পুরাণের দেব জুনো, ভেনাস ও প্যালস এই তিন সুন্দরীর সুবর্ণ আপেল নিয়ে কলহের উপকাহিনিকে তিনি ভারতীয় পুরাণের ছাঁচে ফেলে শচী, রতি ও মুরলার চিত্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পদ্মাবতীর জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তিন দেবীর সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বময় পটভূমিকা। এই নাটকে বিদেশি কাহিনিকে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গো মেলানোর চেষ্টা করেছেন। তবে এই নাটকে মধুসূদন সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। এই নাটকে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করেন। তাঁর তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। এই নাটকে প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে এর কাহিনি তিনি গ্রহণ করেছেন। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য জয়সিংহ ও মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনি গ্রথিত হয়েছে। এই নাটকে মদনিকা-বিলাসবতী-ধনদাস-জগৎসিংহের উপকাহিনি সমগ্র নাট্যকাহিনিকে শিল্পসার্থক রূপদান করেছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এটিই প্রথম পূর্ণ ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নাটক। 'মায়াকানন' তাঁর চতুর্থ নাটক। মধুসূদনের যুগান্তকারী সৃষ্টি হল তাঁর দুটি প্রহসন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের রোঁ'। 'একেই কি বলে সভ্যতা' তে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকারী বিমূঢ় ও বিপথগামী তরুণ ইয়ংবেঙ্গাল গোষ্ঠীকে বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন নাট্যকার। অপরদিকে 'বুড়ো শালিকের রোঁ' প্রহসনটিতে বকধার্মিক বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদের কুকীর্তির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রাক মধুসূদন পর্বের নাট্যকারদের তুলনায় এভাবেই নাটক লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের পরিধিকে তিনি বিস্তৃততর করলেন।

১১.৫.২. দীনবন্ধু মিত্র

এই পর্বের অপর এক সফল নাট্যকার মধুসুদনের সার্থক উত্তরসাধক দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। তাঁর ছিল প্রখর সমাজচেতনা ও প্রবল বস্তুনিষ্ঠা। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক, যেখানে লেখকের প্রবল স্বদেশানুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহতম রূপ এই নাটকে ধরা পড়েছে। চাষিদের নীলচাষে বাধ্য করা তাদের কয়েদ ও উৎপীড়ন, তাদের মেয়েদের ওপর জোরজুলুম ও নির্মম হত্যার চিত্র 'নীলদর্পণ' এ আছে। নাটকটি সারাদেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে, পরিণামে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ হয়। শিল্প হিসেবে 'নীলদর্পণ' এ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও বক্তব্যে ও আবেদন সৃষ্টিতে তা আজও বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী নাটক হিসাবে স্মরণীয়।

দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন, 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন এটি। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত নব যুবক সম্প্রদায়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি এতে অঁকা হয়েছে। মদ্যাসক্তিজনিত প্রতিভাবান যুবকদের বেদনাদায়ক পরিণতির মর্মস্পর্শী রূপ প্রকাশ পেয়েছে নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে প্রাচীন স্থবির সংস্কারগ্রস্ত সমাজকে নিয়ে তিনি রসিকতা করেছেন। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনে শ্বশুর-নির্ভর কুলীন জামাইদের দুরবস্থা চিত্রিত হয়েছে। দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) ও 'লীলাবতী' (১৮৬৭)। দীনবন্ধুর সর্বশেষ নাটক 'কমলে কামিনী'। দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটককে সার্থকতার সমুন্নত ক্ষেত্রে নিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী নাট্যকার। সমালোচকের মতে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রধান বাস্তববাদী লেখক।

নির্মম ট্র্যাজেডির রূপ অঙ্কন করলেও দীনবন্ধু মিত্র হাস্যরস সৃষ্টিতেই বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর হাস্যরসের মূলে আছে সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি। তাঁর দৃষ্টি থেকে মদ্যপায়ী, ব্যভিচারগ্রস্ত, অনুগ্রহপ্রার্থী ঘরজামাই বা উচ্চপদস্থ মূর্খ ডেপুটি কেউই পরিত্রাণ পায়নি। চরিত্রগুলির স্থূল, অমার্জিত ভাবভঙ্গী নাট্যকার চিত্রিত করেছেন। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।" দীনবন্ধু সেখানে গম্ভীর সেখানে সিরিয়াস সেখানে তিনি ব্যর্থ। তাই ভদ্র চরিত্রের অঙ্কনে তিনি সার্থক হতে পারেননি। শিষ্টজনের সংলাপ রচনায় তিনি আশ্চর্যভাবে অসফল। অথচ ভদ্রেতর চরিত্র চিত্রণে ও তাদের সংলাপ রচনায় তিনি জীবন্তরূপ দিয়েছেন।

১১.৬. পৌরাণিক ও অপেরাধর্মী নাট্যধারা: মনোমোহন বসু ও রাজকৃষ্ণ রায়

মধুসূদন ও দীনবন্ধু সিরিয়াস নাট্যধারার মধ্যে যাত্রারীতি ও গীতাভিনয়ের প্রবর্তন করে মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) বাংলা নাটকে এক আকস্মিক পরিবর্তন আনেন। মানবিকতার স্থলে মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদকে তিনি ফিরিয়ে আনতে প্রয়াসী হন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালির রসপিপাসা যাত্রাসাহিত্যের অনুকূলে। বস্তুনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদ অপেক্ষা অলৌকিকতার আবেগে নাট্যধারাকে সমৃদ্ধ করেন এবং নাটকে সংগীত ও ভক্তিবাদকে ফিরিয়ে আনেন। তখনই নাটকের ধরনে অপেরা লেখেন মনোমোহন। দৃশ্যপটের অভাবে সংগীত ও কথার সাহায্যে যে প্রাকৃতিক চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায়- সেটাই প্রথম প্রমাণ করলেন মনোমোহন বসু। তিনি নাটকে সংগীত ও করুণ রসকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন।

রামায়ণের করুণ বিষয় অবলম্বনে তিনি 'রামাভিষেক' (১৮৬৭) নামে প্রথম পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। এতে রামের রাজ্যাভিষেকের আনন্দোৎসবের মধ্যে রামের বনগমনের বিষাদ-বেদনা ফুটে উঠেছে। দশরথের দুঃখবিলাপ ও মৃত্যু করুণরসের নির্ঝর প্রবাহিত হয়েছে। দ্বিতীয় নাটক 'সতী'-তে (১৮৭৩) সতীর চরিত্র ও অন্যান্য দেবদেবীর চরিত্রগুলি আমাদের চারপাশের নরনারীর স্বভাব ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। তাঁর তৃতীয় পৌরাণিক নাটক 'হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) নাটকটি সংস্কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক অবলম্বনে রচিত। অপরদিকে সামাজিক নাটক 'প্রণয় পরীক্ষা'-য় (১৮৬৯) সপত্নী বিদ্বেষের ভয়াবহ কুফল

দেখানো হয়েছে। 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০) পারিবারিক কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। মনোমোহন বসু ছিলেন হিন্দুমেলার অন্যতম পুরোধা। তাঁর নাটকের মধ্যে ছিল স্বদেশ অনুরাগ এবং পৌরাণিক নাটক রচনায় এই বোধই তাঁকে প্রাচীন ভারতের গৌরবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। অতীত গৌরব দ্বারা তিনি বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সামাজিক সংস্কার দূরীকরণে প্রণোদিত করেছিল।

এই পর্বে বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রাজকৃষ্ণ রায় অসংখ্য নাটক, গীতিনাটিকা, প্রহসন ও কৌতুক নাটক রচনা করেন। রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা ও অভিনয়ে তিনি দক্ষ ছিলেন। নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। তাঁর 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), 'তরণীসেন বধ' (১৮৮৪), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪), 'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) সাধারণ দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকের তিইনি একজন অন্যতম সফল শিল্পী। রাজকৃষ্ণের নাটকগুলির টেকনিক যাত্রা ধরনের। মনোমোহন বসুর মতো তিনিও নাটকে সংগীতকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস ও ভক্তিরসের অতিশয্য সেগুলির শৈল্পিক মর্যাদা লাভে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সাময়িক প্রয়োজনে জনরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা করেছেন।

১১.৭. পেশাদারি থিয়েটারের যুগ

এইভাবে বাংলাদেশে শখের থিয়েটার সাফল্য লাভ করার ফলে বৃহত্তর প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। স্থায়িত্ব যতই থাক, অভিনয়কলা যতই উন্নত হোক, শখের থিয়েটার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। নাট্যশালার ইতিহাসকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শখের অভিনয়ে বাঙালি জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সফল অভিনয় প্রায়ই কোনো-না-কোনো অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতে বা বাগান বাড়িতেই হইত।" মনে রাখতে হবে, এই পর্বে বাংলাদেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটেনি। 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'-এর নিঃসম্বল যুবকদের উৎসাহে ১৮৭২ সালে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম দিয়ে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাংলার প্রথম পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র প্রথমে এই দলে থাকলেও মতভেদ ঘটায় তিনি দলত্যাগ করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর আর কোনো ভূমিকাই রইল না। টিকিট বিক্রি করে নাট্যালয়ের উদ্বোধন ঘটল, সর্বসাধারণ পেল রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকারের সুযোগ। সকলের নাগালে পৌঁছে যাওয়ায় জাতীয়তাবাদী ভাব প্রচারের বাহন হয়ে ওঠে নাট্যশালা।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয়ের জয়যাত্রা শুরু হয়। 'নীলদর্পণ'-এর প্রথম অভিনয় অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়। এছাড়াও এখানে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এরপরে বাংলা পেশাদারি রঙ্গামঞ্চের নানা ভাঙাগড়া চলতে লাগল; ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিস্তৃত প্রতিযোগিতা গড়ে উঠল একাধিক মঞ্চের মধ্যে। পেশাদারি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও নাট্য অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ধনী ব্যবসায়ীরা থিয়েটার ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৩ সালের

২২ ফেব্রুয়ারি এই হল সাধারণ রঙ্গালয় তথা ন্যাশনাল থিয়েটারের আয়ুষ্কাল। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় ১৮৭৩ সালে বেঙ্গাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, ১৮৭৭ সালে বীণা থিয়েটার, ১৮৮৩ সালে স্টার থিয়েটার, ১৮৯৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতি একের পর এক পেশাদারি রঙ্গামঞ্চ গড়ে ওঠে। বেঙ্গাল থিয়েটারে অভিনীত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক এইসময় ইতিহাস সৃষ্টি করে। কারণ এই নাটক মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে নারী চরিত্রে নারীরাই প্রথম অভিনয় করে। এইসময় পেশাদারি রঙ্গালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে নূতন নাটক রচনার প্রয়োজন দেখা দিল। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নব জীবনাবেগ দেখা দিল, প্রাচুর্য এল নাট্যসৃষ্টিতেও। এই সময়কালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অভিনেতারা অভিনয়কে শিল্পীত রূপদান করে দর্শকদের মোহিত করেছিলেন। ফলে বাংলায় এইসময় উৎকৃষ্ট নাটক রচনার পটভূমি গড়ে উঠল। চারদিকে উৎসাহ আগ্রহের সীমা রইল না। তবুও অত্যুৎকৃষ্ট মঞ্চানুগ নাটক যে রচিত হল না; তার প্রধান কারণ প্রথম শ্রেণির নাট্যপ্রতিভার অভাব।

১১.৭.১. জাতীয়তাবাদী নাট্যচর্চার বিকাশ

এইসময় জাতীয়তাবাদী নাট্যচর্চার বিশেষ প্রচলন ঘটে। বাংলা নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জাতীয় নাট্যরচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। বিশেষত ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ঠাকুর পরিবারের সহযোগিতায় কলকাতায় প্রথম হিন্দু মেলা আয়োজিত হয়। এটি ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাদেশিকতার ভাব বা জাতীয়তার বিকাশে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এই মেলার সংস্পর্শে জাতীয় ভাব উদ্দীপনা মূলক নাটক রচনায় হাত দেন। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'পুরুবিক্রম' এ হিন্দুমেলার স্বদেশ চেতনার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। যদিও নাট্যকারের অসাধারণ সংযম তাঁর নাট্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর এইজাতীয় ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে, 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯), 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) খুব জনপ্রিয়। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের পরে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নাট্যধারা আর বিকাশলাভ করেনি। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকা স্মরণ করতেই হয়। এই পর্বে বাংলা প্রহসনের তিনি একজন সফল রচয়িতা। তাঁর প্রথম প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), অন্যান্য প্রহসনগুলির মধ্যে 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৮৯০), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ব্যঙ্গের জ্বালা বা আঘাতের তীব্রতা নেই, কিন্তু উপভোগ্যতা আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি। আরও একটি বিশেষ কারণে তিনি উল্লেখযোগ্য। তিনিই বাংলা সাহিত্যে ফরাসি প্রভাব সৃষ্টি করেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন।

স্বাদেশিকতা মন্ত্রে উজ্জীবিত উপেন্দ্রনাথের নাটকগুলি এক সময়ে রঙ্গামঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর লেখা সামাজিক নাটক দুটি হল 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'। তাঁর লেখা প্রহসন হল

'দাদা ও আমি' (১৮৮৮)। রচনা হিসেবে বিশেষ মূল্যবান না হলেও সমকালীন বিষয় অবলম্বনে সরাসরি ইংরেজ-বিরোধিতা নাটক-দুটির বৈশিষ্ট্য।

১১.৭.২. নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

ন্যাশানাল থিয়েটারে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটক বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠল। এইসময় প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলকাতা আগমনকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেল। এই নিয়ে প্রহসন লিখলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। প্রহসনের নাম 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। ১৮৭৬ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারি তাঁরই রচিত 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের সঙ্গো এটি অভিনীত হয়। রাজভট্ট সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রূপ করার অভিযোগে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রশাসনের চোখে ফাঁকি দিতে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিষয়টি একই রেখে প্রহসনের নাম পাল্টে করলেন-'হনুমান চরিত্র'। পুলিশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। তখন পুলিশের বড়কর্তাদের বিদ্রূপ করে লেখা হল- 'দি পুলিশ অফ পীগ অ্যান্ড শীপ'। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'-র সঙ্গো তা অভিনীত হল- ১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ। ইতিমধ্যে লর্ড নর্থব্রুক জারি করলেন এক অর্ডিন্যান্স। ১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রচলিত এই আইন বাংলা নাট্যসাহিত্যে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন নামে পরিচিত হয়ে আছে।

১১.৮. নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাংলা রঙ্গামঞ্চের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠক হলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি একাই ছিলেন নট (অভিনেতা), নট-শিক্ষক, রঙ্গামঞ্চ পরিচালক, এবং নাট্যকার। সাধারণ দর্শকের রুচি ও চাহিদার কথা তিনি রঙ্গামঞ্চে থেকে খুব সঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেইভাবেই নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন। তার ফলে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হয়। তবে দর্শক সাধারণের মুখ চেয়ে নাটক লিখতে গিয়ে নাটকের মধ্যে তিনি কোনো উচ্চাঙ্গোর সাহিত্য-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তবু তিনি বহু বিচিত্র নাটক লিখেছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের জয়যাত্রা পৌরাণিক নাটক থেকেই শুরু। এই জাতীয় নাটকে ভক্তিরস ও ধর্মভাবেরই প্রাধান্য। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যেমন- 'রাবণবধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস' (১৮৮২), 'লক্ষ্মণ-বর্জন' (১৮৮২), সীতার বিবাহ, 'রামের বনবাস' (১৮৮২), সীতাহরণ' (১৮৮২)। এইসব নাটকগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুসরণে রচিত। 'অভিমন্যু-বধ' (১৮৮১) নাটক পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করে রচিত। 'কমলে কামিনী' চণ্ডীমঙ্গালের কাহিনি অনুসরণে রচিত। ভক্তিমূলক দুটি নাটক, চৈতন্য-লীলা' (১৮৮৬), 'বিল্বমঙ্গাল' (১৮৮৮)। তাঁর 'জনা' (১৮৯৪) ও 'পাণ্ডবগৌরব' (১৯০০) পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নাটকীয় গুণের দিক থেকে এইসব গ্রন্থ খুব উচ্চাঙ্গোর বা আধুনিক ধরনের নয়, তবু দেশের প্রাচীন লোকশিক্ষাদানের ধারা এইসব নাটকের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে এবং নতুনরূপে পরিবেশিত হয়েছে।

সামাজিক নাটক রচনাতেও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮), 'গৃহলক্ষ্মী' (১৯১২) প্রথম শ্রেণীর নাটক না হলেও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নাটক। 'প্রফুল্ল' সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক। নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অশেষ সংবর্ধনা লাভ করেছিল। 'বলিদান' নাটকের বিষয়বস্তুই হল পণপ্রথা। সমালোচক অজিতকুমার ঘোষের মতে এই নাটকের সমস্যা সর্বাপেক্ষা তীব্র, সর্বাপেক্ষা গভীর এবং এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও প্রগতিবাদী। পৌরাণিক বিষয়ের পাশাপাশি ঐতিহাসিক বিষয়েও গিরিশচন্দ্র অনেক নাটক রচনা করেছেন। বিষয়ের দিক দিয়ে তা মৌলিক কিছু নয় মূলত ইতিহাসের সর্বজনবিদিত বীরদের জীবনাশ্রয়েই এগুলি রচিত। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'চণ্ড', 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'বাসর' (১৯০৬), 'অশোক' (১৯১১), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬) ইত্যাদি। এইসব ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ বা স্বদেশি উদ্দীপনার জন্যে নাটক অভিনয়ে দর্শকজন মুগ্ধ হতো।

গিরিশচন্দ্র কতগুলি প্রহসন রচনা করেছেন; এইগুলি পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পাণ্ডা' প্রভৃতি পঞ্চরংগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের আকার খুব সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনা নিতান্ত সাধারণ ও সরল। অধিকাংশ প্রহসনগুলিই ইতর পল্লীর কদর্য আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। পঞ্চরংগুলির ভাষা কলিকাতার ইতর সমাজ থেকে গৃহীত। গিরিশচন্দ্র কয়েকখানা গীতিনাট্যও রচনা করেছেন। যেমন- 'মলিনমালা, মলিনা বিকাশ', 'স্বপ্নের ফুল', 'দেলদার' প্রভৃতি। তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গীতিনাট্য 'আবুহোসেন'। গিরিশচন্দ্র অভিনয়ের উদ্দেশ্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙে ছোটোমাত্রার পংক্তিতে সাজান। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিবর্তন ঘটেছে গিরিশচন্দ্রের হাতে। এই ছন্দ নাট্যকারের নামানুসারে গৈরিশ ছন্দ নামে সর্বজন পরিচিতি লাভ করে। ভক্তিরস, নীতিধর্ম এবং অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য গিরিশচন্দ্র বহু দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেন। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা গিরিশচন্দ্রকে নাট্যকার সেক্সপীয়রের প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করেন। নাট্যশাস্ত্রের বিচারে গিরিশচন্দ্রের নাটকের শিল্পমূল্য কম। তা সত্ত্বেও বাংলা নাটসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের অবদান ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

১১.৯. রসরাজ অমৃতলাল বসু

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকে অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রধানত রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটক ও প্রহসন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এরই পাশে সামাজিক নাটক রচনায়ও তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় উজ্জ্বলরূপে দেখা দিয়েছে। অমৃতলালের প্রহসনগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়আক্রমণাত্মক প্রহসন ও বিশুদ্ধ প্রহসন। তাঁর আক্রমণাত্মক প্রহসনগুলি হল- 'বিবাহ-বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'সম্মতি-সঙ্কট', 'কালাপানি, 'বাবু' (১৮৯৪), 'একাকার' (১৮৯৫), 'বৌমা' (১৮৯৭), 'গ্রাম্যবিভ্রাট' (১৮৯৮), 'বাহবা বাতিক', 'খাসদখল' (১৯১২) ইত্যাদি। এই কয়খানা প্রহসনের বিষয়বস্তু

এবং পাত্রপাত্রী প্রায় একই ধরনের। ‘বিবাহ-বিভ্রাট’ অমৃতলালের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ প্রহসন। ‘চোরের উপর বাটপাড়ি’ (১৮৭৬), ‘ডিসমিস’, ‘চাটুয্যে ও বাঁড়ুয্যে’ (১৮৮৬), ‘তাজ্জব ব্যাপার’ (১৮৯০) এবং ‘কৃপণের ধন’ (১৯০০) এই প্রহসনগুলিকে বিশুদ্ধ প্রহসন (Farce) বলা যেতে পারে। বিশুদ্ধ প্রহসনকেই যথার্থ সাহিত্যিক প্রহসন বলা যায়। এর মধ্যে কোনো কোনো স্থলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত আছে বটে, কিন্তু সেই আঘাত কখনো পীড়াদায়ক নয়, স্নিগ্ধ হাস্যরসই এগুলিকে সরস ও সজীব করে রেখেছে। অমৃতলালের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হাস্যরসের অবতারণায়, গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনায় নয়। সেইজন্য তাঁর নাটকগুলি একেবারেই বিশেষত্ব-বর্জিত সাধারণ স্তরের। অমৃতলালের যথার্থ পরিচয় তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি ‘রসরাজ’ নামে পরিচিত ছিলেন।

১১.১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলা নাটক

নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারির (১৮৭৬) পর উনিশ শতকের শেষপর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চ থাকার সুবাদে ছোটো থেকেই নাট্যধারার প্রতি তাঁর আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল। এইসময় বাংলা নাটককে নিয়ে তীব্র উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সাহিত্যমহলে। রবীন্দ্রনাথও পিছিয়ে থাকেননি। নিজের সহজাত শিল্পবোধ তাঁর নাট্যধারার বিকাশে দ্রুত সাহায্য করেছিল। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে বিলেত থেকে ফিরে তিনি অভিনয় করেন স্বরচিত “বাল্মীকিপ্রতিভা” নাটকে। প্রথম নাটকেই অপ্রত্যাশিত সাফল্য তাঁর নাট্যচর্চায় অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগায়। এরপর রচিত হয় তাঁর একের পর এক নাটক। উনিশ শতকে তিনি মূলত গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, কৌতুক নাটক রচনা করেন। তাঁর গীতিনাট্যগুলির মধ্যে : “বাল্মীকি-প্রতিভা” (১৮৮১), “কালমৃগয়া” (১৮৮২), “মায়ার খেলা” (১৮৮৮) উল্লেখযোগ্য। কাব্যনাট্যগুলি হল : “রুদ্রচণ্ড” (১৮৮১), “প্রকৃতির প্রতিশোধ” (১৮৮৪), “রাজা ও রানী” (১৮৮৯), “বিসর্জন” (১৮৯০), “চিত্রাঙ্গদা” (১৮৯২), “মালিনী” (১৮৯৬)। তাঁর রচিত কৌতুকনাট্য : “গোড়ায় গলদ” (১৮৯২), “বৈকুণ্ঠের খাতা” (১৮৯৭)।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নাটক কয়েকটি দিক থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত অপেক্ষা বাংলা নাটককে তিনি ভাবাত্মক, গীতিধর্মী ও তত্ত্বচিন্তার বাহন করে তুলেছিলেন। বৈরাগ্যসাধনার মধ্যে নয়, প্রেমের মধ্যেই তিনি মুক্তিসাধনার বাণী পরিবেশন করেছেন “প্রকৃতির প্রতিশোধ” নাটকে। গীতিরস ও নাট্যরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর “চিত্রাঙ্গদা” নাটকটি। মদনের বরে দেহের লাবণ্য ফিরে পেয়েছে চিত্রাঙ্গদা। এরপর অর্জুনকে মোহিত করলেও নিজেকে সে জয়ী মনে করতে পারেনি। নাটকের কাহিনিবস্তু সাধারণ নয়। প্রেম ও প্রথার দ্বন্দ্ব নিয়ে তিনি লিখেছেন “বিসর্জন” নাটক। এভাবেই নাটকগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন সুরে, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বে তিনি গ্রথিত করেছিলেন। মহাভারত, পুরাণের নানা কাহিনি থেকে তিনি নাট্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বাল্মীকির কাহিনিকে নিয়ে “বাল্মীকি প্রতিভা”, মহাভারতের কচ ও দেবযানী প্রসঙ্গ নিয়ে “বিদায় অভিশাপ” নাটক লিখেছেন। এছাড়াও “চিত্রাঙ্গদা”, “কালমৃগয়া”, “কর্ণ-কুন্তী সংবাদ”, “গান্ধারীর আবেদন” প্রভৃতি নাটকগুলির কাহিনি ভারতীয় পুরাণ বা মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে। নাটকের মধ্যে তিনি স্মিত হাস্যরসের

সৃষ্টি করেছেন। ‘গোড়ায় গলদ’, ‘চিরকুমার সভা’, বৈকুণ্ঠের খাতা’ প্রভৃতি নাটকগুলি শুভ্র, সংযত হাস্যরস বা হিউমারের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১১.১১. সারসংক্ষেপ

নাটক একটি মিশ্র শিল্প। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শক ও পাঠককে এখানে সমভাবে আনন্দবিধান করা হয়। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নাটকের প্রধান উপজীব্য। পাশ্চাত্যপ্রভাবে বাংলা নাটক একটি নতুন শিল্পরূপ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। নাটকে পঞ্চাঙ্ক রীতির সৃষ্টি হয়। এর আগে জমিদারগৃহে সংস্কৃত প্রভাবে যে সমস্ত নাটকগুলি আয়োজিত হতো সেগুলোতে স্থূল রঙ্গরস বা ভাঁড়ামোই ছিল মুখ্য। বলাবাহুল্য সেগুলো ছিল ধনী জমিদারবাবুদের সখ-সৌখিনতার একটি বিশেষ অঙ্গ। মূলত মনোরঞ্জনের কারণেই তারা সংস্কৃত নাটককে বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করতেন। ফলে এই নাটকগুলির আবেদন জমিদার মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের মনে সেগুলি বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনকি সাহিত্য আঙ্গিক হিসেবে সেগুলো তখনও প্রতিষ্ঠালাভ করেনি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্ব থেকেই পাশ্চাত্য নাটকের প্রয়োগরীতি, মঞ্চসজ্জা, আঙ্গিকভাবনা বাংলা নাটককে প্রভাবিত করে এবং বাংলা নাটকের চেহারায় বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসে। শেক্সপিয়ারের অনুকরণে বাংলা নাটকে পঞ্চাঙ্ক রীতির বিন্যাস ঘটে। মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকাররা নাটককে উদ্দেশ্যধর্মী একটি সফল শিল্প মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। লেখা হয় সিরিয়াস নাটক, লেখা হয় প্রহসন। প্রহসনের মধ্য দিয়ে সমকালীন ইংরেজি অনুকরণে অক্ষম বাবু সমাজের লাম্পট্য ও বেলেল্লাপনার কুরুচিকর চিত্র ফুটে ওঠে। নাটককে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রারীতি সংযোগ করেন মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকার। এরপর ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলে নাটকের আবেদন ছড়িয়ে পড়ে আমজনতার দরবারে। নাটককে হাতিয়ার করে ইংরেজ বিরোধী প্রচার বাড়তে থাকে। যেকারণে এই পর্বে নাটকের উপর নেমে আসে নিয়ন্ত্রণ, চালু হয় নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। ফলে নাট্যকারা পুরাণ- ইতিহাসের কাহিনিকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করতে শুরু করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর নাটককে একটি সফল শিল্প মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্য চেহারা, দৃশ্য, সংলাপ সবদিক থেকে তিনি নিয়ে আসেন অভিনবত্ব। বাংলা নাট্য ইতিহাসে তিনি নটশিক্ষক হিসেবে সম্মানলাভ করেন। এই পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ বাংলা নাটককে সঞ্জীবিত ও উজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসেন।

১১.১২. অনুশীলনী

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বাংলা নাটক মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে সখের থিয়েটারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. সমাজ সমস্যামূলক নাটক রচনায় রামনারায়ণ তর্করত্নের অবদান লিপিবদ্ধ করুন।

৩. মধুসূদন দত্তের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. বাংলা উদ্দেশ্যধর্মী নাটক রচনায় দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব সম্পর্কে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করুন।

৫. বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক রচনার বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬. প্রহসনধর্মী নাটক রচনায় অমৃতলাল বসুর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭. বাংলা প্রহসনে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৮. বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯. বাংলা নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন বসুর কৃতিত্ব আলোচনা করো।

১০. বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতিত্ব বিচার করো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. বাংলা নাটকের ইতিহাসে গেরাসিম লেবেদফের কৃতিত্ব লেখো।

২. টাকা লেখো- ন্যাশানাল থিয়েটার, শখের থিয়েটার।

৩. অনুবাদমূলক নাটক রচনায় হরচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৪. বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' নাটকের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখো।

৫. প্রহসন রচনায় মধুসূদনের বিশেষত্বের দিকগুলি আলোচনা করো।

৬. মনোমোহন বসুর নাটকে যাত্রার প্রভাব কেমনভাবে ফুটে সে সম্পর্কে কিছু লেখো।

৭. ঐতিহাসিক নাটক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষত্বের দিকগুলি চিহ্নিত করো।

৮. হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় অমৃতলাল বসুর কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. যাত্রাগানে অধিকারী কাকে বলা হতো ?

২. ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গামঞ্চের নাম কী?

৩. 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশকাল লেখো।

৪. হিন্দু থিয়েটার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

৫. 'Love is the Best Doctor' কে রচনা করেন?

৬. 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ কে, কী নামে করেন ?

৭. ন্যাশানাল থিয়েটার কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৮. 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' কে কোন নাটক থেকে অনুবাদ করেন?

৯. 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' কার লেখা নাটক?

১০. 'ন্যাশানাল থিয়েটারের উদবোধন কোন নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হয়। এই অভিনয় কবে হয়?

১১.১৩. গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, '*বাংলা নাটকের ইতিহাস*'।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, '*বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*'।

৩. কিরণচন্দ্র দত্ত, '*বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*'।

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, '*বাংলার রঙ্গমঞ্চ*'।

৫. জগন্নাথ ঘোষ, '*বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নাট্যতত্ত্ব*'।

৬. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, '*বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা*'।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*' (১৭৯৫-১৮৭৬)।

৮. ড. শেখর সমাদ্দার, '*বাংলার নাট্যসংস্কৃতির ইতিহাস*'।

৯. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*' তৃতীয় খণ্ড।

১০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, '*বাংলা নাটকের বিবর্তন*'।

একক-১২ ❑ উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য (উপন্যাস ও ছোটোগল্প)

গঠন

১২.১. উদ্দেশ্য

১২.২. প্রস্তাবনা

১২.৩. বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতি পর্ব

১২.৩.১. সামাজিক নকশা জাতীয় রচনা

১২.৪. ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

১২.৫. বঙ্কিম প্রভাবিত ঔপন্যাসিক গোষ্ঠী

১২.৫.১. ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আদিপর্ব

১২.৬. বাংলা ছোগল্পের গোড়ার কথা

১২.৭. রবীন্দ্র ছোটোগল্প : হিতবাদী- ভারতী- সাধনা পর্ব

১২.৮. সারসংক্ষেপ

১২.৯. অনুশীলনী

১২.১০. গ্রন্থপঞ্জি

১২.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন—

- বাংলা কথাসাহিত্য রচনার প্রেক্ষাপট বা পটভূমি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে উপন্যাস রচনার নামে যেসমস্ত নকশা জাতীয় রচনা করা হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে ছাত্ররা সম্যকভাবে অবহিত হবে এবং এর থেকে উপন্যাস এবং নকশা জাতীয় রচনার প্রধান পার্থক্যগুলি তাঁরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।
- বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার বৈশিষ্ট্য এবং এই ধরনের উপন্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঘরানা তৈরি করলেন বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের রচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরা একটি সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

- বাংলা সামাজিক ও দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান কতখানি ছিল সে সম্পর্কে তাঁরা সম্যকভাবে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিতি লাভ করতে পারবেন।
- উপন্যাস ও ছোটোগল্পের প্রধান প্রধান প্রকরণগত পার্থক্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথের অবদান ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

১২.২. প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক শিল্পরূপ কথাসাহিত্য। উপন্যাস ও ছোটোগল্প এর প্রধান দুটি দিক। কাহিনি, চরিত্র, বাস্তবতা, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন, সংলাপ, মনস্তত্ত্ব আধুনিক উপন্যাস রচনার প্রধান ভিত্তি। উনিশ শতাব্দীর যাটের দশক কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ঘোর পালাবদল ঘটেছে। ইতিহাস ও রোমান্সের ওপর ভিত্তি করে বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টি করলেন বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী বেশ কয়েকটি উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে বঙ্গদর্শন পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি তৈরি হল। পদ্মাতীরবর্তী নদীচুম্বিত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো দুঃখকথার প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু ছোটোগল্প। বর্তমান অধ্যায়ে গৃহীত পাঠ পরিকল্পনায় বাংলা কথাসাহিত্যের এই নবতর শিল্পরূপগুলির আলোচনা একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। যা ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও বোধসঞ্চারে বিশেষভাবে সক্ষম হবে।

১২.৩. বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্ব

ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণে আধুনিক মানুষের যে নিরন্তর জীবন সংগ্রাম, উপন্যাস তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনি, চরিত্র, বাস্তবতা, ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন, সংলাপ, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি উপন্যাসের নানা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল। যদিও মধ্যযুগের এইসমস্ত আখ্যানভাগ কাব্যিক স্টাইলে রচিত হয়েছিল। উপন্যাস সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা বিশ্বসাহিত্যে তখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে বাংলা উপন্যাস রচনার রীতিটি তখনও আয়ত্ত হয়নি। নবজাগরণের স্পর্শে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁদের নকশা জাতীয় রচনায় উপন্যাস রচনার রীতিটিকে অনুসরণ করেছিলেন। উনিশ শতাব্দীতে সামাজিক নকা, অনুবাদমূলক রচনা, নীতিকথামূলক আখ্যানজাতীয় বেশ কয়েকটি কাহিনি রচিত হয়েছিল। সামাজিক নকা জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫), 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ', কালীপ্রসন্ন

সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকা' (১৮৬২) প্রভৃতি। অনুবাদমূলক রচনার মধ্যে সংস্কৃত আখ্যানের অনুবাদ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন রচিত 'কাদম্বরী', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। শেক্সপীরীয় নাটকের অনুবাদের মধ্যে গুরুদাস হাজরা রচিত 'রোমিও এবং জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' (১৮৪৮), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণকাহিনিমূলক অনুবাদ রচনার মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' (১৮৫৭), 'বিচিত্রবীর্য্য' (১৮৬২), 'পৌলবর্জিনী' (১৮৬২) প্রভৃতির নাম করা যায়। আখ্যানমূলক রচনার মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নর 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮২২) নীলমণি বসাকের 'নবনারী' (১৮৫২), হানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ও 'সফল স্বপ্ন' (১৮৬২), রামগতি ন্যায়রত্নর 'রোমাবতী' (১৮৬২), গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়বল্লভ'(১৮৬৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১২.৩.১. সামাজিক নকশা জাতীয় রচনা

সাধারণত ব্যঙ্গাবিদ্রূপাত্মক লঘু রসের রচনাকে নকশা বলা হয়। এই ধরনের রচনায় সমাজের জলজ্যান্ত ছবি ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এই ধরনের নিম্নরুচির রস রচনা লেখা হচ্ছিল। এগুলির মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস' বা 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থে শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠিত ভদ্রসমাজ বা মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি নিপুণ ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা বা ইংরেজি ভাবধারার প্রভাবে ইয়ংবেঙ্গল সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যঙ্গাবিদ্রূপের আকারে লেখক এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ ভট্টাচার্য 'নববাবুবিলাস'-কে 'প্রথম বাংলা উপন্যাস'-এর মর্যাদা দিলেও উপন্যাসের গুণ ধর্ম এর মধ্যে সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। তবে মনে রাখতে হবে, নকায় ব্যক্তিগত আক্রমণ থাকলেও সেগুলি শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেনি।

নাগরিক সমাজের বিকৃতির চেহারা 'আলালের ঘরে দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকা'-তেও স্পষ্ট। তবু এই গ্রন্থদুটিতে উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াসটুকু ধরা পড়ে। 'আলালের ঘরে দুলাল' এর মধ্যে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সফল ব্যবসা-বাণিজ্যের ছবি আঁকা হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলালের জীবনের স্পষ্টত দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে, তার অধঃপতন এবং দ্বিতীয় পর্বে অধঃপতন থেকে মুক্তি পেয়ে সে ভালো হতে চেয়েছে। যতদিন তার জীবনে অর্থ ছিল ততদিন তার কোনো চিন্তাভাবনা ছিল না। নিঃস্ব-রিক্ত অবস্থায় তার মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। তখন বাধ্য হয়ে সে কাশীধামে চলে গেছে। আখ্যানে সদসৎ মিলিয়ে নানা চরিত্রের ভিড়। অসৎ চরিত্রগুলির মধ্যে ঠকচাচার চরিত্র সজীব। এছাড়াও বাঞ্ছারাম, বাবুরামবাবু প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে লেখক উপন্যাসের ধর্ম বজায় রেখেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখা নকা জাতীয় বাংলা আখ্যান 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৬৪ সাল। নকশা জাতীয় হলেও এই কাহিনির মধ্যে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার দিক ফুটে উঠেছে। কোনো ধারাবাহিক কাহিনি আলোচ্য গ্রন্থে নেই। সেসময়ের 'বাবু কালচার' যাত্রাগান, গাজনের সং, চড়ক, রাসলীলা, মাহেশের স্নানযাত্রা ইত্যাদি শহর কলকাতার উঠতি বাবুদের কাহিনি অত্যন্ত সরসভাবে আলোচ্যগ্রন্থে ফুটে

উঠেছে। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে এবং পরে দুই খণ্ড একসঙ্গো ১৮৬৪ সালে প্রকাশ পায়। বইটির মধ্যে কলকাতার খাঁটি ককি বা কথ্যভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা, ইডিয়মের যথেষ্ট ব্যবহার, চলিতরীতির প্রয়োগ চোখে পড়ে।

এছাড়াও পর্তুগিজ মিশনারিরা ধমপ্রচারের স্বার্থে যেসব আখ্যান সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে সমাজ-সমস্যায় পীড়িত মানুষের ছবি উঠে এসেছিল। প্রসঙ্গাক্রমে হানা ক্যাথেরিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' রচনাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। গ্রন্থটি মূলত একটি ইংরেজি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। একটি খ্রিস্টান পরিবারের ঘটনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এর আখ্যানভাগ উপন্যাসসুলভ হয়ে ওঠেনি। এমনকি এটি লেখকের মৌলিক রচনাও নয়। কাহিনি, চরিত্র, লেখকের জীবনবোধ ইত্যাদি উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্টা এতে ধরা পড়েনি। বিশেষত এর নীরস কাহিনিবিন্যাস পাঠকের কাছে গৃহীত হয়নি। কাজেই, বাংলা সাহিত্যে রচনাটি উপন্যাসের মর্যাদাভুক্ত হয়নি। বাংলা কথাসাহিত্যের মুখবন্ধস্বরূপ এই রচনাধারাগুলিকে কোনো অংশেই ছোটো করা যায় না। বরং উল্লিখিত রচনাগুলিকে বাংলা কথাসাহিত্যের পূর্ব প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। ১৮২০-১৮৬৫ পর্যন্ত সময়কাল বাংলা কথাসাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ রূপে উল্লেখ করা যায়।

১২.৪. ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কথাকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। কাহিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লেখা। এটি ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব মোট চোদ্দোখানি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেসব রচনায় ইতিহাস-রোমান্স, সমাজ, ধর্ম ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি নানাদিক ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য তিনি প্রথমে ইংরেজিতে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসটির নাম 'Rajmohanós wife', উপন্যাসটি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে 'Indian Field' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে শেষে অসমাপ্ত থাকে। বঙ্কিম শতবর্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস 'রাজমোহনের স্ত্রী' নামে এর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও মোট চোদ্দখানি উপন্যাস লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসগুলি নানাধারায় রচিত হয়েছিল। এগুলি হল :

রোমান্স ও ইতিহাসধর্মী রচনা : 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২)।

সমাজ ও পরিবারমূলক রচনা : 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), 'রাধারানী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

তত্ত্ব ও দেশাত্মবোধক রচনা : 'আনন্দমঠ (১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরানী (১৮৮৫), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা তিনিই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন। ইতিহাসের অনুবর্তন, ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ কিছু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে বাংলার পাঠান-মোগল

দ্বন্দ্ব, 'কপালকুণ্ডলা'-য় জাহাঙ্গীরের আমল, 'মৃণালিনী'-তে তাতার-তুর্কির আক্রমণ, 'চন্দ্রশেখর'-এ মোগল আমলের শেষাংশ পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে রাণা রাজসিংহের সাথে ঔরঙ্গজীবের বিরোধিতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রোমান্স হিসাবে 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে বিমলা-আয়েষা-তিলোত্তমা, 'কপালকুণ্ডলা'-য় কপালকুণ্ডলা- মতিবিবি-নবকুমার, মৃণালিনী'-তে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী-পশুপতি-মনোরমা, 'চন্দ্রশেখর'-এ চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবালিনী রোমান্সের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, প্রেমের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা সন্নিবেশ, কল্পনার অতিরেক, বর্ণনার বৈচিত্র্য উপন্যাস রচনার প্রাথমিক দাবি পূরণ করেছিল। উপন্যাসে ইতিহাস-রোমান্সধারার তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। ইতিহাসকে কল্পনার রঙে মণ্ডিত করে যেসমস্ত রচনা তিনি করেছিলেন তাতে ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠার অভাব থাকতে পারে কিন্তু উপন্যাস হিসাবে সেগুলিকে কোনো অংশেই খাটো করা যায় না।

সামাজিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) রচনাদুটির মধ্যে দিয়ে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী নামে এক বাল্যবিধবার রূপে আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ভূস্বামী নগেন্দ্রনাথ। এটি ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাস। এখানে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গুণধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। তবে নীতিবাদী বঙ্কিমের আদর্শিলতার কারণে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে, বিষয়বস্তুতে এসেছে কৃত্রিমতা। ড় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই দুইখানি উপন্যাসই গভীররসাত্মক ও উভয়েরই পরিণতি বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপৎপাতের মূল কারণ অনিবার্য রূপতৃষ্ণা, রমণী রূপমুগ্ধ পুরুষের প্রবৃত্তিদমনে অক্ষমতা, উভয়েই বঙ্কিম এই অন্তর্বিরোধের চিত্র খুব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত, গভীর অসংযত ভাবপ্রাবল্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন"।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের কেঁ তে প্রমুখ Positivisté-দের আদর্শ অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম'-উপন্যাসের কাহিনি পরিকল্পনা করেছেন। আনন্দমঠে দেশপ্রেম, 'দেবী চৌধুরাণী'-তে প্রফুল্লের মধ্যে দিয়ে গীতার নিষ্কাম ধর্মাদর্শ, 'সীতারাম'-এ হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' (১৮৮২)। চঞ্চলকুমারীকে বিবাহের ইচ্ছা থেকে ঔরঙ্গাঙ্গজীব ও রাজসিংহের বিরোধ, পরিশেষে রাজসিংহের জয়লাভ ও চঞ্চলকুমারীর পাণিগ্রহণ উপন্যাসের মূল বিষয়। রূপজ প্রেম, প্রাক বিবাহ প্রেম, ত্রিকোণ প্রেম-বাংলা সাহিত্যে প্রেমের বিচিত্র ধারার তিনিই প্রবর্তক। 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে তার সৃষ্টি, 'কপালকুণ্ডলা'-তে বিকাশ এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ পরিণতিলাভ করেছে।

উপন্যাসগুলি পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিও কম ছিল না। কাহিনির ক্ষেত্রে তিনি রোমান্সকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কখনো গীতিরসের উচ্ছ্বাস, কখনো নাটকীয়তা, কখনো মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিতে বাধাসৃষ্টি করেছে। চরিত্রসৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্বলতা ধরা পড়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে আয়েষা বা তিলোত্তমা লাজনম্রা বাঙালি নারীর প্রতিনিধি। ইতিহাসোচিত বীরধর্ম তাদের মধ্যে আরোপিত হয়নি। নবকুমার অর্ধস্ফুট ও ব্যক্তিত্বহীন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি বা মনোরমা ছাড়া কোনো চরিত্রই বিকাশলাভ করেনি। উপন্যাসগুলির দুর্বলতা প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বঙ্কিমের মধ্যে যে সুপ্ত কবিটি কবিতার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই, তিনিই যেন প্রতিশোধ

লইবার জন্য ঔপন্যাসিকের বাস্তব চিত্রগুলির উপর কল্পলোকের এক অসম্ভব আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন।" তবু বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে 'বিষবৃক্ষ', কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদি কতিপয় উপন্যাসে তিনি যে বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির পরিচয় রেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

১২.৫. বঙ্কিম প্রভাবিত ঔপন্যাসিক গোষ্ঠী

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম অনুবর্তী লেখকগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেউই প্রতিভার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমমানে পৌঁছাতে পারেননি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখলেও দু'খানি সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমী আদর্শবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখলেন। উপন্যাস দুটি যথাক্রমে 'সংসার' ও 'সমাজ'। উপন্যাস দুটিতে বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহে অনিচ্ছুক রক্ষণশীলদের অতিরিক্ত নাসিকাকুঞ্চনকে তিনি গুরুত্ব দেননি।

বঙ্কিমী প্রভাবে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন 'বঙ্গাবিজেতা', (১৮৭৪) 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯)। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই ইতিহাসের পাশাপাশি রোমান্স রসের উৎসার ঘটেছিল। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (১৮৬৯, ১৮৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থেও ইতিহাসের তথ্য সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে চিরন্তন মানবিক আবেদন সেভাবে ধরা পড়েনি। গ্রামীণ কৃষকজীবনের আদর্শে রমেশচন্দ্র দত্তর 'সংসার' ও 'সমাজ' নামক উপন্যাসদুটি পরিকল্পিত হয়েছিল। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তিনি উক্ত রচনাদুটিতে নিজের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সামগ্রিক জীবনসত্যের প্রতিফলন রমেশচন্দ্রের লেখায় ছিল না।

বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৃহত্তর পরিকল্পনা 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) উপন্যাস। গল্প বলার এক অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাঁর ভাষায়। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। গ্রামবাংলার একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের কাহিনিকে অবলম্বন করে 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস রচিরত হয়েছিল। সহজ, সরল গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার হিসাবে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তবে প্লট, চরিত্র বা ঔপন্যাসিকের অখণ্ড জীবনবোধ সৃষ্টির দক্ষতায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

এই পর্বেই প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, দামোদর মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকরা কথাসাহিত্যে অল্পবিস্তর অবদান রেখেছিলেন। যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আগাগোড়া কাহিনি নিয়ে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দুটি খণ্ডে নির্মাণ করেছিলেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থ। এইসময় দামোদর মুখোপাধ্যায় লঘুরসের গালগল্প রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র অসমাপ্ত কাহিনি নিয়ে তিনি রচনা করেন 'নবাবনন্দিনী' উপন্যাস। বস্তুতপক্ষে দামোদরের রচনাগুলিকে কতখানি উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায় সে নিয়ে প্রশ্ন এসে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচিত উপন্যাসের মধ্যে, 'মেজবৌ, 'নয়নতারা', 'যুগান্তর', 'বিধবার ছেলে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এগুলিতে ঔপন্যাসিকের দক্ষতা তেমন ফুটে ওঠেনি। রচনাতারল্য এগুলির

প্রধান দিক। রবীন্দ্র অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী এইসময় ছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৮৭৬ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে, 'মিবাররাজ', 'ছিন্নমুকুল', 'মালতী', 'হুগলীর ইমামবাড়ি', 'বিদ্রোহ', 'স্নেহলতা বা পালিতা', 'কাহাকে' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা এইসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১২.৫.১. ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: আদিপর্ব

এই পত্রিকাতেই প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'করুণা' এবং আরও দুটি অপরিণত উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)। যেখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'বউঠাকুরানীর হাট' রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। যদিও প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা পিতৃব্য বসন্তরায়, পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভার বেদনাময় কাহিনিই উপন্যাসে অধিক স্থান লাভ করেছে। প্রতাপ চরিত্র চিত্রণে প্রচলিত রীতি ও আদর্শকে উপেক্ষা করে নির্মম অপরিণামদর্শী রূপে লেখক অঙ্কন করেছেন। কাহিনি বয়ন ও চরিত্রচিত্রণে লেখকের প্রতিভার অভাব ধরা পড়েছে। প্রতাপ অপেক্ষা পুত্র উদয়াদিত্যের প্রেমাদর্শ উচ্চতর জীবনের পরিচয়বাহী।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণত ও শিল্পগুণান্বিত রচনারীতির নিদর্শন 'রাজর্ষি' উপন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি ত্রিপুরার রাজবংশ। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান প্রথাকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে রাজা গোবিন্দমাণিক্যর সঙ্গে পুরোহিতের দ্বন্দ্ব বাধে। প্রেম ও প্রথার সংঘাত উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় শক্তি। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের ষড়যন্ত্র, রঘুপতির ব্রাহ্মণ্যধর্মের দণ্ড, সবশেষে জয়সিংহের আত্মহত্যায় উপন্যাস ট্র্যাজিক পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের যথার্থ শিল্পলক্ষণ সমৃদ্ধ রচনার পরিচয় 'রাজর্ষি' উপন্যাস। যদিও গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের প্রসারতা কম। চরিত্রটি ভাবুকতায় আচ্ছন্ন। একমাত্র জটিল ও জীবন্ত চরিত্র পুরোহিত রঘুপতি। জয়সিংহের মৃত্যুর পর তার হাহাকার কাহিনিকে ট্র্যাজিক মহত্ত্ব দান করেছে। উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিবয় দিলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে। এগুলি হল :

এক। ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাব বা তত্ত্বকে অনুসরণ করেছিলেন। ইতিহাস অপেক্ষা তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই ছিল কবির উদ্দেশ্য।

দুই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনিগত সংহতি, চরিত্র নিয়ন্ত্রণ কুশলতা অনেক বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেননি।

তিন। রোমান্স ও কল্পনার সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্র উপন্যাসের পরিসর অনেকটাই বাস্তব এবং সাধারণ।

চার। রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁর উপন্যাসের নামকরণেও কবিধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমী-উপন্যাসের নামকরণ চরিত্রধর্মী।

তবে উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে বঙ্কিমী স্বাতন্ত্র্যের দিকটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কেননা, ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাব বা তত্ত্বকে অনুসরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনিগত সংহতি, চরিত্র নিয়ন্ত্রণ কুশলতা অনেক বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সেই দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কবির কল্পনা, ভাবের আতিশয্য প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমী-উপন্যাসের নামকরণ চরিত্রধর্মী। তবে শব্দপ্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম ও সমাসবদ্ধ শব্দাড়ম্বরের গাম্ভীর্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষা সহজ-সরল এবং ভাবব্যঞ্জনামুখ্য।

১২.৬. বাংলা ছোটোগল্পের গোড়ার কথা

আকৃতিতে সংক্ষিপ্ত এবং কাহিনিপ্রধান শিল্পরূপকে ছোটোগল্প বলা হয়। ছোটোগল্পের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে Hudson লিখেছেন-A short story must contain one and only one informing idea– and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method. ছোটোগল্পের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে 'সোনারতরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ছোটপ্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

ছোটোগল্পের সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞাদান করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আধুনিক ছোটোগল্পকে মানুষের যন্ত্রণার ফসল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "ছোটোগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্যসংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" অন্যান্য দেশের সাহিত্যের মতোই বাংলা সাহিত্যেও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ছোটো ছোটো বিষয় বা খণ্ড কাহিনিকে কেন্দ্র করে লেখক ছোটোগল্পের রূপ বা অবয়ব নির্মাণ করেন। এখানে চরিত্রের একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ প্রতিবিম্বিত হয়। ছোটোগল্পের পরিণতিতে থাকে সাংকেতিকতা বা ইঙ্গিতময়তা। ছোটোগল্পে সমাজজীবনের সংক্ষিপ্ত চেহারা যেমন তুলে ধরা হয়, তেমনি চরিত্রের অসম্পূর্ণ চেহারা উঠে আসে। ছোটোগল্প পাঠের শেষে পাঠকের মনের মধ্যে অতৃপ্তির জন্ম হয়। চেকভ, মোপাসাঁ, এডগার অ্যালান পো প্রমুখ বিশ্বসাহিত্যের প্রখ্যাত ছোটোগল্পকার। প্রতীতির সমগ্রতা তাঁদের রচনার একটি বিশেষ দিক।

কথাসাহিত্যের দ্বিবিধ ধারা উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মধ্যে ছোটোগল্পের ভূমিকা স্বতন্ত্র। সাধারণভাবে বৃহত্তর পরিসরে চরিত্র ও ঘটনার প্রসারকে উপন্যাস এবং স্বল্প পরিসরে ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বিত আখ্যানকে ছোটোগল্প বলে মনে করা হয়। তবে সবসময় এই সংজ্ঞা সঠিক নয়। ছোটোগল্প প্রত্যক্ষভাবে স্বতন্ত্র এবং উপন্যাসের সঙ্গে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ছোটোগল্পকে বড়ো করে লিখলে যেমন তা উপন্যাস হয় না, তেমনি উপন্যাসকে ছোটো করে লিখলেও তা ছোটোগল্প হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ল্যাবরেটরী', 'নষ্টনীড়' ইত্যাদি যেমন আয়তনে বড়ো, কিন্তু তা ছোটোগল্পের পর্যায়ভুক্ত। উপন্যাসে থাকে বহু চরিত্রের সমাবেশ কিন্তু ছোটোগল্পে বহু চরিত্রের সমাবেশ থাকে না। হঠাৎ কোনো এক চমকের দ্বারা ছোটোগল্পের আরম্ভ হয়, আবার পরিণতির মধ্যেও থাকে চমক। উপন্যাসে চরিত্রের বিশ্লেষণ ও সামগ্রিক জীবনচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। উপন্যাসের মূল কাহিনির পাশাপাশি থাকে উপকাহিনি, যা মূল কাহিনিকে স্পষ্ট ও উপজীব্য করে তোলে। কিন্তু ছোটোগল্পে জীবনদৃষ্টির প্রসারতা থাকে না।

ছোটোগল্পকে নানাধারায় ভাগ করা যায়। এগুলির মধ্যে প্রেমমূলক গল্প, প্রকৃতি কেন্দ্রিক গল্প, অতিলৌকিক বা ভৌতিক গল্প, হাস্যরসাত্মক ছোটোগল্প, সামাজিক গল্প, সাংকেতিক গল্প প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটোগল্প আমরা পাই উনবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে। তবে ছোটোগল্পের সংজ্ঞা কিংবা বৈশিষ্ট্যের মতোই বাংলা ছোটোগল্পের জন্ম বা উদ্ভব নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। ১২৭৯-৮০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক তথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দিরা' কিংবা 'যুগলাঙ্গুরীয়'-কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক প্রথম ছোটোগল্প বলে চিহ্নিত করেছেন, তবে একথাও ঠিক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই দুটি রচনাকে কখনোই ছোটোগল্প বলে আখ্যা দেননি বরং তিনি এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস বলেই আখ্যা দিয়েছেন।

বঙ্কিম-কনিষ্ঠ লেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' (১২৮০ বঙ্গাব্দ) গল্পটিকে প্রথম বাংলা ছোটোগল্প বলে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া 'ভ্রমর' পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং 'দামিনী' এই দুটি রচনাও ছোটোগল্প হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প প্রকাশিত হবার আগে যে সমস্ত গল্প লেখা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে 'দামিনী' শ্রেষ্ঠ। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'ললিত সৌদামিনী', 'সুখ-দুঃখ', 'নিধিরাম' নামক তিনটি গল্প নামে সংকলিত করেছিলেন। ছোটোগল্পের সূচনা পর্বের প্রতিনিধি লেখক হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। উনিশ শতকে যারা গল্প লিখেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা', 'ডমরুচরিত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, "বাংলা গল্পে দৃশ্যমান জীবনকে তিনি কৌতুকের স্মিতহাস্যে সঞ্জীবিত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক হিউমারিস্ট"। 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় সেইসময় আরও বেশ কিছু ছোটো আকারের গল্প রচনা চলছিল। তবে একথাও ঠিক যে, উল্লিখিত গল্পকারদের গল্পগুলি ছোটোগল্প রূপে সাময়িক স্বীকৃতি পেলেও সেগুলি আঙ্গিকগত এবং প্রকরণগত দিক থেকে অর্থাৎ ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যর সবকটি শর্তপূরণ করে না।

১২.৭. রবীন্দ্র ছোটোগল্প : হিতবাদী- ভারতী- সাধনা পর্ব

বাংলা ছোটোগল্পের রাজাধিরাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভিখারিণী' (১২৮৪) নামক গল্পটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প রচনার সূত্রপাত ঘটে। যদিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই গল্পটিকে ছোটোগল্প বলে স্বীকৃতি দেননি। এর কয়েক বছর পর ১২৯১ বঙ্গাব্দে রচিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঘাটের কথা' গল্পটিকে তিনি তাঁর প্রথম সার্থক ছোটোগল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পগুলি রচনার পেছনে রয়েছে সাময়িক পত্রের চাহিদা। এছাড়াও পূর্ব বঙ্গের প্রেক্ষাপট। পদ্মা সংসর্গে থাকা পল্লীসমাজের সঙ্গে নিগূঢ় যোগাযোগ, জমিদারি দেখাশোনার কাজে পদ্মাতীরবর্তী এলাকায় মানুষজনদের কাছ থেকে দেখা একটি অন্যতম কারণ তার ছোটোগল্প লেখার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "গল্পগুচ্ছে বাংলা ছোটগল্প আমিই আরম্ভ করেছিলুম"। 'ছিন্নপত্র' রচনার সময় গ্রামের প্রকৃতি, মানুষ এবং তাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা লেখকের জীবনদর্শনের গভীরতায় গল্প আকারে স্থান পেয়েছে তার সাহিত্যে। কালিগ্রাম, পতিসর, সাজাদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণের সময় সেখানকার নানাকাহিনি তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' এর গল্পের পটভূমি। এই সময়-পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলি। যেগুলিকে নানা পর্বে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে, হিতবাদী, সাধনা ও ভারতী পর্বে রচিত ছোটোগল্পগুলিই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ভারতী'-র আগেই 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ছয়টি গল্প। এগুলি হল, 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'ব্যবধান', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সহজ-সরল রূপের সঙ্গে পরিচিত হন, এইসময় 'ভারতী-সাধনা' পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলিকে বিশিষ্ট রূপদান করেন। এই পর্বকেই বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের স্বর্ণযুগ। এখানে নতুন ভাবে-ভঙ্গিতে তাঁর ছোটোগল্প নতুন থেকে নতুনতর হয়ে উঠল। পোস্টমাস্টার' গল্পে শহুরে যুবক পোস্টমাস্টার এবং গ্রাম্য বালিকা রতন একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। রোগাক্রান্ত পোস্টমাস্টারকে রতন সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছে। কিন্তু পোস্টমাস্টার যখন গ্রাম ছেড়ে চিরতরে শহরে ফিরে যায় তখন সে রতনকে তার সঙ্গে নিয়ে যায়নি। সে শুধু নিজের কথাই ভেবেছে, নিঃসঙ্গ রতনের মনের খবর সে কখনও রাখেনি। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় পোস্টমাস্টার ভাবে-" জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী, পৃথিবীতে কে কাহার"। এই বেদনা, এই অনন্ত ট্র্যাজেডি গল্পকে বৈশ্বিক রূপদান করেছে।

হিতবাদী-সাধনা পর্বে (১৮৯১-১৮৯৫) রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল, দেনাপাওনা, পোস্টমাস্টার, গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, ত্যাগ, একরাত্রি, জীবিত ও মৃত, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, মধ্যবর্তিনী, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, প্রায়শ্চিত্ত, অতিথি, আপদ, মানভঞ্জন, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি। ভারতী পর্বে (১৮৯৮-১৯০৭) রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল, দুরাশা, মণিহারা, দৃষ্টিদান, শুভদৃষ্টি, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, নষ্টনীড়, মাল্যদান, কর্মফল, মাস্টারমশাই, গুপ্তধন প্রভৃতি।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এই পর্বের গল্পগুলির মূল অবলম্বন। নদীচুম্বিত পরিবেশ শিলাইদহ, সাজাদপুর অঞ্চলে নিসর্গের নিবিড় সান্নিধ্যে কবি বহু গল্প লিখেছেন। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'একরাত্রি', 'ছুটি', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি', 'সুভা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মানুষের আবেগ, আনন্দ প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠেছে। 'ছুটি' গল্পে ফটিকের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। পিতৃহীন বালক ফটিক যখন মামাবাড়ি আশ্রয়গ্রহণ করে তখন তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয় এবং শেষে তার মৃত্যু হয়, পৃথিবী থেকে তার ছুটি হয়। 'অতিথি' গল্পেও প্রকৃতির প্রাধান্য দেখা যায়। মোহহীন বালক তারাপদ প্রকৃতির সঙ্গে তার একাত্মতা প্রবল, সে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে খুব অল্প সময়েই। সে কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি, এগিয়ে গেছে অজানাকে উপলব্ধি করার আশায় বন্ধন থেকে মুক্তি খুঁজে নিয়েছে। 'শাস্তি' গল্পে চন্দরা তার স্বামীকে ভালবেসেছিল অন্তর থেকে কিন্তু যখন তার স্বামী তাকে মিথ্যে খুনের দায় নিতে বলে তখন সে গভীরভাবে আহত হয়। এবং ভালোবাসার ছলনা সহ্য করতে না ফেরে সে মৃত্যুকে বেছে নেয়। গভীত জীবন জিজ্ঞাসার ছবি গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে।

ছোটোগল্পগুলিতে নানা ধরনের মানুষের ছবি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপকথার রাজা, রানি থেকে বিত্তহীন জমিদার, দরিদ্র কৃষক, হতভাগ্য গ্রাম্যবধূ, নিষ্ঠুর পুরুষ, চঞ্চল কিশোর-কিশোরী প্রত্যেকের ছবিই গল্পে উঠে এসেছে। বিষয় হিসেবে এসেছে ভ্রাতৃস্নেহ, জমিদারি আনুগত্য, অম্লমধুর প্রেম, ভালোবাসার বেদনা, জটিল প্রেমের বিসর্পিল চেহারা। পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি সম্পর্ক 'দান প্রতিদান', 'ব্যবধান', 'দিদি', 'পণরক্ষা' প্রভৃতি গল্পে ফুটে উঠেছে। প্রতিদিনের জীবনের দুঃখ, আশাভঙ্গের বেদনা, আনন্দের চেহারা অত্যন্ত মন্থর গতিতে লেখক গল্পের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করেছেন। গল্পগুলিতে উঠে এসেছে গীতিমধুর পরিবেশ। কাহিনি বর্ণনায় চরিত্র রূপায়ণে গীতিময় সুরের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। 'একরাত্রি' গল্পে দেখি,

তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না, এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

একোনো ছোটোগল্পকারের বর্ণনা নয়, কবির লেখা কাব্য। রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস, সুরের প্রবাহ এই পর্বের লেখাগুলিকে উজ্জ্বল মাধুর্যদান করেছে। গল্পগুলিতে ঘটনার গতি অতি ধীর।

১২.৮. সারসংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক শিল্পরূপ কথাসাহিত্য। উপন্যাস এবং ছোটোগল্প এর প্রধান দুটি দিক। বাস্তবতা আধুনিক কথাসাহিত্যের মূলভিত্তি। উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্ব থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের হাত ধরে বাংলায় কথাসাহিত্য ধারার সূচনা হয়। কিন্তু সেই যাত্রাপথ ছিল অপ্রশস্ত, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক এবং সর্ববাদীসম্মত রূপ গড়ে উঠলো। ১৮৬৫ সালে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী'-ই হয়ে উঠল প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। মূলত ইতিহাস এবং রোমান্সকে ভিত্তি করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস রচনা করেছিলেন। বঙ্কিম সমসাময়িক কালে

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা উপন্যাস রচনার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু কাহিনিবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, বাস্তবতা নির্মাণ ও লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলনে তাঁরা উপন্যাসিকের সার্থকতা বজায় রাখতে পারেননি। বাংলা সাহিত্যের এই পর্বে উপন্যাস রচনায় মহিলারা সেভাবে এগিয়ে না এলেও ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কতিপয় উপন্যাসে মুনশিয়ানার পরিচয় রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখক জীবনের আদি পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রকে অবলম্বন করে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলেন। এই পর্বেই বাংলা ছোটোগল্পেরও সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল একেবারেই অপরিণত। এইসময় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন প্রথম বাংলা ছোটোগল্প 'মধুমতী'। বস্তুতপক্ষে, এই পর্বে ছোটোগল্পকে যথার্থ শিল্পরূপের পর্যায়ে উন্নীত করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। তাঁর পদ্মাতীরবর্তী অধ্যায়ে 'হিতবাদী', 'ভারতী' এবং 'সাধনা' পত্রিকায় যে ছোটোগল্পগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্প।

১২.৯. অনুশীলনী

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বাংলা উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

২. বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির যে প্রয়াস লক্ষ করা যায় তা আলোচনা করো।

৩. বঙ্কিম অনুবর্তী লেখকদের রচনারীতির পরিচয় দাও এবং বাংলা সাহিত্যে তার গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৪. সামাজিক উপন্যাস সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখ করো।

৫. উপন্যাস সৃষ্টির আদি পর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করো।

৬. ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৭. ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। বাংলা ছোটোগল্প রচনার আদি পর্বে কয়েকজন রচনাকারের নাম ও তাঁদের গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৮. ভারতী ও সাধনা পর্বে রবীন্দ্র-রচিত ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো।

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. উপন্যাসের প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

২. ছোটোগল্প বলতে কী বোঝ?

৩. ছোটোগল্পের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ?

৪. বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় উপন্যাসধর্মী রচনাগুলির পরিচয় দাও।

৫. বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্য লেখো।

৬. বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান উল্লেখ করো।

৭. 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে কী কারণে উল্লেখযোগ্য?

৮. বাংলা সাহিত্যে 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থটির উপযোগিতা কোথায়?

৯. বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সামাজিক উপন্যাসগুলির নাম এবং গুরুত্ব উল্লেখ করো।

১০. উপন্যাস সৃষ্টির আদি পর্বে 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থটির ভূমিকা উল্লেখ করো।

১১. ভারতী ও সাধনা পর্বে রবীন্দ্র-রচিত গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য লেখো।

❑ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কী?

২. 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থ কে রচনা করেছিলেন?

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নাম কী?

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম লেখো।

৫. 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাস দুটির রচয়িতা কে?

৬. 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন?

৭. 'বন্দেমাতরম' সংগীত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোনউপন্যাসে পাওয়া যায়?

৮. প্রথম বাংলা ছোটোগল্পের নাম লেখো।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোটোগল্পের নাম কী?

১০. 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গল্পের নাম উল্লেখ করো।

১১. বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত দুজন বাংলা উপন্যাসিকের নাম লেখ।

১২.১০. গ্রন্থপঞ্জি

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*কালের প্রতিমা*'।

২. অলোক রায়, '*কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*'।

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*'।

৪. ক্ষেত্র গুপ্ত, '*বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*', প্রথম খণ্ড।

৫. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, '*বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা*'।

৬. বিজিতকুমার দত্ত, '*বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস*'।

৭. ভূদেব রায়চৌধুরী, '*বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*'।

৮. শিশিরকুমার দাস, '*বাংলা ছোটগল্প*'।

৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*'।

১০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা উপন্যাসে কালান্তর*'।

১১. সুকুমার সেন, '*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*', চতুর্থ খণ্ড।

মডিউল-৪

বিশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাস

একক-১৩ ❑ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প)

এককটির গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য
১৩.২ প্রস্তাবনা
১৩.৩ বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
১৩.৪ বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প)
১৩.৫ সহায়ক গ্রন্থ
১৩.৬ প্রশ্নাবলি

১৩.১ উদ্দেশ্য :

বর্তমান অধ্যায়ে বিশ শতক কাকে বলে তা জানার সমান্তরালে বিশ শতককে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করা হবে। বিশ শতকের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যকে সম্যকভাবে অনুধাবন করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিশ শতকের প্রথমার্ধ। সুতরাং বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপকে জানা এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাই এই এককটি রচনার মূল লক্ষ্য।

১৩.২ প্রস্তাবনা :

বিশ শতক বলতে বোঝায় ১৯০১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। বিশ শতকের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা অতিক্রম করেছেন উনিশ শতক বা ঊনবিংশ শতক অর্থাৎ ১৮০১ খ্রি. থেকে ১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত। বর্তমানে আমরা আছি একবিংশ শতকে; যার সূচনা হয়েছে ২০০১ খ্রি. থেকে এবং সমাপ্তি হবে ২১০০ খ্রি. গিয়ে। আমাদের আলোচ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ওই সময়ে রচিত বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

১৩.৩ বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট :

এই অংশে আমরা বিশ শতকে ঘটে যাওয়া কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার কথা জেনে নেব, যা সেই সময়ের মানুষের চিন্তন-মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ শতকে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাই যে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকারদের মন ও মেজাজকে প্রভাবিত

করবে এমন কোনো কথা নেই। উনিশ শতকের ঘটনাক্রমের প্রভাবও সেক্ষেত্রে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। আসলে চিন্তন ও সৃষ্টি একটি ধারাবাহিক বিবর্তনমূলক ও সজীব প্রক্রিয়া। বিশশতকের প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া যে ঘটনাগুলি যুগপৎ ইতিহাস এবং সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল—

- ১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
- ১৯১৩—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।
- ১৯১৪—ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ।
- ১৯১৪-'১৯—প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
- ১৯২০—ভারতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রবেশ। বোম্বাই অধুনা মুম্বাইতে প্রথম নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়।
- ১৯২২—ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি পথ চলা শুরু করে।
- ১৯৩৯-'৪৪—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।
- ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
- ১৯৪৬-এর দাঙ্গা।
- ১৯৪৭-এ দেশভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতা মানুষের জীবনকে যান্ত্রিক করতে থাকে। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ বাড়তে থাকে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকেই শুরু হয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। আশাবাদ তিরোহিত হয়ে নৈরাশ্যবাদ মানুষের জীবনে গুরুত্ব পায় এবং সেই সঙ্গে নৈরাশ্যবাদের চর্চাও বাড়তে থাকে সাহিত্য থেকে বৌদ্ধিক মহলে। বিচ্ছিন্নতাবাদ বা theory of alienation-এর চর্চা বাড়তে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে কর্মসংস্থানের সন্ধানে। শহরে গড়ে উঠতে থাকা কলকারখানাকেন্দ্রিক বস্তি জীবন এবং একদা গ্রামের ভদ্রলোকশ্রেণি শহরে এসে হয়ে ওঠে আম-নাগরিক। অন্যদিকে যৌথ পরিবার ভাঙতে থাকে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য ভাবনা ও চর্চার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। বিদেশি সাহিত্য পাঠ করে ত্রিশের দশকের বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চাকারী একদল সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বরিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিকতার পূজা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'প্রগতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে তীব্র বাস্তবতা আনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে যৌনতার খোলাখুলি বর্ণনা সাহিত্যের পাতায় প্রতিফলিত হতে থাকে। সবমিলিয়ে বিশশতকের প্রথম দশকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আর এই সবকিছুই বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। কারণ সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোনো দেশেই কোনোপ্রকার সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের আলোচ্য সময় পরিসরেই অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথমার্ধেই ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন এবং দেশ-ভাগ হয়ে যায়। যার প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৩.৪ : বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারা (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্প) :

বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে বাংলা প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটোগল্পের প্রকৃতি ও বিবর্তনের ধারাকে এই আলোচনার মাধ্যমে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এক-একজন লেখককে জানার-বোঝার চেষ্টা করা হবে। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। এই আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়া, আগ্রহীরা পরবর্তীকালে বিশদে নিজেদের কৌতূহল নিবারণ করতে পারবে। কেবলমাত্র কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

১৩.৪.১ প্রবন্ধ : প্রবন্ধ সাধারণ মানুষের সর্বদা মন জয় করতে পারে না। যুক্তি-তর্কের কচকচি সকলের ভালো লাগে না। প্রবন্ধের ধারাতেই লেখা রসরচনা আপামর পাঠকের মন সহজেই জয় করে নেয়। আমরা এই অংশে বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সকল প্রাবন্ধিক আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষপে জানার চেষ্টা করব। এই আলোচনায় আমরা বাংলা প্রবন্ধের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তৈরি করতে পারব, তবে স্বল্প পরিসরে।

১৩.৪.১.১ কয়েকজন প্রাবন্ধিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বিশ শতকের প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নামই স্মরণে আসে। সাহিত্য ও সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনর্গল তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধে তিনি নিজস্ব অনুভূতিকে যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনই যুক্তি-তর্ক-বিশ্লেষণও করেছেন।

সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ—প্রাচীন সাহিত্য (১৯০০), সাহিত্য (১৯০৭), আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), লোকসাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০)। এই প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থগুলোতে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ অনস্বীকার্য। আবার 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'ছন্দ', শব্দতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি বাংলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন।

আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), রাজাপ্রজা (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), পরিচয় (১৯১৬), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সঙ্কট (১৯৪১)-এই সকল প্রবন্ধগ্রন্থে তিনি নিজের রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলেছেন। এখানে কেবলমাত্র দেশের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি, বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও নিজস্ব মত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন।

ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন (১৯০৯-১৬), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩)—এগুলো তাঁর ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক ভাবনার ফসল। বিচিত্রপ্রবন্ধ (১৯০৭), জীবন-স্মৃতি (১৯১২), জাপানযাত্রী (১৯১৯), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯), ছেলেবেলা (১৯৪০), ছিন্নপত্র (১৯১২)—এগুলো রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গ্রন্থ। এই জাতীয় লেখাগুলোতে তিনি মনের কথা বলেছেন। এখানেই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ধরা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) : স্বামী বিবেকানন্দ চলিত বাংলায় তাঁর প্রবন্ধগুলো রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধগ্রন্থই মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (১৯০২), বর্তমান ভারত (১৯০৫), পরিব্রাজক (১৯০৫), ভাববার কথা (১৯০৭)—বিবেকান্দের প্রবন্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও আছে তাঁর লেখা 'পত্রাবলী', চিঠিপত্রের সংকলন। সাধুভাষার রমরমার দিনে বিবেকান্দ বাংলা কথ্যভাষায় লেখালেখি করতে থাকেন। সাধু এবং চলিত দুটি ভাষাতেই তাঁর গদ্য ছিল সহজ-সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী।

ধর্মভাবনা, সমাজচিন্তা, শিক্ষা ইত্যাদি নানান বিষয়ে ভাবনা এই প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থগুলোতে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর বহুচর্চিত 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটি আজও স্মরণীয়। মূর্খ, দরিদ্র, চণ্ডাল ভারতবাসীর জন্য তিনি জোরালোভাবে নিজের বক্তব্য এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) : বিশ শতকে রামেন্দ্রসুন্দর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ— জিজ্ঞাসা (১৯০৪), বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৬), মায়াপুরী (১৯১১), কর্মকথা (১৯১৩), চরিতকথা (১৯১৩), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪), শব্দকথা (১৯১৭), বিচিত্র জগৎ (১৯২০), যজ্ঞকথা (১৯২০), নানাকথা (১৯২৪), জগৎকথা (১৯২৬)। একটা জিনিস লক্ষ করার মতো যে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থের নামে 'কথা' শব্দটি আছে। অর্থাৎ পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ভঙ্গিতে যেন তিনি কলম ধরেছেন। তিনি ছিলেন নিজের ভাষা এবং স্বদেশের একান্ত অনুরাগী। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়েছিল তাঁর উপর। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং প্রকৃত অর্থেই বিজ্ঞানের পূজারী ছিলেন। তাঁর প্রথমদিকে রচিত প্রবন্ধগুলোতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পেত। চার্লস ডারউইনের তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ ভাবনাকে তিনি প্রাত্যহিক জীবন এবং সাহিত্যের নানা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের উপর দর্শনকে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা বিষয়ে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল। বেদচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক 'Aids to Natural Philosophy'।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) : প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বাংলা চলিত গদ্যকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকা। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত লিখতেন। তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো হল—তেল নুন লকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৭), নানা কথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), দু-ইয়ারকি (১৯২১), বীরবলের টিপ্পনী (১৯২১), রায়তের কথা (১৯২৬), নানা চর্চা (১৯৩২), ঘরে বাইরে (১৯৩৬), প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০), বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১৯৪৪), আত্মকথা (১৯৪৬), প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান (১৯৫৩)। প্রমথ চৌধুরী চলিত বাংলা গদ্যকে নিজস্ব বীরবলীয় ঢঙে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে তর্ক-বিতর্ক সমস্ত কিছুর উপযোগী করে তুলেছিলেন। ফরাসী ভাষায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর গদ্যে ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফরাসী ভাষার প্রভাবও তাঁর গদ্যে লক্ষ করা যায়। তাঁর

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রবণতায় অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকরহস্য' গ্রন্থের প্রভাব লক্ষ করেন। চলিত ভাষা কেবল নিজে চর্চা করেই ক্ষান্ত হননি, রীতমতো চলিত ভাষার সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। 'কথার কথা', 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', 'সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা' ইত্যাদি তার প্রমাণ। সাধুভাষাকে তিনি কৃত্রিম ভাষা মনে করতেন। সাহিত্য থেকে শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে কলম ধরে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে একটি বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত প্রবন্ধের বইগুলো হল— বাংলার ব্রত (১৯০৯), ভূতপরীর দেশ (১৩২২), খাতাঞ্চির খাতা (১৩২৩), বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী (১৯৪৯), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৩৫০), ঘরোয়া (১৩৪৮), আপনকথা (১৩৫০)। অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সর্বদা এক সরসতার ছোঁওয়া পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে রূপকথার আমেজও পাওয়া যায়। তাঁর গদ্যে সিরিয়াস রচনার সঙ্গে উদ্ভট রসেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অনায়াসে। এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন পথপ্রদর্শক। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং তাঁর গদ্যভাষাও শিল্পিত। কিন্তু তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ কিছু দান করে যাননি। শিল্পীর খামখেয়ালীর মতোই তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেননি। তাঁর গদ্যের নমুনা দেওয়া যাক 'শিল্পায়ন' প্রবন্ধ থেকে— 'তেমনি আবার দেখি কতকগুলো জিনিস কালবশে অনেকখানি ডৌল ফিরিয়ে, চেহারার অদলবদল করে নিয়ে তবে হল সুন্দর— যেমন ভাঙা চাঁদ, ভাঙা মন্দির, ভাঙা ঘাট, পুরোনো নৌকো, বুড়ো গাছ, বুড়ো মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু একটা ভাঙা হাড় কিম্বা জ্যান্ত মানুষের কাটা হাত কোনো কালেই সুন্দর হতে পারল না'।

১৩.৪.২ উপন্যাস-ছোটোগল্প : এই অংশে আমরা প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় গ্রহণ করব। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে রচিত গল্প-উপন্যাসের নাম, লেখকদের লেখালেখির সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনার নিরিখে লেখকদের বোঝার চেষ্টা করা হবে। সেই সঙ্গে সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যে তাঁদের অবদান এবং কেন তাঁরা আজও আলোচনার দাবি রাখেন তাও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত উপন্যাসের তালিকা— চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৫), ঘরে বাইরে (১৯১৫), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯৩৪)।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি হলেও গল্প-উপন্যাস রচনাতেও তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি কোনো না কোনো বক্তব্যকে বা বলা ভালো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, সেকারণেই তাঁর উপন্যাস লেখা। উপন্যাসের বক্তব্য তিনি অনায়াসে প্রবন্ধের আকারেও বলতে পারতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছুর যেমন তিনি কাণ্ডারী, উপন্যাসের বেশ কিছু ক্ষেত্র তাঁর হাতেই সূচনা হয়েছিল। ছোটোগল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ বলা যায়। সার্থক বাংলা ছোটোগল্প তাঁর হাতেই রচিত হয়। 'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের সংকলন গ্রন্থ। পদ্মানদীতীরবর্তী গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল জীবন তাঁর বেশ কিছু গল্পে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'ভিখারিণী' তাঁর লেখা প্রথম ছোটোগল্প।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প হল—'শাস্তি', 'ছুটি', 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র', 'অতিথি', 'মেঘ ও রৌদ্র' ইত্যাদি। এছাড়াও 'রবিবার' 'শেষকথা','ল্যাবরেটরি'—এই তিনটি গল্প নিয়ে 'তিনসঙ্গী' লিখেছিলেন। এই তিনটি গল্পে তিনি আধুনিক জীবনের সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসগুলো হল—রমাসুন্দরী (১৯০৮), নবীনসন্ন্যাসী (১৯১২), রত্নদীপ (১৯১৫), জীবনের মূল্য (১৯১৭), সিন্দূরকৌটা (১৯১৯), মনের মানুষ (১৯২২), আরতি (১৯২৪), সত্যবালা (১৯২৫), সুখের মিলন (১৯২৭), সতীর পতি (১৯২৮), প্রতিমা (১৯২৯), গরীব স্বামী (১৯৩৮), নবদুর্গা (১৯৩৮), বিদায়বাণী (১৯৩৩)। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হল— নবকথা (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গহনার বাক্স (১৯২১) ইত্যাদি। প্রভাতকুমারের উপন্যাসগুলো একসময় পাঠকের দরবারে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'এর প্রধান আদর্শ হল স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মানবিক জীবনের বৈচিত্র্য, একান্নবর্তী পরিবার, পরিবারকেন্দ্রিক নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা ইত্যাদি ঘরোয়া ধরনের পারিবারিক চিত্র, প্রেমপ্রণয়ের গল্পরস এবং বাৎসল্যের প্রীতি তাঁর কথাগ্রন্থের প্রধান সুর'। ('বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', পৃ. ৫৪৬) তাঁর গল্প-উপন্যাসে গভীর কোনো ভাবনা বা জটিল কোনো তত্ত্বকে সমাধান করতে চাওয়া হয়নি। সহজ-সরল গতিতে কাহিনি ভেসে চলেছে। আসলে দ্বন্দ্বসংঘাতহীন বাঙালি জীবনের কাহিনি রচনা করেছেন। বলা যায় তাঁর গল্পগুলি বাস্তবের মাটিতে জন্ম নিয়ে রূপকথার সুন্দর জগতে প্রবেশ করেছে। তাঁর ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে তিনি রবীন্দ্র-শরৎযুগে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন বাঙালি পাঠকের দরবারে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮) : শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম তিন সফল ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত সমানভাবে বহমান। তাঁর সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি হল সাধারণ মানুষের সাধারণ দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনাকে তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাহিনি হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইতিহাসের গোলোক ধাঁধায় তিনি ঘোরাঘুরি করেননি বা তৎসম শব্দবহুল সাধু ভাষাকে অবলম্বন করেননি। রবীন্দ্রনাথের মতো কঠিন-গভীর ভাবনা বা তত্ত্বকে পরিশীলিত ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি। ফলত শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনের সাধারণ দুঃখ-কষ্টকে প্রায় মুখের ভাষায় কথাসাহিত্যে স্থান দিয়ে আমজনতার লেখক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আমাদের এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় স্বয়ং শরৎচন্দ্রের জবানীতেই ৫৭তম জন্মদিনের প্রতিভাষণে—"আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী'।

এবার আমরা শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাসগুলির নাম প্রকাশকালসহ দেখে নেব—

বড়দিদি (১৩২০/১৯১৩), বিরাজ বৌ (১৩২১/১৯১৪), পন্ডিতমশাই (১৩২১/১৯১৪), পল্লী-সমাজ (১৩২২/১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), শ্রীকান্ত (১মপর্ব-১৩২৩/১৯১৭, ২য় পর্ব- ১৩২৫/১৯১৮, ৩য় পর্ব- ১৩৩৩/১৯২৭, ৪র্থ পর্ব- ১৩৩৯/১৯৩৩), দেবদাস (১৩২৪/১৯১৭), চরিত্রহীন (১৩২৪/১৯১৭), দত্তা

(১৩২৫/১৯১৮), গৃহদাহ (১৩২৬/১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৩২৭), দেনা-পাওনা (১৩৩০/১৯২৩), নব-বিধান (১৩৩১/১৯২৪), পথের দাবী (১৩৩৩/১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৩৩৮/১৯৩১), বিপ্রদাস (১৩৪১/১৯৩৫), শুভদা (১৩৪৫/১৯৩৮), শেষের পরিচয় (১৩৪৬/১৯৩৯) ইত্যাদি।

এছাড়াও বেশ কিছু গল্প তিনি লিখেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' একটি বিখ্যাত এবং বহুল পঠিত গল্প। তাঁর রচিত গল্প/গল্পগ্রন্থগুলি হল—বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (১৩২১/১৯১৪), পরিণীতা (১৯১৪), মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (১৩২২/১৯১৫), বৈকুণ্ঠের উইল (১৩২৩/১৯১৬), অরক্ষণীয়া (১৩২৩/১৯১৬), নিষ্কৃতি (১৯১৭), কাশীনাথ (১৩২৪/১৯১৭), স্বামী (১৩২৪/১৯১৮), ছবি (১৩২৬), হরিলক্ষ্মী (১৩৩২/১৯২৬), অনুরাধা-সতী ও পরেশ (১৩৪০/১৯৩৪), ছেলেবেলার গল্প (১৩৪৫/১৯৩৮) ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ সম্ভবত এই যে তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাকে সহানুভূতির রসে সিক্ত করে কাহিনিকে স্নিগ্ধমধুর করে তুলতে পারতেন। পাঠক ভাবত এই কাহিনি যেন তার জন্যেই লেখা। এই গল্প যেন তার জীবনেরই কাহিনি। তাই আজও তাঁর গল্প-উপন্যাসের চাহিদা বর্তমান। 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস' উপন্যাস এবং 'মহেশ'-এর মতো গল্প একালের পাঠকও সমান আগ্রহে পাঠ করেন। শরৎচন্দ্র সমাজের যেখানে অবিচার সেখানে আলো ফেলেছেন এবং তা সহানুভূতির সঙ্গেই তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেই সমাজঘটিত জটিলতা বা ত্রুটির তিনি কোনো সমাধান দিতে পারেননি বলে সমালোচকেরা অভিযোগ করেন। কিন্তু এর বিপরীতে বলা যায় সাহিত্যিকের কাজ সমাজের কথা তুলে ধরা তার সমাধান করা নয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) : বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসগুলো হল—চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), পাষাণপুরী (১৯৩৭), নীলকণ্ঠ (১৯৩৩), রাইকমল (১৯৩৪), প্রেম ও প্রয়োজন (১৯৩৫), আগুন (১৯৩৭), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০), গণদেবতা (১৯৪২), মন্বন্তর (১৯৪৪), কবি (১৯৪৪), সন্দীপন পাঠশালা (১৯৪৬), ঝড় ও ঝরাপাতা (১৯৪৬), অভিযান (১৯৪৬), সপ্তপদী (১৯৪৯), পদচিহ্ন (১৯৫০), উত্তরায়ণ (১৯৫০)। এরপরেও তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লেখেন। যেমন—হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, আরোগ্য নিকেতন, রাধা, কীর্তিহাটের কড়চা ইত্যাদি।

তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চোখে দেখা জীবনকে নিজের জীবনদর্শন দিয়ে সরলভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। উপন্যাসের নানান কলা-কৌশল প্রয়োগ বা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মনোনিবেশ করেননি। জন্মস্থান বীরভূমের লাভপুর গ্রাম ও তার সংলগ্ন অঞ্চল তাঁর গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ যে গ্রামীণ পরিবেশ তাঁর বেড়ে ওঠা সেই মানুষজন ও প্রকৃতিকেই তিনি তাঁর সাহিত্য রচনার আধার করেছেন। নিজে ছিলেন ক্রমশ অবলুপ্তির পথে যাওয়া জমিদার বংশের সন্তান। সেই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান একদিকে পিসিমার শৈলজা দেবীর সম্পত্তি বাপের নয় দাপের এই মানসিকতা এবং পাটনায় মানুষ হওয়া মা প্রভাবতী দেবীর শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে বড়ো হয়ে ওঠেন। লাভপুরের নাটক, স্বাধীনতার আন্দোলন ইত্যাদি তাঁর মন-মানসিকতাকে ঋদ্ধ করে। নিজে কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন এবং সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবাসও করতে করেছেন।

পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে নিজেকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন। ফুটপাথে ঘর ভাড়া করে রাস্তার কল থেকে জল ধরে চান-খাওয়াও করেছেন। এ সবই তাঁর জীবনদর্শনকে গড়ে তুলেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছোটোগল্পগ্রন্থগুলো হল— ছলনাময়ী (১৯৩৭), জলসাঘর (১৯৩৮), রসকলি (১৯৩৯), বেদেনী (১৯৪৩), হারানো সুর (১৯৪৫), গোবিন সিংয়ের ঘোড়া (১৯৬৮) ইত্যাদি। 'জলসাঘর', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', 'ইমারত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প। ছোটোগল্পেও তারাশঙ্কর অতীতের প্রতি তাঁর টানের কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন নতুনকে আধুনিকতাকে স্বাগত জানাতে হবে। ''জলসাঘর' গল্পে বিশ্বম্ভর রায়ের জমিদারি না থাকলেও জমিদারিসুলভ মেজাজ ও মানসিকতাকে ত্যাগ না করতে পারা তিনি দেখিয়েছেন। 'ডাইনী' গল্পে একসময় প্রচলিত ডাইনী প্রথার কথা বাস্তবসম্মত করে তুলে ধরেছেন স্বর্ণ ডাইনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই গল্পটি পড়ে অনেকে বলেছিলেন বিদেশি গল্পের অনুকরণে লেখা। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্পটির প্রশংসা করেন। 'অগ্রদানী' গল্পে তৎকালীন সমাজের এক নির্মম বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিস্তৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকে বাস্তব করে তুলতেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) : একটিমাত্র উপন্যাস ('অশনি সংকেত') ব্যতীত বিভূতিভূষণের সমস্ত উপন্যাসই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরেই রচিত। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হল— পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১ম ও ২য় খণ্ড- ১৯৩২), দৃষ্টিপ্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৯), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), বিপিনের সংসার (১৯৪১), দুইবাড়ী (১৯৪১), অনুবর্তন (১৯৪২), দেবযান (১৯৪৪), কেদাররাজা (১৯৪৫), অথৈজল (১৯৪৭), ইছামতী (১৯৫০)।

গল্পগ্রন্থ— মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৭), কিন্নরদল (১৯৩৮), বেণীগীর ফুলবাড়ি (১৯৪১), নবাগত (১৯৪৪), তালনবমী (১৯৪৪), উপলখণ্ড (১৯৪৫), বিধু মাস্টার (১৯৪৫), ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫), অসাধারণ (১৯৪৬), মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭), নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব (১৯৪৮), জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৯), কুশল পাহাড়ী (১৯৫০) ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতিপ্রেমিক লেখক হিসেবেই পাঠকের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর 'পথের পাঁচালী' সাহিত্যের পাতা থেকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে বাঙালিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। অপু-দুর্গা দুই ভাই-বোনের কাহিনি আজও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও পাঠককে সমানভাবে আকৃষ্ট করে। 'আরণ্যক' প্রকৃত অর্থেই প্রকৃতির কথা বলে। সেইসঙ্গে ভানুমতী-দোবরু পান্না বীরবর্দী আক্ষ্ম মাদের মনে চিরস্থায়ী আসন করে রেখেছে। শিক্ষিত যুবক সত্যচরণের চোখ দিয়ে অরণ্যকে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'ইছামতী' উপন্যাসে নীলচাষের অভিশপ্ত ইতিহাসকে বিভূতিভূষণ সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লিপিবদ্ধ করেছেন।

গল্পের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণ আসলে মানুষের কথাই বলতে চেয়েছেন। তিনি প্রায় ২২৪টি গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—'তাঁর গল্পে কেবল মানুষ ও প্রকৃতি আছে,—একথা

যথার্থ নয়। প্রবৃত্তি ও নিয়তি, মানবজীবনে অন্ধ ঝড় ও অমোঘ কার্যকরণের লীলা তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি অলৌকিক ও অধ্যাত্মবিশ্বাসের ক্রিয়াও দেখেছেন। তিনি মানব জীবনের রূপকার'।—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা, পৃ. ২২১। এই মূল্যায়ন বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসগুলো হল— জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৬), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), জীবনের জটিলতা (১৯৩৬), অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮), সহরতলী (১ম খণ্ড- ১৯৪০), সহরতলী (২য় খণ্ড- ১৯৪১), অহিংসা (১৯৪১), ধরাবাঁধা জীবন (১৯৪১), প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), দর্পণ (১৯৪৫), সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), চিন্তামণি (১৯৪৬), চিহ্ন (১৯৪৭), আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), জীয়ন্ত (১৯৫০)।

গল্পগ্রন্থ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮) সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদ পোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), পরিস্থিতি (১৯৪৬), খতিয়ান (১৯৪৭), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছোট বড় (১৯৪৮), ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)।

বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক। তিনজনেই বাংলা সাহিত্যের তিনটি ধারায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে অবদান রেখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে চরম বাস্তবকে তুলে ধরলেন নির্মভাবে। তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত ছিলেন। 'অতসী মামী' গল্প লিখে সাহিত্যের জগতে পা রাখেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে শশী ডাক্তারের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন এক শিক্ষিত যুবকের গ্রামের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, কিন্তু জীবনের দাবিতে সেই শশী ডাক্তার একসময় গ্রামকে ভালোবেসে গ্রামের উন্নয়নযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেইসঙ্গো দেখিয়েছেন গ্রামীণ জীবনের নানারকম জটিলতা। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কুবের-হোসেন মিঞা-কপিলার মধ্য দিয়ে জেলে জীবনের সংগ্রামের কথা বলেছেন। তাঁর রচনায় মানুষের অন্তর্লোককে শল্য চিকিৎসকের মতো কাটাছেঁড়া করে দেখানো হয়েছে এবং সেখানে যা পাওয়া যায় তা আমাদের চমৎকৃত করে। 'সরীসৃপ' গল্পে দেখানো হয়েছে মানুষের মনের গতিবিধি জীবজগতের সরীসৃপের মতোই। 'কুষ্ঠ রোগীর বউ' গল্পে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত স্বামীর স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ আমাদের মানবিকতার উপর আঘাত হানে, কিন্তু তা নির্মম বাস্তব। মানিকের গল্প-উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের ভণ্ডামি, পাশবতা, যৌনতা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) : বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৫০-এর মধ্যে লেখা উপন্যাসগুলো হল— তৃণখণ্ড (১৯৩৫), বৈতরণীতীরে (১৯৩৬), দ্বৈরথ (১৯৩৭), কিছুক্ষণ (১৯৩৭), মন্ত্রমুগ্ধ (১৯৩৮), মৃগয়া (১৯৪০), নির্মোক (১৯৪০), রাত্রি (১৯৪১), সে ও আমি (১৯৪৩), জঙ্গম (১৯৪৩-১৯৪৫), অগ্নি (১৯৪৬), নঞতৎপুরুষ (১৯৪৬), সপ্তর্ষি (১৯৪৭), স্বপ্নসম্ভব (১৯৪৭), মানদণ্ড (১৯৪৮), ডানা (১৯৪৮-১৯৫৫), নবদিগন্ত (১৯৪৯)। এরপরে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'স্থাবর', 'ভুবন সোম', 'হাটে-বাজারে' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর অধিকাংশই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত। 'বাহুল্য' (১৯৪৩), 'বিন্দুবিসর্গ' (১৯৪৪), 'অদৃশ্যলোক' (১৯৪৬) ইত্যাদি তাঁর ছোটোগল্পগ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যের ডাক্তার সাহিত্যিক বনফুল। তিনি গল্প-উপন্যাসে বিচিত্র ধরনের কাহিনিকে এনেছেন। 'ডানা' উপন্যাসে পাখি নিয়ে যে এরকম উপন্যাস লেখা যায় তা সম্ভবত আগে কেউ ভাবেননি। প্রচুর উপন্যাস লিখেছেন। প্রায় ৬১টি। কিন্তু প্রতিটির বিষয়ই স্বতন্ত্র। আবার 'নিমগাছ', 'ছোটোলোক' ইত্যাদি পোস্টকার্ড আকারে যে গল্প লেখা যায় তা বাংলা সাহিত্যে বনফুলই দেখিয়েছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) : আমাদের আলোচ্য সময়কালে সতীনাথ ভাদুড়ীর মাত্র দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়— জাগরী (১৯৪৫), ঢোঁড়াই চরিত মানস (১৯৪৯, ১৯৫১)। পরে 'অচিন রাগিণী', 'সংকট', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। লিখেছেন খুবই কম। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নিজের চিরিকালীন আসনটি পাকা করে নিয়েছেন। রামচরিত মানসের আদর্শে লিখেছিলেন 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। ঢোঁড়াই এই উপন্যাসের নায়ক। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের এক বিচিত্র সামগ্রিক ছবি এই উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লিখেছেন 'জাগরী'। বিলু, নীলু ও তাদের বাবা-মা-কে নিয়ে এই উপন্যাস। প্রত্যেকে পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী।

১৩.৫ সহায়ক গ্রন্থ :

১. অলোক রায়, বিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৬।

২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*কালের পুত্তলিকা*', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*কালের প্রতিমা*', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৪. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*', ২০০৫-২০০৬।

১৩.৬ প্রশ্নাবলি :

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. বিশ শতক বলতে কী বোঝায়?

২. বিশ শতকে ঘটে যাওয়া চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করো।

৩. বিশ শতকের প্রথমার্ধের পাঁচজন ঔপন্যাসিকের নাম জন্ম-মৃত্যু সহ উল্লেখ করো।

৪. বিশ শতকের প্রথমার্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পাঁচটি উপন্যাসের নাম লেখো প্রকাশকালসহ।

৫. বিশ শতকের প্রথমার্ধের পাঁচজন প্রাবন্ধিকের একটি করে প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম লেখো।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ছোটোগল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৭. বিশ শতকের প্রথমার্ধের পাঁচজন প্রাবন্ধিকের নাম লেখো জীবৎকালসহ।

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়ে লেখো।

২. প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৩. তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৪. প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৫. কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৬. বিশ শতকের দুজন প্রাবন্ধিক সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৭. বিশ শতকের প্রথমার্ধের দুজন ছোটোগল্পকার সম্বন্ধে আলোচনা করো।

একক-১৪ ❑ বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা কবিতার ধারা

এককটির গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ বিশ শতকের প্রথমার্ধ : বাংলা কবিতার ধারা

১৪.৪ সহায়ক গ্রন্থ

১৪.৫ প্রশ্নাবলি

১৪.১ উদ্দেশ্য :

বর্তমান অধ্যায়ে বিশ শতক কাকে বলে তা জানার সমান্তরালে বিশ শতককে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করা হবে। বিশ শতকের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যকে সম্যকভাবে অনুধাবন করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিশ শতকের প্রথমার্ধ। সুতরাং বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপকে জানা এবং তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাই এই এককটি রচনার মূল লক্ষ্য।

১৪.২ প্রস্তাবনা :

বিশ শতক বলতে বোঝায় ১৯০১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। বিশ শতকের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা অতিক্রম করেছেন উনিশ শতক বা ঊনবিংশ শতক অর্থাৎ ১৮০১ খ্রি. থেকে ১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত। বর্তমানে আমরা আছি একবিংশ শতকে; যার সূচনা হয়েছে ২০০১ খ্রি. থেকে এবং সমাপ্তি হবে ২১০০ খ্রি. গিয়ে। আমাদের আলোচ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ওই সময়ে রচিত বাংলা কবিতা বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

১৪.৩ বিশ শতকের প্রথমার্ধ : বাংলা কবিতার ধারা :

এই অংশে বিশ শতকে বাংলা কবিতার গত-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন কবির বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম প্রকাশকালসহ উল্লেখ করা হবে এবং সেই সঙ্গো কবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামগ্রিক কাব্য-কবিতাকে সূচনা পর্ব, উন্মেষ পর্ব, ঐশ্বর্য পর্ব, অন্তর্বর্তী পর্ব, গীতাঞ্জলি পর্ব, বলাকা পর্ব, অন্ত্য পর্ব ইত্যাদি পর্বে ভাগ করা হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রকাব্য অন্তর্বর্তী পর্বে প্রবেশ করে। অন্তর্বর্তী পর্বে রচিত কাব্যগ্রন্থ— কথা (১৯০০), কাহিনী (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), স্মরণ (১৯০৩), শিশু (১৯০৬), উৎসর্গ (১৯১৪), খেয়া (১৯১০)।

গীতাঞ্জলি পর্বে রচিত কাব্যগ্রন্থ— গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৫)। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজিতে অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান।

বলাকা পর্বের কাব্যগ্রন্থ হল— বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯)। অন্ত্য পর্বে রচিত কাব্যগ্রন্থ— পুনশ্চ (১৯৩২), বিচিত্রিতা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়া ও ছবি (১৯৩৭), প্রহাসিনী (১৯৩৯), প্রান্তিক (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), ছড়া (১৯৪৩), শেষলেখা (১৯৪১)।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় নিসর্গের প্রতি প্রেম, সৌন্দর্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আবার অন্যদিকে আমরা তাঁর কবিতায় পেয়েছি জীবনদেবতা তত্ত্বের কথা। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে আমরা পেলাম আধ্যাত্মিক ভাবনা। 'বলাকা' পর্বে দেখা যায় বুদ্ধির বিস্ময়কর দীপ্তি এবং জীবনের প্রতি তাঁর জাগ্রত বিবেকবোধ। এই পর্ব থেকেই তাঁর কবিতায় সমকালীন বিশ্বের প্রতি সজাগ মানসিকতার প্রমাণ মেলে। সম্ভবত এই পর্বের ঠিক আগেই তিনি পশ্চিমদেশ ভ্রমণ করে এসেছিলেন। তারই প্রভাব সম্ভবত এই পর্বের কবিতায় দেখা যায়। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যের যথার্থ বিকাশ হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। শেষ পর্বের কবিতায় পারিপার্শিক বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিল। ত্রিশের দশকের তথাকথিত 'আধুনিক' কবিরা রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্মবাদ এবং সর্বত্র সৌন্দর্য প্রদর্শিত হয় বলে। 'বলাকা' পর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদ থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। যদিও ঔপনিষদিক ভাবনা এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে তিনি সম্পূর্ণ কখনোই সরে আসেননি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) : বেণু ও বীণা (১৯০৬), তীর্থসলিল (১৯০৮, অনুবাদ কবিতা), তীর্থরেণু (১৯১০, অনুবাদ কবিতা), কুহু ও কেকা (১৯১২), অভ্র ও আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৭, ব্যঙ্গ কবিতা) —এগুলো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁকে ছন্দের যাদুকর বলা হয়। সংস্কৃত ছন্দ, ইংরেজি ছন্দ, বিদেশি বিভিন্ন ছন্দকে তিনি বাংলা কাব্যের উপযোগী করে ব্যবহার করেছেন।

তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মূল্যায়ন করেছেন—'ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস তাঁর কাব্যজগতের একটা বড়ো উপাদান। প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কাব্যরঙ্গভূমির প্রধান পাত্রপাত্রী। তবু বিশুদ্ধ কল্পনার উদ্দাম আবেগের মুখে তিনি নিজেকে ছেড়ে দেননি'।—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., ২০০৬, পৃ. ৫২১।

তবে ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি সফল হলেও কোনো গভীর ভাব হৃদয়ের অনুভূতিসহ অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়নি। কাব্যের অন্যতম উপাদান ব্যঞ্জনা তাঁর কবিতায় ছিল অনুপস্থিত।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) : বিশ শতকের প্রথম অর্ধে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা কাব্যগ্রন্থ— মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০), সায়ম (১৯৪০), ত্রিযামা (১৯৪৮)। তাঁকে দুঃখবাদী কবি বলা হয়ে থাকে। রোমান্টিকতাকে প্রতিহার করে তিনি বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক দুঃখদীর্ণ অবস্থার কথা কবিতায় বলতে চেয়েছেন বারবার। এই দুঃখবাদ থেকে তিনি কোনো দার্শনিকতার ভাবালুতায় স্বপ্ন বোনেননি। তাঁর এই দুঃখবাদ মানবতাভিত্তিক। তাই তিনি সে সময়কার রোমান্টিক কবিদের উপর তির্যক মন্তব্য করতেন। তবে অনেকেই মনে করেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম এই তিনজনে মিলেই বাংলা কাব্যে আধুনিকতা নিয়ে আসেন।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) : স্বপনপসারী (১৯২২), বিস্মরণী (১৯২৭), স্মরগরল (১৯৩৬), হেমন্তগোধূলী (১৯৪১), ছন্দ চতুর্দশী (১৯৪১) মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের একজন বলিষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যে দেহবাদের প্রকাশ পেয়েছে। ফলে অনেকে মোহিতলালের কাব্যকে গ্রহণ করতে পারেন না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার পাশাপাশি নিজের অস্তত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন মোহিতলাল। ক্লাসিক ও রোমান্টিকতার সমন্বয় দেখা গিয়েছিল তাঁর কবিতায়। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীতের সন্ধানও করেছেন। আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার তাঁর কবিতায় দেখা যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৮-১৯৭৬) : বিদ্রোহী কবি হিসেবে তিনি আপামর বাঙালির কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বিদ্রোহব্যঞ্জক কবিতা লিখে তিনি এই স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। ব্রিটশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ সর্বদা জাগরুক ছিল। এই কারণে ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ করে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ— অগ্নিবীণা (১৯২২), ভাঙার গান (১৩৩১), বিষের বাঁশী (১৩৩১)। নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবির স্বীকৃতি লাভ করেছেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব আনে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) : ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫১) ইত্যাদি জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের কবি। আধুনিক যুগের মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরাবাস্তবতা, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে দেখা গিয়েছিল। তাঁর সময়কালে তিনি উপযুক্ত কবি-স্বীকৃতি পাননি। বরং মৃত্যুর পর তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি একজন কালসচেতন এবং ইতিহাস সচেতন কবি ছিলেন। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর প্রমাণিত হয় তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবেও যথেষ্ট সফল ছিলেন। 'মাল্যবান'-এর মতো উপন্যাস তিনিই লিখেছিলেন। এই বাংলার তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন। প্রকৃত অর্থেই বাংলা কবিতায় আধুনিকতা এসেছিল কবি জীবনানন্দ দাশের হাত ধরে। তিনি গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানকে অনায়াসে ব্যবহার করে কাব্যিক মর্যাদা দিয়েছেন। কবি ঈশ্বরগুপ্তও এরকম দেশজ শব্দ বাংলা কবিতায় এনেছিলেন, কিন্তু তাকে তিনি উচ্চভাব বা দর্শনে জারিত করতে পারেননি। আধুনিক যুগের মানুষের জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা, সবার মাঝে থেকেও একা হওয়ার বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষের মন ও মানসিকতার যে বৈশিষ্ট্য তা বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যায়। তাই 'বোধ' কবিতা লেখেন

তিনি। আবার বাংলার প্রকৃতির প্রতি তাঁর টান প্রকাশিত হয় 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' পঙ্‌ক্তিতে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) : বাংলা সাহিত্যের সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিভাশালী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তরফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫০) ইত্যাদি। তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। ক্লাসিকের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ তাঁর ছিল। তাই সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়। খুবই কম লিখতেন। এমনকি একটি উপযুক্ত শব্দের প্রয়োজনে তিনি দিনের পর দিন ব্যয় করতেন। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু শব্দ তিনি প্রচলিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন— 'তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি'।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় মালার্মে, ভালেরি ইত্যাদি বিদেশি কবির প্রভাব দেখা যায়। সমালোচক তাঁর কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন— 'তাঁর জীবনদর্শন রূঢ় বাস্তব থেকে তিনি কোনোদিন পলায়ন করেননি, যুগের ট্র্যাজেডির ঘোর ঘনঘটায় ব্যক্তি-মানুষের মর্মান্তিক বেদনা তাঁর প্রকরণের সাহায্যে ফুটে উঠেছে! তাকে অকারণ আশ্বাসে মধুর বা সহনীয় করবার চেষ্টা তিনি করেননি। যে-সৎসাহসে তিনি জীবনের এই নিষ্ঠুরতম সত্যকে উপলব্ধি তথা উদ্ঘাটিত করেছেন সে-অকপটতা বাংলা সাহিত্যে অভিনব। তাঁর শেষ কথা রূঢ় হলেও একান্ত সত্য : 'অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই;/ অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;/ বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। (দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ২১৬।)

বুধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) : বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-কবিতার বিরোধিতা করে বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনার পূজারীদের মধ্যে অন্যতম একজন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মবাণী'(১৯২৫)। বলা যায় 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর কবিতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা বলতে যা বোঝায় তা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ— পৃথিবীর প্রতি (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮) এগুলো বিশ শতকের প্রথম অর্ধে প্রকাশিত হয়। প্রেম, রোমান্স, সৌন্দর্য ইত্যাদি তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজে বাংলা কবিতায় আধুনিকতা আনতে চাইলেও প্রকৃত অর্থেই আধুনিক হয়ে উঠতে পারেননি। 'শব্দকল্পের বৈচিত্র্য ও বুদ্ধির তির্যকতা— আধুনিক কাব্যের যা প্রাণস্বরূপ, তা তাঁর রচনায় বড় একটা পাওয়া যায় না'। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃ. ৫৮৩)

বুদ্ধদেবের একটি প্রেমের কবিতার দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যায় প্রেমের ক্ষণিক রূপ স্বীকার করতে গিয়ে তিনি অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো অশান্ত বা অসন্তুষ্ট হননি। ''বন্দীর বন্দনা'' কাব্যগ্রন্থের 'কালস্রোত' কবিতাটি এখানে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল—

> 'হে আমার দগ্ধ দিন, স্নিগ্ধ রাত্রি, সুন্দর প্রভাত,
> আলস্যের লাস্য-ভরে লীলায়িত মধ্যাহ্ন মন্থর,
> ক্লান্তি-ঘেরা অপরাহ্ণ উদার, উদাস,
> বেদনার বীণাপাণি সন্ধ্যারাণী মোর—
> তোমরা সকলে মিলি আমার প্রাণের পাত্রে ঢালিয়াছো সুধা,
> ঢালিয়াছো তিক্ত হলাহল,
> কত কিছু দিয়েছো যে অনির্বাণ, অনির্বচনীয়'—

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়।

আধুনিক বাংলা কবিতার ধ্বজা যাঁরা সোচ্চারে বহন করতে চেয়েছিলেন বিষ্ণু দে তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার প্রকট উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতায় আধুনিকতা ও বিষ্ণু দে বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন— 'উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো সত্তর পর্যন্ত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের মূল ছবিটিতে দুই বিন্যাসের তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয় না। তার একটির প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। আর একটি ধারার প্রধান কবি বিষ্ণু দে। এটি আধুনিক কবিতার ধারা'। (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, পৃ. ১৭৯)

১৪.৪ সহায়ক গ্রন্থ :

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, '*আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।

২. অলোক রায়, '*বিশ শতক*', প্রমা প্রকাশনী, ২০১৬।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*কালের পুত্তলিকা*', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৪. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, '*কালের প্রতিমা*', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৫. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*', ২০০৫-২০০৬।

৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা কবিতার কালান্তর*', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

১৪.৫ প্রশ্নাবলি :

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. বিশ শতক বলতে কী বোঝায়?

২. বিশ শতকে ঘটে যাওয়া চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করো।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো প্রকাশকালসহ।

৪. বিশ শতকের প্রথমার্ধে লেখালেখি করেছেন এরকম পাঁচজন কবির নাম লেখো।

৫. রবীন্দ্র-পরবর্তী যেকোনো একজন কবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৬. রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী একজন কবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. কবি জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

একক-১৫ ❑ বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা

এককটির গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা

১৫.৪ সহায়ক গ্রন্থ

১৩.৫ প্রশ্নাবলি

১৫.১ উদ্দেশ্য :

বর্তমান অধ্যায়ে বিশ শতক কাকে বলে তা জানার সমান্তরালে বিশ শতককে আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করা হবে। বিশ শতকের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যকে সম্যকভাবে অনুধাবন করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিশ শতকের প্রথমার্ধ। সুতরাং বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপকে জানা এবং তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলাই এই এককটি রচনার মূল লক্ষ্য।

১৫.২ প্রস্তাবনা :

বিশ শতক বলতে বোঝায় ১৯০১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। বিশ শতকের আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা অতিক্রম করেছেন উনিশ শতক বা ঊনবিংশ শতক অর্থাৎ ১৮০১ খ্রি. থেকে ১৯০০ খ্রি. পর্যন্ত। বর্তমানে আমরা আছি একবিংশ শতকে; যার সূচনা হয়েছে ২০০১ খ্রি. থেকে এবং সমাপ্তি হবে ২১০০ খ্রি. গিয়ে। আমাদের আলোচ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ওই সময়ে রচিত বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বিষয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব।

১৫.৪ বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা :

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির এই ধারা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হবে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা শহরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন নাট্যমঞ্চের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে এবং এইসব মঞ্চের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে বাংলা নাট্যমঞ্চের গতি-প্রকৃতি জানার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে জানার জন্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার সম্বন্ধে এই অংশে আলোচনা করা হবে।

১৩.৬.১ বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাটক সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা : বাংলা নাটকের পথচলা শুরু হয় ইংরেজ শাসকদের নাটকের অভিনয় দেখে। যাদের হাতে টাকা ছিল সেই শহুরে বাবুরা নিজদের সংস্কৃতিমনস্ক প্রমাণ করার জন্য নাটকের অভিনয়ের দিকে অগ্রসর হয়। হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ নামের এক রুশ ব্যক্তি ১৭৯৫ সালে কলকাতার ২৫ নম্বর ডোমতলায় (বর্তমানে এজরা স্ট্রিট) 'বেঙ্গালি থিয়েটার' নামে নাট্যমঞ্চ তৈরি করেন। এই মঞ্চে ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' নামে তিনি অভিনয় করান। এই প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু হল এক বিদেশি ব্যক্তির হাত ধরে। কলকাতার জাতে উঠতে চাওয়া বাঙালিরা তখন নিজেরাই এই নাট্যচর্চায় নেমে পড়লেন। ইংরেজদের সমতুল্য হতে চাইলেন। কলকাতার বাবুরা নিজেদের শখ মেটাবার জন্য এভাবে একের পর এক সখের নাট্যশালা গড়ে তুললেন। যেহেতু বাবুর ইচ্ছাই শেষ কথা, সেহেতু বাবুর শখ শেষ হলেই নাট্যমঞ্চও বন্ধ হয়ে যেত। এইসময় সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ শিক্ষিত নাট্যপ্রেমী ব্যক্তিদের দিয়ে করিয়ে সখের বাংলা নাট্যশালাগুলো চলত। ফলত নিজেদের ভাষায় নিজেদের নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হল। প্রথম দিকে পৌরাণিক নাটকই বেশি রচিত হল এবং তারপরে জাতীয় ভাবধারা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকও লেখা শুরু হল। এভাবেই বাংলা নাটক অর্থাৎ নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চের হাত ধরাধরি করে পথ চলা শুরু হয়। সখের নাট্যশালার স্তর অতিক্রম করে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে সাধারণ রঙ্গালয় চালু হতে থাকে, যেখানে দর্শক টিকিট কেটে নাটক দেখতে পারবে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধেই টিকিট কেটে নাটক দেখার প্রচলন হয়ে গেল। এই ব্যবস্থায় নাট্যকারকে আর ধনী বাবুর মর্জিমতো চলতে হল না, তিনি নিজের মতো বা দর্শকের রুচি অনুযায়ী নাটক রচনা, অভিনেতা-অভিনেত্রী চয়ন, মঞ্চ সাজানো ইত্যাদি সবকিছুই করতে পারলেন। যার ফলে সাধারণ রঙ্গালয়ের দিন স্থায়ীভাবে বাংলা নাট্যজগতে শুরু হয়ে গেল। আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সাধারণ রঙ্গালয়েরই উজ্জ্বল বিস্তার দেখতে পাব।

১৫.৪.১ বাংলা নাট্যমঞ্চের ধারা : এখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য বাংলা নাট্যমঞ্চগুলো সম্বন্ধে তথ্য-পরিসংখ্যানসহ তাদের গুরুত্ব আলোচনা করা হল—

মিনার্ভা থিয়েটার : ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ৬ নম্বর বিডন স্ট্রিটে পূর্বতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জায়গাতেই এই মঞ্চ গড়ে ওঠে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায়। প্রথম থেকেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন বছর পর তিনি এই মঞ্চ ত্যাগ করেন। পুনরায় ক্লাসিক থিয়েটার ত্যাগ করে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় যোগ দেন এবং এসেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে ১৯০০ খ্রি. ২৩ জুন অভিনয় করান। যদিও এবারেও গিরিশচন্দ্র বেশিদিন থাকেননি, পুনরায় ক্লাসিক থিয়েটারে ফিরে যান। এই মঞ্চ থেকেই প্রথম দর্শকদের উপহার দেওয়া শুরু হয়। ১৯০৪ সালের ২৩ আগস্ট দর্শকদের 'অতুল গ্রন্থাবলী' উপহার দেওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীতে এই মঞ্চে অভিনীত কয়েকটি নাটক হল- ক্ষীরোদ প্রসাদ-এর 'রঘুবীর' (১৯০৩), মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', গিরিশচন্দ্র ঘোষের গীতিনাট্য 'হরগৌরী' (১৯০৫), 'বলিদান' (১৯০৫), 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশিম', 'শাস্তি কি শান্তি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন', 'সাজাহান', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বাঙলার মসনদ' ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের অভিনয় এই মঞ্চের গ্রহণযোগ্যতা নাট্যমোদী মানুষের কাছে অনেক উচ্চ স্তরে নিয়ে যায়। ১৯০৫ সালের ৮ এপ্রিল প্রথম রজনীর অভিনয়ে 'বলিদান'-এর টিকিট বিক্রি হয়েছিল ২৮৬টি। ষষ্ঠ রজনীতে তা হয় ৫৪৪টি। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, দানীবাবু, অপরেশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বরা অভিনয় করেন। আরও পরে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সরযূবালা, ছবি বিশ্বাস ইত্যাদি বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই মঞ্চে যুক্ত হন। শিশিরকুমার ভাদুড়ীও এই মঞ্চে যুক্ত হয়ে 'ষোড়শী', 'সীতা' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন।

১৯২২ সালের ১৮ অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়ে যায়। ১৯৪২ সালে এই মঞ্চ 'মিনার্ভা থিয়েটার লিমিটেড' নামক কোম্পানিতে পরিবর্তিত হয়। নরেশচন্দ্র গুপ্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান হন।

সব মিলিয়ে মিনার্ভার মালিকানা বহুবার হাতবদল হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে এগিয়ে চলেছে। বহু নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের অভিনয় জীবনের সেরা সময়টুকু এই মঞ্চেই অতিবাহিত করেছেন।

স্টার থিয়েটার : ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের মধ্য দিয়ে। ধনাঢ্য ব্যক্তি গুর্মুখ রায় নটী বিনোদিনীর অর্থ সাহায্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অভিভাবকত্বে ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে এই মঞ্চ তৈরি হয়। বিনোদিনীর নামে এই মঞ্চের নামকরণ হবার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। কারণ একজন বারাঙ্গানার নামে মঞ্চের নাম হলে দর্শক মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে। নাম হয় স্টার থিয়েটার। ১৮৮৮ সালে এই মঞ্চ ঠিকানা পরিবর্তন করে চলে যায় ৭৫-৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে।

বিংশ শতাব্দীতে এসে এই মঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণাপ্রতাপ', 'পরপারে' ইত্যাদির সফল অভিনয় দেখা যায়। অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' বেশ জনপ্রিয় হয়। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ'-এর অভিনয় শুরু হয় ১৯১৮-র ৩ আগস্ট। এর নাটকের প্রায় ১৩০০-১৪০০ টাকার টিকিট বিক্রি হোত সেই সময়।

১৯৩৭-৩৮ সালে এই মঞ্চের লেসি নিযুক্ত হন সলিলকুমার মিত্র। ১৯৩৮ সাল থেকে পরিচালনার দায়িত্ব নেন মহেন্দ্র গুপ্ত। এই সময় মহেন্দ্র গুপ্তর 'রায়গড়', 'স্বর্গ হতে বড়' অভিনীত হয়। তিনি তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ইত্যাদি নাটকের নাট্যরূপও দেন। ১৯৪৪ সালে তাঁর 'টিপু সুলতান' সুনাম অর্জন করে এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বার্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই নাটকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

কোহিনূর থিয়েটার : ১৯০৭ সালের ১১ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে এই মঞ্চের উদ্বোধন হয়। জমিদার শরৎকুমার রায় এক লক্ষ টাকায় এমারেল্ড থিয়েটার ও তারপরের ক্লাসিক থিয়েটারের বাড়িটি কিনে এই মঞ্চ চালু করেন।

'চাঁদবিবি' নাটক খবই জনপ্রিয় হয় এবং প্রথম রজনীর অভিনয়েই ২২৫০ টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। এরপরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি শিবাজী', 'মীরিকাশিম' অভিনীত হয়। জাতীয় ভাবোদ্দীপকের এই সময় মিনার্ভাতেও 'ছত্রপতি শিবাজী'র অভিনয় চলছিল। কিন্তু কোহিনূর মঞ্চের শিবাজী জনপ্রিয় হয়। এই নাটকে শিবাজী চরিত্রে দানীবাবু, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে গিরিশচন্দ্র, জিজাবাঈ চরিত্রে তিনিকড়ি, লক্ষ্মীবাঈ চরিত্রে তারাসুন্দরী অভিনয় করেন।

১৯০৮ সালে 'পাঞ্জাব গৌরব' নাটকটি অভিনয় হলে পাঞ্জাবীরা নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন। একজন বারাঙ্গনা অভিনেত্রীর শিখসমাজের মায়ের ভূমিকায় অভিনয় পাঞ্জাবীরা মেনে নেয়নি। অগত্যা মঞ্চকর্তৃপক্ষ নাটকের নাম বদলে রাখেন 'বীরপূজা'। এখানে মারাঠাদের কাহিনী হিসেবে নাটকটিকে দেখানো হয়।

কোহিনূর থিয়েটারের শেষ অভিনয় হয় ১৯১২ সালের ২১ জুলাই। 'বিশ্বামিত্র ও পলিন' নামে নাটক শেষদিনে অভিনীত হয়। মোট ৪০টি নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়।

আর্ট থিয়েটার : ১৯২৩ সালের ৩০ জুন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' নাটকের অভিনয় দিয়ে আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ যৌথভাবে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' তৈরি করেন। এই সংস্থার ডিরেক্টররা ছিলেন—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র। অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার এবং প্রবোধচন্দ্র গুহ সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সংস্থাই স্টার থিয়েটারের বাড়ি লিজে নিয়ে আর্ট থিয়েটার গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সালে আর্ট থিয়েটার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চেরও দায়িত্বভার গ্রহণ করে। যদিও নিজেদের মধ্যে বিরোধের কারণে ১৯২৮ সালে মনোমোহন মঞ্চের দায়িত্বভার ত্যাগ করে দিতে হয়। এই মঞ্চে অভিনীত নাটক—

১৯২৩—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী'। 'কর্ণার্জুন' নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং টানা প্রায় ২৬০ রাত্রি এর অভিনয় হয়েছিল।

১৯২৪—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ইরাণের রাণী' 'বন্দিনী', নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপকুমারী'।

১৯২৫—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'গোলকুণ্ডা', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা', রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', নরেশ সেনের 'ঋষির মেয়ে'। 'গোলকুণ্ডা' নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি, নির্মলেন্দু, নিভাননী, কোহিনূরবালা অভিনয় করেন। 'জনা'য় দানীবাবু ও সুশীলার অভিনয় প্রশংসা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিরকুমার সভা'য় অপরেশচন্দ্রের রসিক চরিত্রে অভিনয় দেখে তাঁকে 'রসিক বাবু' বলে সম্বোধন করেন।

১৯২৬—রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ', 'বিদায় অভিশাপ', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীকৃষ্ণ', 'চণ্ডীদাস', সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'লাখ টাকা', রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ', অমৃতলাল বসুর 'দ্বন্দ্বেমাতনম্'।

১৯২৭—রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', 'পরিত্রাণ', অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মগের মুলুক', মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর'। চাঁদ সদাগর চরিত্রে অহীন্দ্র চোধুরীর অভিনয় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল।

১৯২৮—অপরেশচন্দ্রের 'পুষ্পাদিত্য', 'ফুল্লরা', মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর', শরৎচন্দ্রের 'রমা'।

১৯২৯—অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'। নাট্যরূপ দেন অপরেশচন্দ্র।

১৯৩০—রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'। এই বছরেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী আর্ট থিয়েটার মঞ্চে যোগ দেন।

১৯৩১—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তি', 'শ্রীগৌরাঙ্গ', সৌরীন্দ্রমোহনের 'স্বয়ংবরা'।

১৯৩২—অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র', অপরেশচন্দ্রের 'বিদ্রোহিনী', রবীন্দ্র মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', নরেশ সেনগুপ্তর 'বড় বৌ'। 'পোষ্যপুত্র' নাটকের শ্যামাকান্ত চরিত্রে দানীবাবুর অভিনয় নাচঘর, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রশংসিত হয়।

১৯৩৩—জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'মন্দির প্রবেশ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৈকুণ্ঠের খাতা', যদুনাথ খাস্তগীরের 'অভিমানিনী'।

১৯৩৪ সালে দেনার দায়ে আর্ট থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। এই মঞ্চে বহু বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী তাঁদের সেরা অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো নাটক এই মঞ্চে অভিনীত হয়, যা এর আগে অন্য কোনো মঞ্চে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র গুহকে বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ে সহযোগিতা করেছেন। এই দুই অভিনেতার এ এক দুর্লভ প্রাপ্তি। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'চিরিকুমার সভার' মঞ্চাভিনয়ে সাহায্য করেন। সব মিলিয়ে আর্ট থিয়েটার বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে নিজের স্থান পাকা করে রেখেছে।

নাট্যনিকেতন : ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ এই মঞ্চ পথচলা শুরু করে প্রবোধচন্দ্র গুহর উদ্যোগে। এই বছরেই ৩ এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' মঞ্চস্থ হয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও নীহারবালা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। একসময় সতু সেন এই মঞ্চের প্রযোজক হন এবং তাঁর প্রযোজিত 'ঝড়ের রাত' বেশ প্রশংসিত হয়। ঝড়ের রাতের দৃশ্য আলোকসম্পাতের মাধ্যমে বাস্তব হয়ে ওঠে এবং মাত্র এক অঙ্কের নাটক প্রায় তিন ঘন্টা ধরে অভিনীত হয়। এই নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীহারবালা, সুশীলাসুন্দরী অভিনয় করেন।

শচীন্দ্র সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ', 'জননী', 'নরদেবতা', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো', সুধীর রাহার 'আগস্ট বিপ্লব', অনুরূপা দেবীর 'মা', যোগেশ চৌধুরীর 'পূর্ণিমা মিলন', 'পরিণীতা', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় হয় এই মঞ্চে।

১৯৩৬ সালে নাট্যনিকেতন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্যালকাটা থিয়েটার লিমিটেড। এইসময় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' অভিনীত হয়।

দীর্ঘ প্রায় এগারো বছর এই নাট্যমঞ্চে অভিনয় হয়। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই মঞ্চের প্রভাব বিস্তারকারী নাটক হল 'ঝড়ের রাত'। শেষপর্যন্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই মঞ্চ কিনে নাম দেন শ্রীরঙ্গম।

রঙমহল : ১৯৩১ সালের ১ মে ৬৫/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে (বর্তমানে বিধান সরণী) নাট্যব্যক্তিত্ব অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এই মঞ্চের উদ্বোধন হয়। রবীন্দ্রমোহন রায় এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে একটি লিমিটেড কোম্পানি তৈরি করেন। ষষ্ঠীকুমার গাঙ্গুলী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এস আহমেদ, হরচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র দে প্রমুখ ব্যক্তি এই কোম্পানিতে যুক্ত ছিলেন। এই কোম্পানির পক্ষ থেকেই রঙমহলের বাড়িটি ক্রয় করে রঙমহল নাট্যমঞ্চ খোলা হয়।

১৯৩১ সালের ৮ আগস্ট যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর লেখা নাটক 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' এই মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। নাট্যপরিচালক ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন সতু সেন। শিশিরকুমার এবং সতু সেন তাঁদের নাটকের দল নিয়ে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে রঙমহলেই প্রথম যোগ দেন। নিমাই চরিত্রে শিশিরকুমার এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে প্রভাদেবী অভিনয় করেন। শচীমাতা হন কঙ্কাদেবী। সতু সেন এই নাটকেই প্রথম শিল্পনির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করেন।

১৯৩২ সালের ১৭ জানুয়ারি সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিজয়িনী', ২৫ মার্চ নলিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'রঙের খেলা', ২ এপ্রিল বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'বনের পাখী', ২৫ জুন উৎপলেন্দু সেনের 'সিন্ধুগৌরব' ইত্যাদি নাটক অভিনীত হয়। 'সিন্ধুগৌরব' নাটকে সতু সেন পুরো মঞ্চটিকেই ব্যবহার করে সিন্ধুনদের উপকূলে বিশাল নৌকা দেখিয়েছিলেন। আলোকসম্পাতেও সতু সেন অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। এই নাটকে অভিনয় করেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য, উৎপল সেন, সরযূবালা প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

প্রায় দু' মাস ধর্মঘটের কারণে অভিনয় বন্ধ থাকার পর মঞ্চ পরিচালনার হাতবদল হয়। শিশির মল্লিক এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শিশিরকুমার ও তাঁর দল রঙমহল ত্যাগ করে চলে যান এবং মঞ্চের অনেক ক্ষতি হয় এইসময়।

১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারিতে অভিনীত হয় নলিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাসী'। এরপর শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্রর যৌথ উদ্যোগে নতুন করে মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। সতু সেন ছিলেন দায়িত্বে। এই প্রথম শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতেই প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নির্মিত হল। এই নতুন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হল অনুরূপা দেবীর 'মহানিশা' নাটক ১৯৩৩ সালের ১৫ এপ্রিল। নাট্যরূপ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর। রবি রায়, যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, শান্তি গুপ্তা, চারুবালা, রেণুবালা প্রমুখ অভিনয় করেন এই নাটকে। 'মহানিশা' বেশ জনপ্রিয় হয়।

মন্মথ রায়ের 'অশোক', ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের উপন্যাস 'স্পর্শের অভাব' অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর দেওয়া নাট্যরূপ 'পতিব্রতা', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কাহিনি 'পথের শেষে'র নাট্যরূপ 'বাংলার মেয়ে', অনুরূপা দেবীর 'পথের সাথী', শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'চরিত্রহীন'-এর নাট্যরূপ দেন যোগেশ চোধুরী ইত্যাদি নাটকের মঞ্চসফল অভিনয় হয় ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে।

যামিনী মল্লিক ও রঘুনাথ মল্লিক এই মঞ্চের দায়িত্ব নেওয়ার পর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাট্য পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যও রঙমহলে যোগ দেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর পরিচালনায় অভিনীত হয় 'বন্ধু'।

জহর গাঙ্গুলি, তুলসী চক্রবর্তী, উষা দেবী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন। কাজী নজরুল ইসলাম এই নাটকের জন্য কয়েকটি গান লিখে দেন এবং সঙ্গীত পরিচালনাও করেন।

'মালা রায়' নাটকে শম্ভু মিত্র এখানে প্রথম অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র নাট্যরূপ এই মঞ্চে অভিনীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন নাটকের অভিনয় বন্ধ থাকে। ১৯৪৪ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় মঞ্চ চালু হয় অয়স্কান্ত বক্সীর 'অয়স্কান্ত' নাটকের অভিনয় দিয়ে। তারাশঙ্করের লেখা নাটক 'বিংশ শতাব্দী' অভিনীত হয় ১৯৪৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'অনুপমার প্রেম', 'দেবদাস', বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'সন্তান', 'রজনী', রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা', তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' ইত্যাদি নাটক ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অভিনীত হয়। তারপরেও নানান উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রঙমহল চলতে থাকে। ২০০১ সালের ২৮ আগস্ট আগুনে ভস্মীভূত হয়ে এই মঞ্চ পথচলা শেষ করে।

নাট্যভারতী : ১৯৩৯ সালের ৫ আগস্ট শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই নাট্যমঞ্চ পথচলা শুরু করে। রঘুনাথ মল্লিক দীপক সিনেমার বাড়িতে এই নাট্যমঞ্চ খোলেন। ১৯৪২ সালে রঘুনাথ মল্লিক থেকে নাট্যমঞ্চের কর্তৃত্ব মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

শচীন্দ্রনাথের 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'স্বামী-স্ত্রী', 'নার্সিংহোম', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'সিঁথির সিন্দুর', 'পি ডব্লিউ ডি', অয়স্কান্ত বক্সীর 'রিহার্সেল', মনোজ বসুর 'প্লাবন', মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ', 'পথের ডাক', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' ইত্যাদি নাটক এখানে অভিনীত হয়।

বিভিন্ন সময়ে অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, যোগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, রাণীবালা, রাজলক্ষ্মী, সরযূবালা, ছায়াদেবী, প্রভা ইত্যাদি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই মঞ্চে যুক্ত হন। প্রায় পাঁচ বছর চলার পর ১৯৪৪ সালে নাট্যভারতী মঞ্চ বন্ধ হয়ে যায়।

এ ছাড়াও আরও কয়েকটি মঞ্চ এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিত্র থিয়েটার (১৯২৬), পূর্ণ থিয়েটার (১৯২৮), কালিকা থিয়েটার (১৯৪৪) ইত্যাদি কয়েকটি নাট্যমঞ্চও বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আমাদের এই আলোচনায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে বাংলা নাট্যমঞ্চের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। এই সময়ে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টি যেমন নাট্যরূপ পেয়েছে, তেমনই বিভিন্ন নাট্যকার তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলো এই সময়েই লিখেছিলেন। সতু সেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শম্ভু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বহু বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্বকে এই সময়ই আমরা পেয়েছি।

১৫.৪.২ নাট্যসাহিত্যের ধারা : নাটক মূলত মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই রচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাটক একটি প্রয়োগমূলক শিল্পকলা। কিন্তু লিখিত নাটক যখন পাঠ করা হয় তার একটা সাহিত্যমূল্যও থাকে। সব

নাটক আমরা মঞ্চস্থ হতে দেখি না। তখন ওই সব নাটকের রসানুভূতি আমাদের পাঠের মাধ্যমেই গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং লিখিত নাটক যখন পাঠ করা হয় তখন তা সাহিত্য-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমরা বিশ শতকের প্রথমার্ধের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব—

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১) : গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাটককে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিকে নিজে মঞ্চে অভিনয় করেছেন, নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে মঞ্চে অনুসন্ধান করে এনেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন, অন্যদিকে মঞ্চের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য প্রচুর নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকই একালের দর্শকদের রুচিসম্মত হবে না, কিন্তু সেকালে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষা করার মতো।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা নাটকের অভিনয় শেষ করে তিনি দেখলেন নতুন নাটক আর নেই। নিজেই নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর হাতে পৌরাণিক নাটকই অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। ইংরেজ আমলে নাটক লেখার কারণে রাজরোষ থেকে বাঁচতে পৌরাণিক কাহিনিকে অবলম্বন করে নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই বাংলা নাটক পেশাদারিত্ব অর্জন করে। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাটক শখের নাট্যশালা থেকে গুটি কেটে বের হয়ে পেশাদারি মঞ্চের দিকে ক্রমাগত অগ্রসত হতে থাকে।

বিশ শতকে গিরিশচন্দ্রের লেখা ঐতিহাসিক নাটকগুলো হল— সিরাজদ্দৌলা (১৯০৬), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), অশোক (১৩৯১), সৎনাম (১৯০৪)। নাটকের নামগুলো দেখেই অনুমান করা যায় এগুলো স্বদেশপ্রেমের নাটক। ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটক লিখলেও গিরিশচন্দ্র সর্বত্র বিশ্বস্তভাবে ইতিহাসকে অনুসরণ করেননি। 'সৎনাম' নাটকে সম্রাট ঔরঙ্গাজেবের বিরুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের আন্দোলনের কথা আছে এই নাটকে। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র পরপর সাতটি চরিত্রের মৃত্যু দেখিয়ে এর ট্র্যাজিক রসকে নষ্ট করেছেন। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের সিংহাসনে আরোহণ থেকে শুরু করে মিরজাফরের সিংহাসন প্রাপ্তির ঘটনা পর্যন্ত কাহিনি সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিশ শতকে তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক নাটক হল— প্রফুল্ল(১৯০৫)। এটি একটি ট্র্যাজেডি নাটক। যোগেশের সুখের সংসার অর্থাৎ সাজানো বাগান কীভাবে শুকিয়ে গেল তাই এই নাটকের বিষয়। প্রফুল্ল এই নাটকে পরিবারের ছোটো বউ। যোগেশের সরলতার সুযোগেই তার জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সেকারণে অনেকে সার্থক করুণ রসাত্মক নাটক হিসেবে এটিকে মেনে নিতে পারেন না। 'বলিদান' (১৯০৫) নাটকে কন্যার বিবাহ দেওয়ার অর্থ যে কন্যাকে আসলে বলি দেওয়া এই সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। কিরণময়ী ও হিরণ্ময়ী পিতৃগৃহে ফিরে এসে স্নেহ-ভালোবাসা পায়নি। হিরণ্ময়ী জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। অসুস্থ বয়স্ক বরকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে হিরণ্ময়ীর বাঁচানোর চেষ্টা, স্বামীর মৃত্যুর পর অত্যাচারে স্বামীগৃহ ত্যাগ, পিতার গঞ্জনা এবং শেষপর্যন্ত হিরণ্ময়ী আত্মহত্যা করল। বিবাহ দেবার জন্য কন্যার পিতা-মাতার দুর্ভাবনা এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে পরিত্যক্ত হবার ভয়ে বয়স্ক অসুস্থ পাত্রের সঙ্গে

কন্যার বিবাহ দিয়ে আসলে তাকে বলিদান করে। এই হল এই ট্রাজেডি নাটকের বিষয়। 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮) নাটকে বিধবার প্রেম এবং পুনরায় বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করেছেন। বিধবার বিবাহকে তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেননি। মৃত্যুর ঘনঘটা দিয়ে এটিকে বিয়োগান্ত নাটক করে তুলতে চেয়েছেন।

তিনি বেশ কিছু রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটকও লিখেছিলেন। যেমন— সপ্তমীতে বিসর্জন, য্যায়সা কি ত্যায়সা, বেল্লিক বাজার ইত্যাদি। তিনি 'গৈরিশ ছন্দ' নামে নতুন ধরনের এক ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন অভিনয়ের সুবিধার্থে। গিরশচন্দ্র সার্থক নাট্যরচয়িতা না হলেও তিনি যে বিপুল পরিমাণ নাটকের যোগান দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে সজীব রেখেছিলেন তার জন্যই সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) : অমৃতলাল বসু 'রসরাজ' আখ্যা পেয়েছিলেন তাঁর রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটক রচনার জন্য। রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটক লিখলেও তাঁর প্রতিভা ছিল দীনবন্ধু মিত্রের তুলনায় পৃথক। কৌতুকরসই ছিল অমৃতলালের প্রধান হাতিয়ার। মূলত সেকালের সমাজে পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়েছিল যেসব জায়গায়, সেই বিষয়গুলিকে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাত করতেন। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়, বিলেতফেরত বাবু, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি বিষয় ছিল তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের লক্ষ্য। সাম্প্রতিক বিষয়কে তিনি সহজে গ্রহণ করতে পারেননি।

বিশ শতকে অমৃতলালের রচিত নাটক— খাসদখল (১৯১২), নবযৌবন (১৯১৪), যাজ্ঞসেনী (১৯১৮), ব্যাপিকা বিদায় (১৯২৬)। 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটকে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে মেয়ের মা এসে কীভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে তা দেখানো হয়েছে। এই নাটকে ব্যাপিকা হল মিসেস পাকড়াশী। পুষ্পবরণ ও মিনির সংসারে মিসেস পাকড়াশী এসে কীভাবে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিদায় নিলে সংসারে শান্তি ফিরে আসে। এই হল মূল ঘটনা। এই নাটকের হাস্যরস মূলত চরিত্রকেন্দ্রিক। মিসেস পাকড়াশী, ঘনশ্যাম ও মি. চৌধুরীকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। বিগত যৌবনা মিসেস পাকড়াশী ছিলেন অশিক্ষিতা, দাপুটে এবং নিজেকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি মনে করে ভুল ইংরেজিতে কথা বলতেন। ন্যাশনাল-কে বলতেন ন্যাচারেল। মেয়ে-জামাই শেষপর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ব্যাপিকা অর্থাৎ মিসেস পাকড়াশীর বিদায়ের ব্যবস্থা করে। কৌতুকমিশ্রিত হাস্যরসের খনি এই নাটক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির হাত ধরে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে রঙ্গব্যঙ্গমূলক নাটক রচনা করে তিনি বাঙালির কাছে রসরাজ হিসেবে আসন পাকা করে নিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় D L Roy নামে বাঙালির কাছে অধিক পরিচিত। গিরশচন্দ্র, অমৃতলাল বসুর যুগে তিনি নাট্যমঞ্চের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হয়েও নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে যুগের হাওয়া অনুযায়ী পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দেন। সেখানে পুরাণকে অনুসরণ করেও মাইকেল মধুসূদন দত্তর মতো আধুনিক মন ও মানসিকতার প্রবেশ ঘটান। তবে তিনি চূড়ান্তভাবে সফল হন ঐতিহাসিক নাটক রচনায়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলো সেকালে দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

তাঁর বিশ শতকে রচিত নাটকগুলো হল—

প্রহসন— প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দবিদায় (১৯১২)।

পৌরাণিক নাটক— সীতা (১৯০৮), ভীষ্ম (১৯১৪)।

ঐতিহাসিক নাটক— তারাবাই (১৯০৩), প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৫)।

সামাজিক নাটক— পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১৯১৬)।

আমরা এখানে সূত্রাকারে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের বাংলা নাট্যসাহিত্যে অবদান জেনে নেব—

(ক) দ্বিজেন্দ্রলাল প্রহসন জাতীয় রচনা দিয়ে প্রথম নাটকের জগতে পা রাখেন। প্রহসনে তিনি সেকালের প্রাচীনপন্থী এবং আধুনিকতার পূজারী রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে আক্রমণ করেছেন। 'প্রায়শ্চিত্তে' বিলেত ফেরত এবং শিক্ষিতা রমণীদের নিয়ে হাস্য-পরিহাস করেছেন। 'পুনর্জন্মে' হাস্যরসের মধ্য দিয়ে আসলে দর্শককে নীতিকথার পাঠ দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে লেখেন 'আনন্দবিদায়' প্রহসন। তীব্র সমালোচনা ও দর্শকের রুচিতে আঘাত লাগায় প্রথম রজনীর অভিনয়েই এই নাটক বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রহসনটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় বলা যায়।

(খ) ঐতিহাসিক নাটকে তিনি চরিত্রদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই উপস্থিত করেছেন। শৌর্য-বীর্যের চূড়ান্ত রূপ তিনি দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য প্রয়োজনীয় বীররস রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরাধীন দেশের জাতীয় চেতনায় এই নাটকগুলো প্রভাব বিস্তার করে।

(গ) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার আর একটি সম্পদ তাঁর ভাষা। কবিত্বপূর্ণ এবং নাটকীয় ভাষা ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাঁর ভাষার মধ্যে গতির আবেগ এবং ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। তিনি সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন, যা নাটকের ভাষাকে কবিত্বপূর্ণ এবং ছন্দময় করে তোলে। যে কারণে তাঁর নাটকের অনেক সংলাপ লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হোত। 'ভীষ্ম' নাটকে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সর্বাধিক ব্যবহার করে ভীষ্ম চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

(ঘ) পাত্র-পাত্রী বিচার না করে সকলের মুখেই তিনি একই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন—যা কাম্য নয়। মোঘল সম্রাট এবং একজন সাধারণ চরিত্রের ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যার ফলে কিছু চরিত্রের মুখের ভাষা কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্র সর্বাংশে সফল হয়েছিলেন। চরিত্রের সামাজিক স্তর অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে দীনবন্ধু তোরাপ, আদুরী, নিমচাঁদকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

(ঙ) নারী চরিত্র অঙ্কনে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্র হিসেবে নারীকে পুরুষের সহচরী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিনি উপস্থিত করেছেন। নূরজাহান, হেলেন, জাহানারা ইত্যাদি চরিত্র এর প্রমাণ।

(চ) সেকালে নাটকে স্বগতোক্তি প্রায়শই ব্যবহৃত হোত। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই পথে পা দেননি। তবে চরিত্র একা থাকলে সেখানে স্বগতোক্তি তিনিও ব্যবহার করেছেন।

(ছ) তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো দোষে-গুণে ভরা। কেবলমাত্র ভালো বা কেবলমাত্র খারাপ নয়। নূরজাহান, ঔরঙ্গজেব, চাণক্য প্রত্যেকেই দোষে-গুণে নির্মিত চরিত্র।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) : ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক লেখায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য। উচ্চ কোনো আদর্শ বা ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নাট্যজগতে প্রবেশ করেননি। একসময় তিনি অধ্যাপনার সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। বাঙালি দর্শকের মনোঞ্জনের উপযোগী সঙ্গীত রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, যা তাঁর নাটককে সেকালে জনপ্রিয় করে তোলে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশ কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'আলিবাবা' (১৮৯৭) গীতিনাট্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর প্রধান চরিত্র মর্জিনা। এই নাটকে রহস্যময় কাহিনিকে নৃত্যগীতের মাধ্যমে তিনি দর্শককে উপহার দিয়েছিলেন। 'করুণা' (১৯০৮), 'ভূতের বেগার' (১৯০৮), 'পলিন' (১৯১১), 'মিডিয়া' (১৯১২) ইত্যাদি তাঁর গীতিনাট্য।

পৌরাণিক নাটক— সাবিত্রী (১৯০২), রঞ্জাবতী (১৯০৪), ভীষ্ম (১৯১৩), রামানুজ (১৯১৬), নরনারায়ণ (১৯২৬)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকের সমকালেই ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'ভীষ্ম'কে মঞ্চায়িত করেন এবং দর্শক মনোরঞ্জনে সফল হন। এটি অনেকটা যাত্রার ঢঙে লেখা। এই নাটকে কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গো যুক্ত নয় এমন ঘটনাকেও দৃশ্যায়িত করেছেন। ভাষায় কখনও গদ্য আবার কখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক— রঘুবীর (১৯০৩), প্রতাপাদিত্য (১৯০৩), পদ্মিনী (১৯০৬), চাঁদবিবি (১৯০৭), অশোক (১৯০৮), আলমগীর (১৯২১)। পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ দর্শকমনোরঞ্জনমূলক উপাদানের সমাবেশ করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকে তিনিই প্রথম জাতীয়তাবাদের প্রবেশ ঘটান। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের মধ্য দিয়েই প্রথম বাংলা নাট্যজগতে জাতীয়তার মন্ত্র প্রবেশ করে। প্রতাপাদিত্য বাংলার লুপ্ত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করেছেন। নাটকে তাঁকে ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে দেখানো হলেও বীর চরিত্র হিসেবে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয়নি। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের মধ্যেও রাজাসুলভ গাম্ভীর্য দেখা যায় না। 'আলমগীর' তুলনায় সার্থক রচনা। ঔরঙ্গজেবের দ্বন্দ্বময় চরিত্র উপস্থাপনে সফল হন এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় এই নাটককে জনপ্রিয় করে তোলে। আলমগীর এই নাটকে একটি সার্থক চরিত্র। আলমগীর প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, আবার পরক্ষণেই দেখা যায় সে দুর্বল। আলমগীর-উদিপুরী এবং রাজসিংহ-ভীমসিংহ-জয়সিংহের কাহিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে দর্শকমনোরঞ্জনে সফল হলেও সর্বত্র ইতিহাসকে তিনি বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেননি। নাটক ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য সৃষ্টিতেও হাত লাগিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিকের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনাতেও নিজের অবদান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কলম ধরেননি, তাঁর প্রতিটি নাটকই কোনো না কোনো বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রচিত। বলা যায় নাটকে তিনি যে বক্তব্যকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা নিয়ে আস্ত একটা প্রবন্ধ রচিত হতে পারে।

বিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো হল— বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকগুলোর অধিকাংশই হল রূপক-সাঙ্কেতিক পর্যায়ের। অর্থাৎ কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারা অতিক্রম করে তিনিই প্রকৃতপক্ষে রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), রক্তকরবী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২৫), কালের যাত্রা (১৯৩২); এগুলো রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক প্রকৃতির নাটক।

রূপক-সাঙ্কেতিক নাটককে অনেকে কেবলমাত্র সাঙ্কেতিক নাটক বলতে চান। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় নাটকে রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। সাঙ্কেতিক নাটকে যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের অগম্য, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এরূপ বিষয়কে বোধগম্য করে তোলার জন্য সঙ্কেতের সাহায্য নিতে হয়। রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে রূপক এবং সঙ্কেতের সাহায্যে কোনো দুর্জ্ঞেয় বিষয়বস্তুকে নাট্যকার বা সাহিত্যিক সাধারণের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন। কোনো না কোনো তত্ত্ব বা ভাবনাকে এই জাতীয় নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলে এই জাতীয় নাটককে তত্ত্ব নাটকও বলে থাকেন।

'রাজা' রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক। এই নাটকে তিনি রানী সুদর্শনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যে পাওয়া যায় না। অরূপের মধ্যেই তাঁকে সন্ধান করতে হয়। প্রকৃত ভক্ত ভগবানকে সীমাবদ্ধ প্রতীকের মধ্যে সন্ধান করে না, তাই সে সহজে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায়। সন্দেহ, সংশয় নিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই রানী সুদর্শনাকে রাজা সহজে দেখা দেননি। কিন্তু সুরঙ্গমা ও ঠাকুর্দাকে তিনি দেখা দিয়েছেন। কারণ তারা ছিল ভক্ত। রূপের পিয়াসী সুদর্শনাকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে তবে রাজার সাক্ষাৎ পেতে হয়েছে। গভীর তত্ত্বকথাকে নাট্যকার এখানে রূপকের মাধ্যমে, সঙ্কেতের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তবে এই নাটকে রূপকের প্রাধান্য বেশি। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদের নাম 'The King of the Dark Chamber'। এই নাটকেরই অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয় 'অরূপরতন' নামে।

'অচলায়তন' নাটকে সমাজে প্রচলিত অর্থহীন সংস্কার ও অযৌক্তিক প্রথার মান্যতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। এইসব অর্থহীন-অযৌক্তিক প্রাচীন প্রথা-সংস্কারকে নির্বাসন দিয়ে তিনি মুক্তমনের বাতাসকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই নাটকে মহাপঞ্চক এবং তার দলবল মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা অভিশপ্ত এক অচলায়তনের প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিল, যাতে প্রাচীরের গণ্ডীর ভেতরে বাইরের সংস্কারহীন মুক্ত বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। আবার ওই মুক্ত বাতাস যাতে অচলায়তনের ভেতরের সদস্যদের মনে প্রবেশ না করতে পারে তাই নানারকম সংস্কার ও প্রথার বেড়াজাল তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পঞ্চক ও আচার্যের মতো প্রাণবান মানুষেরা

ছিলেন এই গণ্ডীর বাইরে। আর ছিলেন গুরু, যিনি সর্বশক্তিমান। অচলায়তনে তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শেষপর্যন্ত অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ জড়শক্তির শেষপর্যন্ত পরাজয় ঘটে প্রাণশক্তির কাছে।

'ডাকঘর' একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক। এই নাটকে অমল নামের এক বালক ব্যাধিগ্রস্ত। রোগশয্যায় থেকে সে চার দেওয়ালের গণ্ডী অতিক্রম করে অসীমের দিকে যেতে চায়। এইসময় রাজার ডাকঘর স্থাপিত হয়। তারও মনে হয় রাজা তাকেও চিঠি পাঠাবে। কিন্তু রাজার চিঠি আর আসে না। রাজার চিঠির জন্যই সে আর বাইরে যেতে চায় না। একসময় রাজকবিরাজ এসে জানায় গভীর রাত্রে রাজা তার ভক্তের কাছে আসবে দেখা দিতে। কিন্তু আসে না। শেষপর্যন্ত সুধা এসে বলে যায় অমলের নিদ্রাভঙ্গ হলে ওকে যেন বলা হয় সুধা ওকে ভোলেনি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝেই যে অসীমকে পাওয়া যায় বা তার সন্ধান করতে হয় তাই-ই এই নাটকে বোঝাতে চেয়েছেন। অমল রোগশয্যায় থেকে সুদূরের জন্য অসীমের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজার ডাকঘর যখন স্থাপিত হল তখন তার অস্থিরতা কমে গেল। সে আর ঘরের বাইরে যতে চাইল না। আসলে সীমার মধ্যেই অসীমকে সন্ধান করতে হয় এই হল নাট্যকারের বক্তব্য।

এই পর্যায়ের নাটকের মধ্যে 'রক্তকরবী'কে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই নাটকে মানব সভ্যতার আধুনিক এক সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। এই নাটকের কেন্দ্রস্থল হল যক্ষপুরী; যা আসলে সোনার খনি। এই যক্ষপুরী থেকে শ্রমিকেরা যন্ত্রের মতো সারাদিন সোনা তোলে আর নেশা করে। তাদের জীবনে আনন্দ নেই, কাজের অবসর নেই। অন্যদিকে এই নাটকে আছে যক্ষপুরীর রাজা, নন্দিনী আর রঞ্জন। সর্দাররা রাজার নির্দেশমতো শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, কোথাও এতটুকু বিদ্রোহের আভাস পেলে চাবুক দিয়ে তখনই তা দমন করে। কিন্তু রঞ্জন এইসব নিয়মের বাইরে। তাকে নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় না। নন্দিনী হল এই রঞ্জনের সখী। নন্দিনী যক্ষপুরীতে নিয়ে আসে মুক্ত হাওয়া। রাজার মনও আন্দোলিত হয় এই নন্দিনীর প্রেমের মন্ত্রে। যে রাজা নিজের চারিদিকেই একটা জালের আবরণ টেনে দিয়েছিলেন, সেই রাজাই নন্দিনী-রঞ্জনের প্রেমে আন্দোলিত হয়। কিন্তু সর্দাররা নন্দিনীর প্রেমের এই বার্তাকে ভয় পায়। নন্দিনীর ছোঁয়ায় সর্বত্র একটা বেসুরো বাতাস বইতে থাকে। সর্দাররা নিজেদের মৌরসীপাট্টা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে রঞ্জনকে রাজার প্রকোষ্ঠে ঠেলে দেয় নিধন করার জন্য। রাজাও না জেনে নন্দিনীর সখাকে হত্যা করে। রাজা চেয়েছিল রঞ্জন-নন্দিনীর মিলন। রাজা নিজের তৈরি জালের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে বাইরে এসে নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে নিজের প্রাণহীন সৃষ্টিকে নিজেই ভাঙতে চলেন। দূরে শোনা যায় পৌষের ফসল কাটার গান। নাটকটির নাম প্রথমে ছিল 'যক্ষপুরী', পরে 'নন্দিনী' এবং সবশেষে 'রক্তকরবী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকে কয়েকটি নৃত্যনাট্যও লিখেছিলেন— তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৭), শ্যামা (১৯৩৯)। এছাড়াও 'শোধবোধ' (১৯১৬), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'বাঁশরী' (১৯৩৩) নামে নাটক রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিকের মতো নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাংলা নাটককে বৌদ্ধিক চর্চার স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা নাটকে সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের প্রয়োগ করে অন্তর্দৃষ্টির ব্যবহারে আভিজাত্য এনেছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি সর্বজনপ্রিয় নাট্যকার হননি। রবীন্দ্রনাথ

নাটকে অভিনয়ও করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনে অলীকবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। মঞ্চসজ্জার ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় দৃশ্যপটকে পরিহার করার কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য, প্রহসন, রূপক-সাঙ্কেতিক, সামাজিক— বাংলা নাটকের সমস্ত আঙ্গিককেই ঋদ্ধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক সেকালের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সেভাবে অভিনীত হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের নাটক ঘটনাবহুল নয় এবং তা সেকালের সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জনের উপযোগী ছিল না। শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মধ্যেই সেসব নাটকের অভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই সময় সমকালীন চিন্তা-ভাবনার অনুসারী আধুনিক বেশ কিছু নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ-ও মনে রাখতে হবে বাংলা সাহিত্যে এই সময় কল্লোল যুগের লেখকদের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কল্লোল যুগের লেখকরা সামতিকভাবে হলেও বেশ আলোড়ন তুলেছিলেন আধুনিকতার নামে। এই সময়ের কয়েকজন নাট্যকার সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা হবে।

মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) : পৌরাণিক নাটক রচনায় মন্মথ রায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি পুরাণ থেকে চরিত্র গ্রহণ করলেও তার মধ্যে আধুনিক বা সমসাময়িক চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবাসুর (১৯২৮), কারাগার (১৯৩০), অশোক (১৯৩৪) ইত্যাদি তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটক। তিনি পুরাণের ঘটনাকে ব্যবহার করলেও তার অন্তরালে থাকত সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। 'কারাগার' নাটকে তিনি ভাগবতের কংস-বসুদেব-দেবকীর কাহিনিকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল পরাধীন ভারতের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা। কংসের কারাগার হল আসলে ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারত। বসুদেব, দেবকী, কঙ্কণ, কঙ্কা পরাধীন ভারতীয়র রূপক চরিত্র। এই নাটকের গানগুলো নজরুল ইসলাম ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচিত। নাটকটি অত্যন্ত গতিশীল। সংলাপও সেই গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে রচিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৩৪); উল্লেখযোগ্য নাটক— আহুতি (১৯১৪), রাখিবন্ধন (১৯২০), অযোধ্যার বেগম (১৯২১)। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১২৯৩-১৩৪৮)-র রচিত নাটক— সীতা (১৯২৪), বাংলার মেয়ে (১৯৩৪), দিগ্বিজয়ী ইত্যাদি। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-?) গুরুত্বপূর্ণ নাটক 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩৩), 'সিরাজদ্দৌলা', 'ধাত্রী-পান্না', 'রাষ্ট্রবিপ্লব'।

১৫.৪ সহায়ক গ্রন্থ :

১. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা,* মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম প্রকাশ— ১৩৯৪।

২. দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস,* পুস্তক বিপণি, ১ম প্রকাশ— ১৯৯৫।

৩. ড. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

৪. অলোক রায়, *বিশ শতক*, প্রমা প্রকাশনী, ২০১৬।

৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ২০০৫-২০০৬।

৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা কবিতার কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮।

১৫.৫ প্রশ্নাবলি :

❑ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. বিশ শতক বলতে কী বোঝায়

২. বিশ শতকে ঘটে যাওয়া চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা উল্লেখ করো।

৩. বিশ শতকের পাঁচজন নাট্যকারের নাম জন্ম-মৃত্যু উল্লেখ করে লেখো।

৪. বিশ শতকের প্রথমার্ধে সক্রিয় ছিল এমন পাঁচটি নাট্যমঞ্চের নাম লেখো।

৫. বিশ শতকের প্রথমার্ধে লেখা পাঁচটি পৌরাণিক নাটকের নাম লেখো।

৬. শখের নাট্যশালা বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি শখের নাট্যশালার উদাহরণ দাও।

৭. স্টার থিয়েটার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৮. বিশ শতকের প্রথমার্ধের কয়েকটি নাট্যমঞ্চের নাম লেখো।

৯. রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকের নাম লেখো।

১০. কয়েকটি প্রহসনের নাম লেখো।

❑ **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

১. বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।

২. বিশ শতকের প্রথমার্ধের উল্লেখযোগ্য দুটি নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৩. নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৪. বাংলা নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবদান আলোচনা করো।

৫. নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্বন্ধে আলোচনা করো।

৬. শখের নাট্যমঞ্চ থেকে বাংলা পেশাদারি রঙ্গামঞ্চে উত্তরণের পর্যায়টি ব্যাখ্যা করো।